

রক্তদান কার্যক্রম উন্নয়ন তহবিল লক্ষ্যমাত্রার দ্বারপ্রান্তে ॥ ৩০ লক্ষাধিক টাকা সংগৃহীত

কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম উন্নয়ন তহবিলে এ পর্যন্ত ৩০ লক্ষাধিক টাকা সংগৃহীত হয়েছে।

গত ৭ নভেম্বর গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপে গুরুজী প্রত্যেককে ঈদুল ফিতরের ব্যয় থেকে শতকরা ১০ ভাগ অর্থ রক্তদান কার্যক্রম উন্নয়ন তহবিলে জমা দেয়ার আহ্বান জানানোর পর পরিবারের সদস্যদের ব্যাপক সহযোগিতায় তহবিলে সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে।

গুরুজী সপরিবারে কোরবানীর ঈদ লামায় উদযাপন করবেন

গুরুজী এবার সপরিবারে লামা মেডিটেশন সেন্টারে কোরবানীর ঈদ উদযাপন করবেন। এ উপলক্ষে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ঈদ মোলাকাতের ব্যাপারে বিশেষ অগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। ঈদের দিন কোরবানীর পর বিশেষ ফাতেহার আয়োজন করা হয়েছে। গুরুজীর সাথে লামায় কোরবানীতেও এবার উৎসাহী অনেক গ্রাজুয়েট অংশ নিচ্ছেন।

বার্ষিক ওয়ার্কশপ কার্ড

এখন থেকে সারা বছরের গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপের জন্যে বার্ষিক ওয়ার্কশপ কার্ড পাওয়া যাচ্ছে। সাধারণ ওয়ার্কশপ কার্ডও আগের মতো চলবে। তবে কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েটরা বার্ষিক ওয়ার্কশপ কার্ড সংগ্রহ করলে ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারছেন। এই বার্ষিক ওয়ার্কশপ কার্ডের মূল্য সাধারণের জন্যে ১০০০ টাকা ও শিক্ষার্থীদের জন্যে ৬০০ টাকা।

মার্চ মাসের কর্মসূচি

- ১। ঢাকায় ১৫৬ ব্যাচের পরিচিতি সভা : ৫ মার্চ (বুধবার)।
মাগরিবের পর মাসিক যৌথ মেডিটেশন।
- ২। ঢাকায় ১৫৬ ব্যাচের কোর্স : ১৪, ১৫, ১৬ ও ১৭ মার্চ (শুক্র, শনি রবি ও সোমবার)।
- ৩। চট্টগ্রামে দিনব্যাপী গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ : ২১ মার্চ (শুক্রবার)।
- ৪। চট্টগ্রামে ১৫৭ ব্যাচের পরিচিতি সভা : ২২ মার্চ (শনিবার)।
- ৫। সিলেটে দিনব্যাপী গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ : ২৮ মার্চ (শুক্রবার)।
- ৬। সিলেটে ১৫৯ ব্যাচের পরিচিতি সভা : ২৯ মার্চ (শনিবার)।



বৈজ্ঞানিক মেডিটেশন চর্চার দুই দশক পূর্তি কোয়ান্টাম মেথড কোর্স : সাফল্যের এক দশক

পরম করণাময়ের অনুগ্রহে ১৯৮৩ সালে যোগ মেডিটেশন কেন্দ্রের মাধ্যমে বাংলাদেশে যে প্রথম বৈজ্ঞানিক মেডিটেশন চর্চার সূচনা হয়েছিলো, তা আজ তৃতীয় দশকে পা দিয়েছে। একই সাথে কোয়ান্টাম মেথড মেডিটেশন কোর্সও প্রবেশ করেছে দ্বিতীয় দশকে। উল্লেখ্য যে, ১৯৯৩ সালের ১ জানুয়ারী ঢাকার পাবলিক লাইব্রেরী মিলনায়তনে শিখিলায়ন ক্যাসেটের প্রকাশনা ও মেথডের পরিচিতি সভার মাধ্যমে কোয়ান্টাম মেডিটেশন কোর্স তার যাত্রার শুভ সূচনা করে।

১৯৯৩ সাল থেকে শুরু করে ২০০২ সাল- এই দশ বছরে

কোয়ান্টাম মেথডের ১৫০টি কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা ছাড়াও চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও সিলেটে নিয়মিত এ কোর্স অব্যাহত রয়েছে। কোয়ান্টাম মেথড মেডিটেশন কোর্সের দশ বছর পূর্তির শোকরানা আদায়ের জন্যে গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক গত ডিসেম্বরের ২০ তারিখ থেকে জানুয়ারীর ২৭ তারিখের মধ্যে সিলেট, রাজশাহী ও চট্টগ্রামে মানবাধিকারের সার্থক রূপকার মহানবী (স.) শীর্ষক দিনব্যাপী গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ পরিচালনা করেন এবং ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও সিলেটে টানা ৪ দিন করে মেডিটেশন কোর্স পরিচালনা করেন।



গত বছরের মতো এ বছরও বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে আয়োজিত ফেব্রুয়ারী মাসব্যাপী বই মেলায় ব্লাড ক্যাম্পের আয়োজন করেছে ফাউন্ডেশনের স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম।

২৮ ফেব্রুয়ারী ঢাকায় গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ

আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার, ২০০৩ ঢাকায় গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হবে। ওয়ার্কশপের বিষয়বস্তু : সার্বিক সাফল্য লাভে চিন্তার প্রক্রিয়া।

২২ বছরের পুরনো স্পন্ডাইলাইটিসের ব্যথা আর নেই সুনন্দা সিন্হা

দীর্ঘ ২২ বছরের স্পন্ডাইলাইটিসের যন্ত্রণায় আমি একেবারে তাজ-বিরক্ত হয়ে পড়েছিলাম। দেশে চিকিৎসা করিয়ে কূল পেলাম না। তখন ভারত এবং আমেরিকাতেও চিকিৎসা করিয়েছি বহুদিন। সব ডাক্তারের একই মত, তা হলো আপনি আর ভালো তো হবেনই না বরং ক্রমশ এটা আরো বাড়বে। এই বিশ্বাসকে সঙ্গি করেই চলছিলাম।



কিন্তু আমার এক ছাত্রের ক্রমাগত অনুরোধে শেষ পর্যন্ত কোর্স করতে এলাম এই চিন্তা নিয়ে, আচ্ছা দেখি না কি হয়! আমার ধারণা ছিলো ২/১ ঘণ্টা বসার পরেই আমার অসুখ বেড়ে যাবে এবং আমি ঘরে ফিরে যাবো। প্রথম দিন শেষে রাতে ঘরে ফেরার পর আমার স্বামী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কিভাবে সারাদিন চেয়ারে বসেছিলে? আমি তখনও ভাবছি এই বুঝি ব্যথা শুরু হয়, আমি বিছানায় পড়ে যাই।

অবাক লাগলো- সেসবের কিছুই হলো না আমার! সম্পূর্ণ সুস্থ এবং অত্যন্ত আরামবোধ করতে লাগলাম। এভাবেই চারদিন সম্পন্ন হলো। আমার বিশ্বাস করতে আর কোনো দ্বিধা নেই। আমি এখন পুরোপুরি সুস্থ আছি এবং সুস্থ থাকবো বাকি দিনগুলোতেও। ওষুধ ছাড়াই সুস্থ থাকা যায়- আপাত অসম্ভব 'গাঁজাখুরি' এই কথাটার মূল উৎস আমি জেনে গেছি- আর কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই আমার। আজ আমার ভেতরে কিরকম আনন্দ লাগছে- তা বলে বোঝাতে পারবো না। শুধু আহ্বান জানাই, যারা এখনো এই সত্য-সুন্দরের পথে পা বাড়ান নি তারা যেন আর তা থেকে নিজেকে বঞ্চিত না রাখেন।

[সুনন্দা সিন্হা শিক্ষিকা, ব্রুবার্ড স্কুল, সিলেট। ১৫১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।]

লামায় ধ্যানযাত্রা

আগামী ১৫, ১৬ ও ১৭ ফেব্রুয়ারী বান্দরবানস্থ লামার কেয়াজুপাড়ায় অবস্থিত কোয়ান্টাম মেডিটেশন সেন্টারে ধ্যান আনন্দ অনুষ্ঠান উদযাপিত হবে। ঢাকা, রাজশাহী, সিলেট ও চট্টগ্রাম থেকে ধ্যানযাত্রীরা এ অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন।

রোগ নিরাময়ে প্রার্থনার ভূমিকা

নাহার সিদ্দিকী

সম্প্রতি ড. ডিন অরনিশের লেখা প্রোগ্রাম ফর রিভার্সিং হার্ট ডিজিজ বইটি পড়েছি। লেখক তার বহু সহকর্মী নিয়ে সুবিশাল গবেষণা করেছেন—কীভাবে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন, খাদ্যাভ্যাস এবং ব্যায়াম করোনারি হার্ট ডিজিজের রোগীদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারে। বহু হার্ট সার্জারি করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তার। তিনি রোগীদের ফলোআপ করে দেখেছেন হার্ট সার্জারিতে ভালো হওয়ার পর অনেক রোগীই তাদের পূর্বনির্ধারিত জীবনযাপন করতে গিয়ে পুনরায় হার্টের সম্মুখীন হয়েছে। আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের জার্নালে তার গবেষণালব্ধ ফলাফল ছাপা হয়েছে। নিউজউইক এ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছে।

তার এই গবেষণা আরম্ভ হয় ১৯৭৫ সালে। ১৯৭৭ সালে চিফ অব মেডিসিন ডা. এন্টনিও গোটার সঙ্গে গবেষণা আরো বিস্তৃত করেন। রোগীদের (যারা অংশগ্রহণ করেন) অবস্থা জানার জন্য Excercise Thallium Scan করে দেখেন করোনারি রক্ত প্রবাহে লক্ষণীয়ভাবে উন্নতি সাধিত হয়েছে। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে গবেষণা নিয়ে অগ্রসর হন তিনি। ১৯৮৪ সালে তিনি PET (Position Emission Tomograph) স্ক্যানের মাধ্যমে দেখতে পান জীবনযাত্রা বদলানো অংশগ্রহণকারী রোগীরা হার্টের সর্বতোভাবে উন্নতি সাধন করতে পেরেছে। এখানে উল্লেখ্য, PET স্ক্যানের মাধ্যমে আর্টারির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গুল্কোজও ধরা পড়ে। সমগ্র আমেরিকার মাত্র কয়েকটি হাসপাতালেই এই মেশিন রয়েছে। তার বইতে তিনি গভীর শিথিলায়নের বর্ণনা দিয়েছেন। অ্যাবডমিনাল ব্রিডিং কীভাবে করতে হয়—শিথিলায়নে এর গভীর প্রভাব রয়েছে। সুগভীর নিঃশ্বাসের মাধ্যমে আমরা অক্সিজেনের সঙ্গে এনার্জি গ্রহণ করে থাকি। চমক লাগলেও কথাটা সত্যি, আমরা অধিকাংশই সঠিক পদ্ধতিতে নিঃশ্বাস নিতে জানি না। বঁচে থাকার মতো নিঃশ্বাস অবশ্যই নিচ্ছি কিন্তু পরিপূর্ণ প্রাণশক্তি উজ্জীবিত হওয়ার জন্য তা যথেষ্ট নয়। জৈবিক দেহ ও আত্মিক দেহ উভয়ের জন্য তা প্রয়োজন। যদিও আত্মিক শরীরের অবস্থা পরিমাপের কোনো যন্ত্র এখনো আবিষ্কৃত হয় নি। শরীর সুস্থ রাখার জন্য আত্মিক শরীরের সুস্থতার অপরিণীম্য অবদান রয়েছে। একজন চৌকস খেলোয়াড়ের দম নেওয়ার ক্ষমতা যদি শতকরা ৫০ ভাগ হয়ে থাকে, অপরপক্ষে দেখা যায় হার্টের অসুখে ভোগা রোগীদের দম নেয়ার ক্ষমতা শতকরা ২ থেকে ৫ ভাগ। অথচ হার্টের রোগীদেরই অক্সিজেন নেয়ার দরকার বেশি। অংশগ্রহণকারীদের তিনি দম নেয়ার বিভিন্ন পদ্ধতিও অনুশীলন করান। এরপর আসে ভিজুয়ালাইজেশনের কথা। তিনি লিখেছেন, মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে ভিজুয়ালাইজেশনের মাধ্যমে হার্টের কী মিরাকল উন্নতি সাধিত হয়। ১৯৮৮ সালের অলিম্পিক গেমসে ফ্রাটস

সাইকোলজিস্ট ড. সেন মারফি খেলোয়াড়দের ভিজুয়ালাইজেশন শেখানোর কাজে নিযুক্ত হন। বিভিন্ন খেলোয়াড় যেমন, ম্যারি রেটন যিনি জিম্নাস্টে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত, গ্রেগ লুগানিস একজন ডাইভিং চ্যাম্পিয়ন প্রমুখ খেলোয়াড়ের সঙ্গে ইন্টারভিউতে জানা যায় এই ভিজুয়ালাইজেশন (Mind-body technic) তাদের পদকপ্রাপ্তিতে কীভাবে সাহায্য করেছে। হার্টের চিকিৎসা সম্পূর্ণ করার জন্য তিনি নির্দিষ্ট পস্থা বর্ণনা করেন। এই চিকিৎসা অনেক উপকার বয়ে আনে। এরপর তিনি অন্তরের প্রজ্ঞার কথা বলেছেন। আমাদের ভেতরের উচ্চতর আমি-কে আবিষ্কারের পস্থা জানিয়েছেন। এরপর এসেছে পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার সম্পর্কের কথা। আধ্যাত্মিক অনুশাসনে এবং অনুশীলনে মনের চির সত্যের প্রকাশে আসে চির প্রশান্তি, যা কিনা শত কোটি টাকার সাহায্যে বা নিকট আত্মীয়দের ওপর পরম নির্ভরশীলতায়ও আসতে পারে না।

শব্দের অনুরণন বিশ্বজগতে কী করে নিরাময়ের স্পন্দন শুরু করে তা তিনি লিখেছেন। শব্দ অত্যন্ত শক্তিশালী, বিশেষ কোনো শব্দ আমাদের শরীর-মনে নিরাময়ের কাজ আরম্ভ করে। মস্তিষ্কের নিউরনেও এর প্রভাব পড়ে। আমরা কোয়ান্টাম ফিজিক্স থেকে জানতে পারি, আমাদের চারদিকে ইলেকট্রন ও সাবএটমিক পার্টিকেল বিভিন্ন এনার্জি লেভেলে অনবরত কম্পনের সৃষ্টি করছে। মেডিটেশন এখানে সংযুক্তির কাজ করে থাকে।

মেডিটেশন শেখার বিভিন্ন কলাকৌশলও আমরা এই বইয়ে পাই। তিনি বলেছেন, পূর্বলব্ধ ধারণার সীমাবদ্ধতার জন্য আমাদের জ্ঞান সীমাহীন হতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। পূর্বলব্ধ ধারণাকে অতিক্রম করতে না পারলে নব নব কল্যাণ আবিষ্কার সম্ভব নয়। ড. ডিন অরনিশ এমডি মেডিকেলের স্টুডেন্ট হিসেবে এবং পরবর্তী সময়ে Preventive medicine research institute-এ কাজ করতে গিয়ে আবিষ্কার করেছেন ইমিউনোলজিস্ট এবং আধ্যাত্মবাদীদের (Spiritualist) ধারণায় চমৎকার সাযুজ্য রয়েছে। self এবং not self- এই দুটি শব্দ এই দুই ধরনের মতবাদেই ব্যবহৃত হয়। ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার হয় যখন আমরা দেখি শরীরের ইমিউন সিস্টেম বুঝতে অক্ষম হয় কোনটি self এবং কোনটি self নয়, তখনই শরীরের ভেতরের একটি অঙ্গ আর একটি অঙ্গকে আক্রমণ করে ধীরে ধীরে নিঃশেষ করে দেয়। Rheumatoid writhinnitis একটি অটো ইমিউন অসুখ।

অপরপক্ষে নিজ সত্তাকে (self) পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করার জন্য মেডিটেশন আমাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করে, যা শরীরের অটোইমিউন ডিজিজ হতে আমাদের সুরক্ষা করে।

আমরা এই মহাজাগতিক বিশ্বের একটি অবিসংবাদিত অংশ। যেখান থেকে আমাদের উৎপত্তি, সেখানেই আমরা ফিরে যাবো। মনের মাঝখানের এই অনুভূতি স্থায়ী করতে সক্ষম হলেই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের মাঝে বিলীন হয়ে যাওয়া

সম্ভবপর হয়ে ওঠে। ফলস্বরূপ এই জীবনে আমাদের হৃদয়ে মহাপ্রশান্তি বহমান হতে থাকে। এই পৃথিবীতে খুব সামান্য সময়ের জন্য আমাদের অবস্থান, ক্ষণিকের অতিথি আমরা। রোগ নিরাময়ে প্রার্থনারও একটি শক্তিশালী ভূমিকা রয়েছে—এ বিষয়ে একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন। সান ফ্রানসিসকো জেনারেল হাসপাতালের ড. রেডিড বায়ার্ড একটি উৎসাহব্যঞ্জক গবেষণা করেছেন। ৩৯৩ জন হার্টের রোগী নিয়ে পরিচালিত তার এ গবেষণায় রোগীদের তিনি দুই ভাগে ভাগ করেছিলেন। ১৯২ জনের জন্য বিশেষভাবে নিয়োজিত লোকদের দিয়ে প্রার্থনা করা হয়েছিলো এবং বাকিদের জন্য প্রার্থনা করা হয় নি; শুধু চিকিৎসা করা হয়েছে। ১৯২ জন—যাদের জন্য চিকিৎসা এবং প্রার্থনা করা হয়েছিলো তাদের আরোগ্য ছিলো অত্যন্ত দ্রুত। আর যাদের জন্য প্রার্থনা করা হয় নি তারা তুলনামূলক কম আরোগ্য লাভ করেছিলো।

বইয়ের শেষাংশে যোগ ব্যায়ামের বর্ণনা রয়েছে। আছে খাদ্যের কথা। তাছাড়া বিভিন্ন খাদ্য প্রণালীর বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। যারা করোনারি হার্ট জিজিজে আক্রান্ত হতে চান না এবং দুর্ভাগ্যবশত যারা আক্রান্ত হয়েই বসেছেন উভয় দলের জন্য সমান উপকারী।

—দৈনিক প্রথম আলোর ‘ছুটির দিনে’ থেকে সংকলিত।

ব্রেনকে সজীব রাখুন, উপভোগ করুন অবসরের আনন্দ

আপনার অবসর সময়টা আপনি কিভাবে কাটান? বই পড়ে? দাবা খেলে? নাকি টিভি দেখে?

সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গেছে চিন্তাশক্তি ব্যবহার করতে হয় এবং শেখার সুযোগ আছে এমন সব কাজে যারা অবসর সময়ে মগ্ন থাকেন, তাদের ব্রেন অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি সজীব থাকে।

ক্লিভল্যান্ডের কেস ওয়েস্টার্ন রিজার্ভ মেডিকেল স্কুলের গবেষকগণ ৫৫০ জনের অবসর বিনোদন বিশ্লেষণ করে দেখেন—যারা বই পড়া, ক্রসওয়ার্ড পাজল বা দাবা খেলা কিংবা বাদ্যযন্ত্র বাজানোর মতো কাজে অবসর কাটান তাদের আলঝেইমার বা স্মৃতিবিভ্রাট রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা আড়াই শতাংশ কম। অন্যদিকে টিভি দেখে বা ভিডিও দেখে যারা সময় কাটান—আলঝেইমারের ঝুঁকি তাদের বেশি।

গবেষকদের মতে, চিন্তা এবং শেখার একটা সক্রিয় প্রক্রিয়ায় ব্রেনসেলগুলো ব্যস্ত থাকলে তাতে ব্রেনে রক্ত চলাচল বাড়ে; অন্যান্য ব্রেনসেলের সাথে এর যোগাযোগ ও সমন্বয় সক্রিয় হয়। ফলে তা মস্তিষ্কে এক ধরনের ‘প্লাক’ জমা প্রতিরোধ করে, যা আলঝেইমার রোগের কারণ। তবে টিভি দেখার মতো নিষ্ক্রিয় কাজে এ প্রক্রিয়া উদ্দীপ্ত হয় না।

তাই অবসরকে নিষ্ক্রিয় উদ্দেশ্যহীন ভাবে না কাটিয়ে মেতে উঠুন সক্রিয় কোনো আনন্দময় কাজে। মস্তিষ্কে সজীব রাখুন আজীবন।

গুরুজীকে লেখা চিঠি

মো. আনোয়ারুল আজিম

শ্রদ্ধেয় গুরুজী,
আসসালামু আলাইকুম।

আশা করি পরম করুণাময়ের অশেষ কৃপায় বেশ ভালো আছেন। আমি কোর্স পরবর্তী শুধুমাত্র ১ নং শিথিলায়ন ক্যাসেটের এ ও বি সাইড দু'বেলা (অনিয়মিত) মেডিটেশন করে আসছিলাম। অন্য কোনো ক্যাসেট ব্যবহার করতাম না। গত ২৩ ডিসেম্বর রাতে ৮ নং ক্যাসেট-এর মাধ্যমে মেডিটেশন করি। এর পরদিন ২৪ ডিসেম্বর সকালে গোসল করার উদ্দেশ্যে বাথরুমের সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ চোখের সামনে আপনাকে দেখলাম। প্রথমে ভয় পেয়েছি। এরপর সালাম দিয়ে বলতে শুরু করলাম, গুরুজী, আমি কোর্স করেছি আমার পরিবারের সদস্যদের সাথে ভালো আচরণ করার জন্য; কিন্তু আমি বাইরে সবার কাছেই একজন ভালো মানুষ হিসেবে পরিচিত। অথচ কোর্স করার পরও পরিবারের জন্য আমি খুব একটা পরিবর্তন নিজের মধ্যে আনতে পারি নি। তবে, বাইরে আমি আগের চেয়েও বেশি ভালো হয়েছি। কিন্তু আমি চাই আমার পরিবারের সদস্যদের সাথে ভালো আচরণ করতে, তাদেরকে অনেক সময় দিতে ইত্যাদি। আপনি আমার কথাগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলেন এবং এক পর্যায়ে হাসতে হাসতে বললেন, ঠিক আছে, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি আপনাকে আরো বলতে চাইলাম কিন্তু আপনি হাত ইশারা করে বললেন, আর বলতে হবে না। আমার আরো অভিযোগ করার ছিলো; কিছুটা অভিমান হলো এবং হতাশা হলো। এরপর যা ঘটলো— আমি যথারীতি অফিসে চলে গেলাম এবং অফিস থেকে এসে দেখি আমার বড় সন্তান লাবীব আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো, বাবা, তুমি এত দেরী করলে কেন? তোমার সাথে খেলবো।

আমিও খুব আদর করলাম এবং এই প্রথম এক ধরনের প্রশান্তি অনুভূত হলো। আমি সবার সাথে আমার অজান্তে ভালো আচরণ করতে লাগলাম। এক পর্যায়ে খেয়াল করলাম আমি বদলে যাচ্ছি। আমি বেশ প্রশান্তি অনুভব করতে লাগলাম। মহান আল্লাহর নিকট শোকর করলাম।

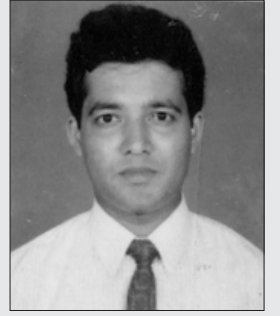
আপনাকে ধন্যবাদ দিলাম। আজ ২৭ ডিসেম্বর শুক্রবার চট্টগ্রাম কেন্দ্রে মাসিক মেডিটেশন শেষে সাজ্জাদ ভাইকে বলতে চেয়েও বলা হয় নি। পরে কেন্দ্র থেকে ফেরার পথে আত্মবাদ সেলের আহ্বায়ক এস.এম আলী নাদিম ভাইকে আমার ঘটনাটি ব্যক্ত করি। তিনি শুনে আপনার কাছে ঘটনাটি কেন্দ্রের মাধ্যমে লিখিতভাবে জানাতে উদ্বুদ্ধ করেন। তাই এ লেখা।

গুরুজী, আমার পরিবারের সাথে আমি খুবই আন্তরিক হতে চাই। আমি নিজে আমার সন্তানকে লেখাপড়ায় সহযোগিতা করতে চাই। এ ব্যাপারে আমার মনে হয় আপনার আন্তরিক দোয়া পেয়েছি। গুরুজী, আমি বিশ্বাস করি সমস্যা সমাধানের জন্য আমি আপনার দোয়া সব সময়ই পেতে থাকবো। এভাবে আপনি আমাকে স্নেহের পরশ দিয়ে আগলে রাখবেন এটাই কামনা করছি। গুরুজী আমি মাস্টার্স কোর্স করার জন্য খুবই আগ্রহী। আমাকে তৈরী হওয়ার জন্য নিশ্চয় আপনি দোয়া করছেন। প্রসংগত— আমার স্ত্রী মেডিটেশন কোর্স করার জন্য আগ্রহী কিন্তু আমাদের এক সন্তানের বয়স ২ বছর ৮ মাস। ছোট মেয়েকে আমি সামলাতে পারবো কি-না বুঝতে পারছি না। ওরা কখনো ওদের মা ছাড়া বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। চোখের আড়াল হলেই খুব কান্না শুরু করে দেয়। এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ চাচ্ছি।

গুরুজী, এ লেখার মধ্যে আমার সবধরনের ভুল-ত্রুটি ও অন্যায আদার ক্ষমার চোখে দেখবেন এবং আপনার দোয়া যেন সবসময়ই আমার সাথে থাকে— এ আশা ব্যক্ত করে, আপনার সুস্থতা, দীর্ঘায়ু কামনা করে এ পত্রের ইতি টানছি। আসসালামু আলাইকুম।

আপনার সুশীতল স্নেহের পরশে—
মো. আনোয়ারুল আজিম

[মো. আনোয়ারুল আজিম ১৩৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।]



আমি আশাবাদী

সালমা বেগম

আমার তেমন বড় কোনো শারীরিক সমস্যা ছিলো না। তবে খুব মাথা ব্যথা ছিলো। ব্যথা বেশি তীব্র হলে বমি চলে আসতো। কোর্স করার পর এ সমস্যা পুরোপুরি চলে গেছে। আমার মূল সমস্যা ছিলো আমি ভীষণ হতাশাগ্রস্ত এক মানুষ ছিলাম এবং তখনকার পরিস্থিতি এত জটিল ছিলো— মনে হচ্ছিলো এ থেকে আমার আর মুক্তি মিলবে না কোনো দিন। কিন্তু কোর্স পরবর্তী সময়ে আমি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এই সমস্যাটিকে কাটিয়ে উঠি।

আমি এখন অনেক আত্মবিশ্বাসী। বুটিকের মতো চমৎকার একটা পেশার সাথে নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছি। নিয়েছি বললাম এজন্য যে, আসলে এ পেশায় হুট করে আসা যায় না— আসতে হয় ধীরে ধীরে। তবে আমি আশাবাদী এই কাজটি আমাকে প্রতিষ্ঠা দেবেই। অথচ এমন একটা সময় গিয়েছে যখন আমি ঘরে-বাইরে সর্বত্র একটা বৈরী পরিবেশের মধ্যে ছিলাম। করার মতো তেমন কোনো কাজও পাচ্ছিলাম না। আবার ঘরে বসে করবো এমন কিছু জানা-শোনাও ছিলো না। কাজ বলতে তখন একটাই ছিলো— সারা দিন বসে বসে শুধু টেনশন করা। এরকম ভয়াবহ একটি সময়ে আমি কোয়ান্টাম



মেথডের এই কোর্সটি সম্পন্ন করি আমার চাচাতো বোনের উৎসাহে। কোর্স করার পর আমার চিন্তা-ধারার মাঝে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। চাকরির আশা ত্যাগ করে স্বাধীনভাবে কাজ করবো ঠিক করি। তখনই একজন শুভকাজক্ষীর উৎসাহে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় কাপড় প্রিন্টিংয়ের কোর্স করি এবং ঘরে বসে কাজ শুরু করি। প্রথম দিকে শুধু ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-বন্ধুদের থেকেই কাজের সুযোগ পেতাম। এজন্য বেশ চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু অটোসাজেশনের জোরে শেষ পর্যন্ত তা কাটিয়ে উঠি এবং মাটির ব্যাংকে মানত করে মনছবি দেখতে শুরু করি। বেশি দিন বসে থাকতে হয় নি, বিভিন্ন জায়গা থেকে কাজের অর্ডার আসতে শুরু করে। এখন আমি প্রচুর কাজ করার সুযোগ পাচ্ছি। তাছাড়া গ্রামের কিছু মহিলাকে ট্রেনিং দিচ্ছি— ইচ্ছে আছে এদের নিয়ে বৃহৎ পরিসরে কিছু কাজ করার।

[সালমা বেগম সিলেটে অনুষ্ঠিত ১১৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।]

রোগমুক্তি

সাহারা খানম

দীর্ঘদিন থেকে আমি সাইনুসাইটিস, গ্যাস্ট্রিক ও কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগছিলাম। তাই পরিচিত এক শুভকাজক্ষীর কাছে কোয়ান্টাম মেথডের কথা শুনে খুব কৌতূহলী হয়ে উঠি। পরে বেশ ক'মাস সিলেট কেন্দ্রের শুক্রবারের যৌথ মেডিটেশনে অংশ নিয়ে এর কার্যকারিতা সম্পর্কে নিশ্চিত হই এবং ১১০তম ব্যাচে অংশগ্রহণ করি। কোর্স পরবর্তী প্রায় মাস দেড়েক একটানা শুধুমাত্র শিথিলায়ন করেছি এবং তাতেই

আমি পুরোপুরি রোগমুক্ত হয়ে উঠি। এর পর কিছুটা অলসতায় পেয়ে বসে। বেশ ক'দিন মেডিটেশন করা থেকে বিরত থাকি। ফলে সাইনুসাইটিসের যন্ত্রণা অত্যন্ত তীব্রভাবে আক্রমণ করে বসে। তখন বাধ্য হয়েই ডাক্তারের শরণাপন্ন হলে তিনি ওয়াশ করতে বলেন। কিন্তু আমি তা না করে আরো মেডিটেশন করতে থাকি। ১৫/১৬ দিন পরে আমি পূর্ণ সুস্থতা লাভ করি। তাছাড়া আমি ডিসেম্বিতেও ভুগছিলাম। প্রায় প্রতিমাসেই একবার না একবার সমস্যা হতোই। নিরাময়ের মেডিটেশনের পাশাপাশি মাটির ব্যাংকে টাকা রেখে এখন আমি এ সমস্যা থেকেও মুক্ত। আর অন্যান্য সাফল্যের মধ্যে কোয়ান্টা ভঙ্গি যোগে তাৎক্ষণিকভাবে অনেক ঝামেলা থেকে মুক্তি লাভ তো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

তবে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, হল্যান্ড প্রবাসী আমার মেঝ ভাই দীর্ঘ তিনবছর পরিবারের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিলেন। কোর্সের পরে আমি নিয়মিত তাকে কমান্ড সেন্টারে এনে বোঝাতে থাকি। বেশ কিছু দিন এভাবে চালানোর পরে তিনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং এখনও পর্যন্ত তা অব্যাহত আছে।

[সাহারা খানম সিলেটে অনুষ্ঠিত ১১০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।]

অনুলিখন ৪ রাবেয়া ওয়াজীহা



খতমে কোরআন চিল্লা ও দোয়া অনুষ্ঠানের উপলব্ধি

আমার কাছে আমার খুব প্রিয়জনের একটি চিঠি এসেছে, কিন্তু চিঠির ভাষা আমি বুঝি না। তাই জানি না তাতে কি খবর আছে। আনন্দের খবর, নাকি ভয়াবহ কোনো দুঃসংবাদ; আশার কথা নাকি দুর্ভাগ্যের কথা; নাকি আমার করা উচিত এরকম কোনো জরুরী কাজের কথা। তখন আমি কি করবো? নিশ্চয়ই সে চিঠির মর্মোদ্ধার করার জন্যে সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা চালাবো। প্রিয়জনের বাণীকে বোঝার জন্যে যা যা করা দরকার তা-ই করবো। তাহলে পবিত্র কোরআনের বেলায় আমার দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিলো? এক অর্থে এটিও পরম করুণাময়ের পক্ষ থেকে আমাদের কাছে পাঠানো চিঠি। অথচ আমি ভেবেছি শুধু আরবী পড়লেই বোধ হয় সওয়াব হবে এবং এটুকুই যথেষ্ট। কিন্তু কোরআনে আল্লাহ্ মানুষকে উদ্দেশ্য করে সরাসরি যে কথাগুলো বলেছেন তা পুরোপুরি শোনার বা বোঝার চেষ্টা আমারও করা উচিত– এ সচেতনতা আমার আগে হয় নি– যা হয়েছে এবার খতমে কোরআন চিল্লায় অংশগ্রহণ করে। আরও মজার ব্যাপার হলো চিল্লায় কোরআন তেলাওয়াত ও তরজমার যে ক্যাসেটগুলো আমরা শুনেছি তার পুরো সেট গত পাঁচবছর ধরেই আমার বাসায় ছিলো। কিন্তু কখনোই এর পুরোটা এক সাথে শোনা হয় নি।

২০০২ সালের পবিত্র রমজান মাসে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত খতমে কোরআন চিল্লায় অশঃগ্রহণের অভিজ্ঞতা এভাবেই বর্ণনা করেছেন ১৩২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট অগ্রণী ব্যাংকে কর্মরত ডা. বেগম মনোয়ারা খানম।



ডা. বেগম মনোয়ারা খানম

কিন্তু শুধু জানা আর হেদায়েত লাভ এক কথা নয়; যদি সেই জানা হৃদয় পর্যন্ত না পৌঁছায়, ভেতরে যদি অনুরণন সৃষ্টি না করে, তাহলে তা কখনো মানা যায় না। ১৩৯ ব্যাচের ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, এ কথাটি কোরআন চিল্লার আখেরী দোয়ার দিনে অংশগ্রহণ করে বুঝেছি। কারণ একথাতো ঠিক যে, কোরআন যে ভাষায় নাযিল হয়েছে সেই আরবী যাদের মাতৃভাষা তাদের জীবনেও কিন্তু কোরআনের সেই প্রভাব পড়ে নি যা কোরআনকে বুঝতে পারলে ঘটতো। আবার আমাদের দেশেও অন্তত রমজান মাসে কোরআন পড়েন না এমন মুসলিম কমই আছেন। কিন্তু এই পড়া যেহেতু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তার মর্মমূলে পৌঁছায় না, তাই তার জীবনে কোনো পরিবর্তনও আসে না। অন্যায় ভুল অসৎ এবং পাপ কাজ তার দ্বারা হতেই থাকে।

তাই কোরআনকে অনুসরণ করার জন্যে

প্রয়োজন একে ভালবাসা। আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করা যে, এ কথাটাতো ভালো, এ কথাটাতো আমার জন্যে কল্যাণকর, মানুষের জন্যে কল্যাণকর। অতএব আমার এটি মেনে চলা উচিত। আর এই উপলব্ধির জন্যেই প্রয়োজন গভীর আত্মনিমগ্ন অবস্থায় কোরআনকে বোঝার চেষ্টা করা, যার সুযোগ খতমে কোরআন চিল্লার এ প্রোথ্রাম করে দিয়েছে। কারণ মৌনতার মাঝে ও ধ্যানের স্তরে একজন মানুষ যেরকম মনোযোগী থাকে, একাত্র থাকে তা আর অন্য কোনো সময় হয় না– বলেন ডা. হোসেন।

ধ্যানের স্তরেই সৃষ্টি হয় সত্যিকার মুক্ত মন যা যে কোনো জ্ঞান থেকে উপকৃত হওয়ার প্রথম শর্ত। তখনই উপলব্ধির দরজা খুলে যায় এবং অর্জিত হয় মুক্ত বিশ্বাস। কোরআন চিল্লা প্রসঙ্গে গুরুজীর এ আলোচনার প্রতিধ্বনি করেই যেন মোঃ আজহার আলী মিয়া বললেন, চিল্লায় অংশগ্রহণ করে আমি এমন এক অভূতপূর্ব উপলব্ধি পেয়েছি যা আমার বাকি জীবনকে নতুন করে পথ দেখাবে বলে আমি মনে করি।

তবে ১০১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট শিক্ষিকা সাজেদা খানম মনে করেন, কোরআনের পরিপূর্ণ উপলব্ধি একদিনে সম্ভব নয়। তিনি বলেন, পরপর তিনবার কোরআন চিল্লায় অংশ নেয়ার পরও আমার উপলব্ধি, দীর্ঘ ২৩ বছরে নাযিল হওয়া কোরআনের শিক্ষা এত ব্যাপক যে, যত বেশি এর অধ্যয়ন হবে, তত মূল শিক্ষার দিকে অগ্রসর হওয়া যাবে। তিনবার অংশ নিয়ে আমি প্রতিবারই নতুন উপলব্ধি অর্জন করেছি, একেক মুহূর্তে একেক অনুরণন সৃষ্টি হয়েছে।

খতমে কোরআন চিল্লার মোনাজাত অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী অনুসন্ধিৎসু অনেক মানুষ। তাদেরই একজন ৩৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট চাকরিজীবী বিশ্বজিৎ রায়। তিনি বলেন, কোরআন সম্পর্কে কৌতূহল ছিলো। কিন্তু গুরুজী যখন বললেন, কোরআনের শিক্ষা নতুন কিছু নয়, বরং স্রষ্টা যুগে যুগে দেশে দেশে যত বাণী বাহক পাঠিয়েছেন তাদের সেই বাণীরই আধুনিকতম ও পরিপূর্ণ রূপ হলো কোরআন। তাই যে কোনো মানুষেরই অধিকার রয়েছে এ থেকে নিজেকে উপকৃত করার। কোরআন সম্পর্কে এরকম স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়ার পর নিজেকে আর এ আসরে বেমানান মনে হয় নি। বরং কোয়ান্টামের উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি দেখে আরেকবার মুগ্ধ হয়েছি।

এখানেই মুক্তমন নিয়ে শোনার গুরুত্ব উপলব্ধি

করেছেন ১৩৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্রী শম্পা রায়। যে কোনো জ্ঞান, দর্শন বা মতবাদকে পুরোপুরি বুঝতে হলে সমস্ত পূর্ববর্তী ধ্যান-ধারণাকে কিছু সময়ের জন্যে দূরে সরিয়ে শুধু সেখানে কি বলা হচ্ছে তাতেই মনোযোগী হওয়া উচিত– গুরুজীর এ বক্তব্যের পর এই আখেরী মোনাজাতে একাত্র হতে তার কোনো দ্বিধা ছিলো না। মেডিটেশনে একাত্র হবার অনুভূতি তিনি এভাবে বর্ণনা করলেন– স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণের আবেগে সমস্ত শরীর কাঁপছিলো থর থর করে। আন্তরিক অনুশোচনায় চোখ বেয়ে নামছিলো জলের ধারা। সমস্ত অস্তিত্ব ছাপিয়ে একটি কথাই শুধু ধ্বনিত হচ্ছিলো, প্রভু, তুমি উদ্ধার কর। স্রষ্টাকে বোধহয় এত একাত্রচিত্তে ডাকি নি কখনো।

১৪৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট ব্যবসায়ী তিতাস ঘোষও প্রায় একই ভাষায় বললেন, পরিত্রাণ চেয়ে স্রষ্টার কাছে যে প্রার্থনা হয়, তা যে এত মর্মস্পর্শী হতে পারে, চোখের জল যে তখন এমনিই গড়ায়, তা উপলব্ধি করলাম সেদিনের মেডিটেশনে। এখনও এই অনুভূতি ঘিরে আছে আমাকে।

শুধু গ্রাজুয়েটই নয়, কোরআন চিল্লার এ প্রোথ্রামে ননগ্রাজুয়েটরাও অংশ নিয়েছেন। প্রিন্সিপাল নওয়াজেশ আরা ধানমন্ডির একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল পরিচালনা করেন। ব্যস্ততাকে সামাল দিয়ে দীর্ঘ আটদিনের এ প্রোথ্রামে অংশ নিয়েছেন তিনি। তার পর্যবেক্ষণ এরকম, চমৎকার ভাবগম্ভীর পরিবেশে একসাথে সবাই ধ্যানমগ্নভাবে কোরআন শোনার এ আয়োজনের প্রবর্তক হিসেবে কোয়ান্টাম অবশ্যই ধন্যবাদের দাবি রাখে। এমনকি আমি নিজেও উদ্বুদ্ধ হয়েছি আমার স্কুলের সর্গশ্রষ্টদের নিয়ে এই রমজানেই কিছুটা সময়ের জন্যে হলেও এরকম পরিবেশে কোরআন শোনার ব্যবস্থা করতে। আগামীবার আরও পরিকল্পিতভাবে এ ধরনের আয়োজন করার আশা রাখি ইনশাআল্লাহ।

গ্রাজুয়েট কন্যার কাছে শুনে এসেছিলেন মিসেস রোকিয়া বেগম। শারীরিক অসুস্থতার কারণে যেকানে পাঁচ মিনিট সৃষ্টির হয়ে বসাই তার জন্যে কঠিন সেখানে প্রতিদিন সাড়ে ছয়ঘণ্টা একটানা কোরআন চিল্লায় অংশ নিতে পেরে তিনি বিস্মিত। পরম করুণাময়ের অনুগ্রহে এরকম যৌথ চিল্লার প্রোথ্রামে ছিলেন বলেই এটি সম্ভব হয়েছে, এই বিশ্বাস তার।

কোরআনে করণীয় এবং বর্জনীয় কাজ প্রসঙ্গে গুরুজী সম্ভবত সহজতম ব্যাখ্যাটি দিয়েছেন। এ উদ্ধৃতি ৭৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট ব্যবসায়ী মির্জা আলী



শম্পা রায়



তিতাস ঘোষ



আবদুল্লাহ আল মামুন

আশরাফের। তিনি বলেন, যা কিছু নিজের ও অন্যের জন্যে কল্যাণকর তা করা এবং যা কিছু নিজের ও অন্যের জন্যে ক্ষতিকর তা না করা– কোরআনের এই মৌলিক বিষয়টি যখন একজন মানুষ অনুসরণ করতে শুরু করবে, তখনই তার পক্ষে সম্ভব পাপ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলা– এই ব্যাখ্যার পর এখন আমার সবকিছুই যেন সহজ সাধ্য হয়ে গেছে। নামাজের ব্যাপারে একসময় আমার মধ্যে গাফিলতি ছিলো। কিন্তু এবারের আলোচনায় গুরুজী যখন বললেন, নামাজ আসলে দিনে পাঁচবার প্রিয়তম প্রভুর সাথে বান্দার একান্তে দেখা করার, কথা বলারই অনন্য সুযোগ; আর এ অনুভূতি নিয়ে নামাজে দাঁড়ালে প্রতিবার নামাজেই আসতে পারে নতুন উপলব্ধি, নতুন আনন্দ– তখন থেকেই নামাজ অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে হৃদয়ের আকৃতি দিয়ে পড়ার চেষ্টা করছি।

১৩৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট বুয়েটের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র আবদুল্লাহ আল মামুনের অনুভূতি অনেকটা এরকম– কোরআনে নামাজ কায়েমের সাথে সাথে যাকাত আদায়ের কথা বলা হলেও এবারের চিল্লায়ই একথাটি উপলব্ধি করলাম যে, এর মাধ্যমে আসলে বিস্তবান হওয়ার জন্যেই উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কারণ যাকাত আদায়ের সামর্থ্য দরিদ্রের নয়, বিত্তবানের। কোরআনে যাকাত এহীতা নয়, যাকাতদাতা হবার কথাই বলা হয়েছে।

এবারের কোরআন চিল্লার দু’টি ব্যাচ এবং আখেরী দোয়ার অনুষ্ঠানটি পরম করুণাময়ের অনুগ্রহে ছিলো সার্থক আয়োজন। কারণ অবিদ্যা এবং অপজ্ঞানে নিমজ্জিত এই অস্থির সমাজকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে পারে একমাত্র স্রষ্টা প্রেরিত জ্ঞান ও শিক্ষা, যা রয়েছে পবিত্র কোরআনে– এই উপলব্ধিটি অন্তত সূচিত হয়েছে অংশগ্রহণকারীদের হৃদয়ে এবং কোরআনের এই আবেদনকেই তারা প্রতিফলিত করবেন নিজেদের জীবনে সেই প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে তাদের মধ্যে। যা ফুটে উঠেছে লালমাটিয়া মহিলা কলেজের ছাত্রী তৌহিদা আক্তার আবেদীনের ভাষায়, এই প্রোথ্রাম আমার চেতনাকে আলোড়িত করেছে। এখন মনে হয়, শুধু রমজান নয়, জীবনের প্রতি মুহূর্তে যদি কোরআনের বাণী শুনতে পারতাম তাহলে জীবনকে সত্যিকার অর্থে শুদ্ধ করতে পারতাম। স্রষ্টা ভালোবেসে যে জীবন আমাকে দান করেছেন তার ভালোবাসায় আমার জীবনকে নিয়োজিত করতাম।

ঢাকার বাইরে থেকে যারা এসেছিলেন : কোরআন চিল্লার আখেরী মোনাজাতে এসেছিলেন দেশের বিভিন্ন স্থানের কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েটগণ। রাজশাহী থেকে এসেছিলেন ফাতেমা জরীন, খালেদ ফেরদাউস ও ডা. মনিরুজ্জামান। তারা জানিয়েছেন তাদের উপলব্ধির কথা।

ফাতেমা জরীন বলেন, এই প্রোথ্রামের প্রতিটি মুহূর্ত ছিলো অনুভূতিময়। আমরা জানতাম আমরা

আল্লাহর কাছ থেকে এসেছি, আবার তার কাছেই ফিরে যাবো। কিন্তু সেদিনের মেডিটেশনের মাধ্যমে যেন এই সত্যের প্রকৃত উপলব্ধি হলো। খালেদ ফেরদাউস বলেন, গুরুজীর আলোচনা থেকে কোরআন সম্পর্কিত পুরানো কিছু বিতর্কের ব্যাপারে সঠিক তথ্য পেলাম। যেমন, জানতাম কোরআন হযরত ওসমান (রাঃ)-এর সময়ের আগে লিপিবদ্ধ হয় নি। কিন্তু সঠিক তথ্য হলো কোরআন নবীজীর জীবদশায়ই নাযিল হওয়ার সাথে সাথে সাহাবীদের দ্বারা বিভিন্ন মাধ্যমে লিপিবদ্ধ হতো। পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ হয় হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর আমলে। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর আমলে কোরআনের পঠনরীতি নির্ধারণ করা হয়।

ডা. মনিরুজ্জামান রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ক্লিনিক্যাল প্যাথলজিস্ট। ৮৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট ডা. মনিরের উপলব্ধি, সারাজীবন ধরে শতবার বিটা লেভেলে পড়েও কোরআনের সকল বিষয়ে সম্যক ধারণা পেতাম না যা পেয়েছি মেডিটেটিভ লেভেলে কোরআন চিল্লায় অংশগ্রহণ করে। আর গুরুজীর আলোচনায় পেলাম কোরআনের মূল শিক্ষার অত্যন্ত সহজ উপস্থাপন। তাহলো, এক আল্লাহর ইবাদত করা। নিজের ও অন্যের কল্যাণ করা এবং নিজের ও অন্যের অকল্যাণ থেকে বিরত থাকা। আমার বিশ্বাস এ প্রাণ্ডিগুলো স্রষ্টার পথে আমাদের এগিয়ে চলার বিশাল সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে।

প্রতিবেদক : রাবেয়া নাজনীন

ধ্যানের স্তর ও উপলব্ধি প্রিন্সিপাল ডা. মুহাম্মদ মাজেদুর রহমান

মাদ্রাসায় শিক্ষাগ্রহণ কালে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে পবিত্র কোরআনের তরজমা ও তাফসীর অধ্যয়নের পর শিক্ষকতা পেশার সুদীর্ঘ ৩১ বছর সময় কালেও কোরআন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাতেই সম্পৃক্ত ছিলাম নানাভাবে। অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির বুড়ি সমৃদ্ধ হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ, সন্দেহ নেই।

কিন্তু কোরআন চিল্লার আট দিনে ৪৫ ঘন্টায় সম্পূর্ণ কোরআনের তেলাওয়াত ও তরজমা ধ্যানমগ্ন অবস্থায় শোনা ও উপলব্ধি করা– এ অভিজ্ঞতা বর্ণনাভীত ও অনন্য। অংশগ্রহণকারী ছাড়া আর কাউকে তা বোঝানো যাবে না।

আমার ব্যক্তিগত উপলব্ধি ও লাভতো মনে হয় অনেকের তুলনায়ই বেশি। আল্লাহ কবুল করুন। আমার বিশেষ লাভ এই যে, একই বৈঠকে পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াত শোনার সাথে সাথে তার অর্থ, শানে নুয়ুল, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং তাফসীর একবার এবং তরজমা শোনার সময় আরেকবার স্মৃতির পাতায় ভাস্বর হয়েছে। আমি তন্ময় হয়েছি। উদ্বেলিত হয়েছি, অশ্রু বিসর্জন

করেছি এবং কোনো কোনো সময় নবী (স.)-এর সাথে একাত্ম হয়েছি– আলহামদুলিল্লাহ।

পবিত্র কোরআনের ধারাবাহিকতা এর আগে আমি কখনো এমন পরিস্কারভাবে উপলব্ধি করতে পারি নি, যা পেরেছি খতমে কোরআন চিল্লায়। কোরআনের পাতায় পাতায় মহানবী হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর চরিত্র আচার-আচরণ ও ব্যবহার যেভাবে পরিস্ফুট হয়েছে তা-ও এর আগে কখনো এমন গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারি নি। তাই গুরুজীর বক্তব্যে যে বিষয়টি বলা হয়েছে, অর্থাৎ কোরআন নাযিল হয়েছে ধ্যানের স্তরে এবং তাকে বুঝতে হলে ধ্যানের স্তরেই যেতে হবে, সে কথাটিই আরেকবার স্পষ্ট হলো।

[প্রিন্সিপাল ডা. আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ মাজেদুর রহমান ৫০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।]

কোরআনের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছি ডা. উম্মে জামিলা আক্তার মান্নি

কান্না যে এত সহজ হতে পারে, তৃপ্তির হতে পারে, তা কোরআন চিল্লার আখেরী মোনাজাতে অংশ না নিলে আমি বুঝতে পারতাম না। কারণ স্রষ্টার কাছে অনুতপ্ত বান্দার আন্তরিক নিবেদনের প্রার্থনা কান্না ছাড়া কোনোভাবেই প্রকাশ করা সম্ভব ছিলো না।

আবার কোরআন শ্রবণ এবং তারপর এ বিষয়ে গুরুজীর আলোচনা আমার সামনে কোরআনের গুরুত্বকে নতুনভাবে তুলে ধরেছে। তাহলো এখনকার ইলেক্ট্রনিক এবং প্রিন্টিং মিডিয়া এত গভীরভাবে গ্রাস করেছে আমাদেরকে যে, মুক্তমন বজায় রাখা এখন ভীষণ কষ্টকর।

পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী মিডিয়া প্রচারিত অবিদ্যা ও অপতথ্যের জোয়ারে বিভ্রান্ত আমরা। ফলে মিডিয়া আমাদের যা বোঝাতে চায়, আমরা তা-ই বুঝি। পাশ্চাত্যের রেফারেন্স থাকলেই তাকে পূজনীয় বলে মনে করি।

গুরুজীর আলোচনায় জানলাম, গ্রীক দার্শনিক এরিস্টোটলের রাষ্ট্র ভাবনায় ছিলো দু’টি শ্রেণীর অস্তিত্ব : অভিজাত শ্রেণী এবং দাস শ্রেণী। সাধারণ মানুষদের ভূমিকা ছিলো অধীনস্থ হিসেবে মুষ্টিমেয় কিছু অভিজাতদের সেবা করা। আর এই রাষ্ট্র চিন্তাই শত শত বছর ধরে আচ্ছন্ন করে রেখেছে আমাদেরকে।

অথচ কোরআনের শিক্ষা হলো মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই, নেই কোনো আশরাফ-আতরাফ। সে-ই শ্রেষ্ঠ যে ভালো মানুষ, যে বিশ্বাসী, যার হাতে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের সম্পদ ও সম্মান নিরাপদ।

আবার নারীর অধিকার রক্ষার ব্যাপারে ইসলামকে বাধা বলে প্রচার করেছে পাশ্চাত্য। কিন্তু বিস্তারিত আলোচনায় জানলাম কোরআনে নারীকে যে মর্যাদা দেয়া হয়েছে আজ পর্যন্ত কোনো দেশ, কোনো সভ্যতা তা দিতে পারে নি। শুধু তা-ই নয়, ইবাদতের যে ব্যাপক সংজ্ঞা তার আলোকে পৃথিবীতে নারীরাই যে বেশি ইবাদতের সুযোগ গ্রহণ করে থাকেন, সে সত্যটিও উপলব্ধি করলাম এ আলোচনায়।

[জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের মেডিক্যাল অফিসার ডা. উম্মে জামিলা আক্তার মান্নি ১৩২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।]

অপার্থিব অনুভূতি সুমন ধর

একজন সনাতন ধর্মাবলম্বী হিসেবে আমার কাছে কোরআন খুব পরিচিত কোনো বিষয় ছিলো না বা আমি ভাবতাম এটিতো আমার জন্য নয়। কিন্তু গুরুজীর আলোচনায় কোরআনের সার্বজনীন আবেদনের কথা শুনে আমারও মনে হলো কোরআন অবশ্যই সবার জন্য। যা কিছু ভালো ও পবিত্র তা থেকে সবাই উপকৃত হতে পারে। আর কোরআনের বাংলা অর্থ যখন ধ্যানের স্তরে শুনতে পেলাম– It was just like a new shock to me. কখনো ভাবি নি যে এভাবে উপলব্ধি করা যায়।

তারপর আরেক উপলব্ধিময় জগতে প্রবেশ করলাম আখেরী মেডিটেশনের মাধ্যমে। আমার কান্নার অভিজ্ঞতা খুবই কম। কিন্তু সেদিনের মেডিটেশনে এক মহান স্রষ্টার সামনে নতজানু হওয়ার অনুভূতি এত বাস্তব ছিলো যে, আকুল হয়ে কাঁদছিলাম। নিজের ভেতরে জমা হওয়া দুঃখ-কষ্ট ক্ষোভের বাষ্প উড়িয়ে দিতে দিতে ভাবছিলাম গুরুজী যেন আমার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সংকটের কথাই বলছেন। আমার ধারণা তখন প্রত্যেকেই ঠিক এভাবেই ভেবেছেন।

স্রষ্টার কাছে আন্তরিক প্রার্থনার আবেগে বারবার শিহরিত হচ্ছিলাম, রোমকূপগুলো দাঁড়িয়ে যাচ্ছিলো; এক অপার্থিব অনুভূতিতে ভরে যাচ্ছিলো মন। স্রষ্টার কাছে সমর্পণের এ অনুভূতি ভুলবার নয়, কিন্তু ঠিক ব্যাখ্যা করে বোঝাবারও নয়। গুরুজীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এই অনন্য অনুভূতি প্রাপ্তির সুযোগ আমাকে করে দেয়ার জন্য।

[সুমন ধর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিদ্যা বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র, ১১৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।]

অবিদ্যা সম্পর্কে জেনেছি তাহরিমা বিনতে আলম

খতমে কোরআন চিল্লার শেষদিন আমি অংশ নিয়েছিলাম। পুরো চিল্লা করতে পারি নি, কারণ রোজার পরপরই আমার পরীক্ষা ছিলো। শেষ দিন কোরআন থেকে কিছুটা তেলাওয়াত ও গুরুজীর আলোচনা এবং সবশেষে আখেরী মেডিটেশন-এ অংশ নিতে পেরে আমার খুবই ভালো লাগছে।

আমরা টেলিভিশনে যেসব সিনেমা, কার্টুন ইত্যাদি দেখি তা আসলে অবিদ্যা, শেখার মতো ভালো কিছু তাতে নেই। এ কথাটা আমি আমার বন্ধুদের সাথে আলোচনা করেছি। এখন আমি চেষ্টা করি টেলিভিশনের সবকিছু না দেখে বেছে বেছে ভালো কিছু প্রোথ্রাম দেখতে।

[তাহরিমা বিনতে আলম ভিকারুন্নিসা নুন স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। ১২৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।]



কোয়ান্টাম বুলেটিন - ৫

কোয়ান্টাম বুলেটিন - ৪

স্বেচ্ছা রক্ত কার্যক্রম উন্নয়ন তহবিল : দরদী মানুষের সম্মিলিত মানবিকতা

কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় স্বেচ্ছা রক্ত কার্যক্রম উন্নয়ন তহবিলের জন্যে অর্থ সংগ্রহ অভিযান পূর্ণোদ্যমে এগিয়ে চলেছে। গত ৩১ আগস্ট ঢাকায় অনুষ্ঠিত গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ থেকে গুরুজী এ কার্যক্রমের ঘোষণা দেন।

স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন-এর একটি অন্যতম সেবামূলক প্রকল্প। দেশের লক্ষ লক্ষ রোগীকে দূষিত রক্তের অভিশাপ থেকে রক্ষার জন্যে ফাউন্ডেশনের সদস্যবৃন্দ এক দশক ধরে স্বেচ্ছায় রক্তদান করে আসছেন। সুস্থ ও নিরাপদ রক্তের নিশ্চয়তায় ২০০০ সালে ফাউন্ডেশন ঢাকায় চালু করেছে নিজস্ব ল্যাব।

বর্তমানে এই ল্যাব থেকে সর্বসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতায় মাত্র দুবছরের মাথায় মাসে গড়ে ছয়শত ব্যাগ রক্ত সরবরাহ হচ্ছে। এই সময়ে এখান থেকে প্রায় ১২ হাজার মুমূর্ষু রোগীকে সুস্থ ও নিরাপদ রক্ত সরবরাহ করা হয়েছে।

এই মহান মানবিক কার্যক্রমে সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও একটি বিষয় একে গণ্ডিবদ্ধ করে রেখেছে। বর্তমান অবস্থায় ল্যাব থেকে শুধুমাত্র ‘হোল ব্লাড’ ও ‘আরসিসি’ সরবরাহ করা সম্ভব হয়। কিন্তু ফ্রিজ বোঝাই রক্ত থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় সুবিধাদির অভাবে প্লাটিলেট সরবরাহ করা যায় না। যার ফলে ডেঙ্গু আক্রান্ত বহু রোগীর আত্মীয়-স্বজন এখানে এসে বেদনাভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরে যান। অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকেন ফাউন্ডেশনের নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবৃন্দ।

এই সীমাবদ্ধতা নিরসনে কোয়ান্টাম ল্যাবের জন্যে সেন্ট্রিফিউজ মেশিন, ডিপ ফ্রিজ ও জেনারেটর সহ আরো কিছু মূল্যবান যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ গুরুজী এই তহবিল উন্নয়ন কার্যক্রমের ঘোষণা দেন। এর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ৪০০ লক্ষ টাকা। এ উদ্দেশ্যে ২০, ৫০, ১০০, ২০০, ৫০০ ও ১০০০ টাকা মূল্যমানের বিশেষ কুপন ছাড়া হয়েছে।

উপরউক্ত যন্ত্রপাতি সংগৃহীত হলে এক ব্যাগ রক্তের বিভিন্ন উপাদান পৃথক করে তা থেকে সহজেই তিন জন রোগীর জীবন বাঁচানো যাবে। শুধু ডেঙ্গু রোগীরাই নন, থ্যালাসেমিয়া সহ অন্যান্য রোগী– যাদের শুধুমাত্র রক্তের একটি বিশেষ উপাদান প্রয়োজন– সকলেই উপকৃত হবেন।

‘আপনার আন্তরিক দান বাঁচবে লক্ষ প্রাণ’ এই বাণীকে সামনে রেখে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে ফাউন্ডেশনের সদস্যবৃন্দ তহবিল উন্নয়নের জন্যে কাজ করে যাচ্ছেন। তারা নিজেরা সাধ্যানুযায়ী তহবিলে দান করছেন এবং আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদেরও দান করতে উদ্বুদ্ধ করছেন।

কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট শ্রী সরোদ চন্দ্র দাস একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন। ব্লাড ব্যাংকের জন্যে নিজের সাধ্যানুযায়ী অর্থ প্রদানের পর অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে অজান্তেই একটি বিরাট পুণ্য করেছে। এক ব্যাগ রক্ত থেকে তিন ব্যাগ রক্ত তৈরী

হবে এবং তাতে তিন জন মরণাপন্ন মানুষের জীবন বাঁচবে– এমন একটি প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত হতে পেরে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি।

রক্ত কার্যক্রম উন্নয়ন তহবিলের সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্যে ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ টিম গঠন করা হয়েছে। তারা সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে নির্দিষ্ট লক্ষ নির্ধারণ করে এ কার্যক্রমকে সফল করার জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। অনেক সদস্য বিশেষ মেডিটেশন বা চিন্তা সম্পন্ন করেছেন, যাতে তারা নিজেদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারেন।

ফ াউন্ডেশনের হাতিরপুল সেলের পরিচালক মোমিনুল ইসলাম রিংকু বিচিত্র অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন উন্নয়ন তহবিলের জন্যে কাজ করতে গিয়ে। তিনি একদিন সন্ধ্যায় যাচ্ছিলেন একজন গ্রাজুয়েটের বাসায় অর্থ সংগ্রহ করতে। পথিমধ্যে দু’জন লোক অস্ত্রের মুখে তার রিস্তার গতিরোধ করলো। পিস্তল ঠেকিয়ে তার স্বর্ণের চেইন, মোবাইল ফোন, আংটি, টাকা ইত্যাদি যা আছে তাদের দিয়ে দিতে হুকুম করে বললো, ‘জীবন দিবি না মাল দিবি’। ঘটনার আকস্মিকতায় মোমিনুল ইসলাম এতটুকু বিচলিত হলেন না। শান্তভাবে তাদের বললেন, আমি অসহায় মানুষের জীবন বাঁচাতে অর্থ সংগ্রহে বেরিয়েছি। ছিনতাইকারীরা তখন তার হাতের আংটিটি চাইলো। তিনি আব্বারো নির্বিকার ভঙ্গিতে বললেন, এর সাথে আমার অনেক স্মৃতি জড়িত, এটা দিতে পারবো না, আপনারা আমার মানিব্যাগটি নিতে পারেন, এতে ১০০ টাকা আছে। তখন ছিনতাইকারীরা কিছুক্ষণ তার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে উন্টো তার মানিব্যাগটি ফেরত দিয়ে তাকে সেখান থেকে চলে যেতে বললো।

অথচ তখন তার হাতের ব্যাগে রয়েছে মোবাইল, উন্নয়ন তহবিলের কুপন, ব্যক্তিগত টাকা এবং সংগৃহীত অর্থ সহ প্রায় ৮০ হাজার টাকা।

এই বিস্ময়কর ঘটনা সম্পর্কে মোমিনুল ইসলাম বলেন, আসলে এ সময় আমি পুরোপুরি প্রশান্ত ছিলাম এবং আমি বিশ্বাস করি মানবতার কল্যাণে কাজ করছি বলে পরম করুণাময়ের রহমতে ও গুরুজীর দোয়ায় আমার কোনো ক্ষতি হয় নি। যার সন্তুষ্টির জন্যে মানুষ দান করছে তিনিই তাদের সেই দানের অর্থকে রক্ষা করেছেন।

গত ২২ নভেম্বর ছিলো ঢাকায় খতমে কোরআন চিন্তার আখেরী দোয়া অনুষ্ঠান। এদিন গুরুজী সকলকে তাদের আসন্ন ঈদের খরচের দশ শতাংশ উন্নয়ন তহবিলে দান করার উদাত্ত আহ্বান জানান। তাৎক্ষণিকভাবে এক মহিলা গ্রাজুয়েট রুমালে বেঁধে তার মূল্যবান স্বর্ণের ২টি বালা গুরুজীর হাতে তুলে দেন উন্নয়ন তহবিলের জন্যে। আরো একজন মহিলা সাদা খামে ভরে নিভূতে দিয়ে যান ৫০ হাজার টাকা।

চট্টগ্রামের গ্রাজুয়েট এস.এম. আলী নাদিম তার ঈদের বাজেট থেকে দশ ভাগ অর্থ আলাদা করে রাখেন উন্নয়ন তহবিলে জমা দেবেন বলে। একটি ফিল্মড প্রাইজের দোকান থেকে তিনি নিজের জন্যে শপিং করেন। ‘একদাম’ জেনেও তিনি দর কষাকষি

করেন এবং দোকানের সেলসম্যানও তাকে নির্ধারিত মূল্য থেকে প্রায় দশ ভাগ ছাড় দেন। এ প্রসঙ্গে নাদিম বলেন, গুরুজী বলেছিলেন ঈদের খরচ থেকে বাঁচিয়ে দান করলে আল্লাহ বরকত দেবেন। কিন্তু তা এভাবে হুবহু ফলে গেছে দেখে বিস্মিত হয়েছি এবং তহবিল উন্নয়নে কাজ করতে আরো অনুপ্রাণিত হয়েছি।

ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন ২ জন দায়িত্বশীল। উদ্দেশ্য রক্ত কার্যক্রম উন্নয়ন তহবিলের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ ও সদস্যদের উদ্বুদ্ধকরণ। বিভিন্ন সেলের মতো তারা মহিলা সেলেও বক্তব্য রাখেন। তাদের বক্তব্য শেষে এক মহিলা গ্রাজুয়েট তাদেরকে সঙ্গে করে নিজের বাসায় যান এবং তাদের হাতে নিজের সম্বিত ৩০ হাজার টাকা তুলে দেন।

ব্যবসায়ী মো. জুলফিকার রহমান স্বপন তার প্রতিদিনের ইফতারের খরচ থেকে অর্থ বাঁচিয়ে তা একটা বাস্ত্বে রেখে সে টাকা উন্নয়ন তহবিলে জমা দিয়েছেন।

শুধু কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যবৃন্দই নয়, অর্থ সংগ্রহ কার্যক্রমে তাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যবৃন্দও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করছেন। তারা শুধু নিজেরাই দান করছেন তা নয়, কুপন সংগ্রহ করে অন্যদের কাছ থেকে দান গ্রহণ করে তহবিলে জমা দিচ্ছেন।

এ মহান মানবিক কর্মকাণ্ডে শিশুদের অংশগ্রহণও লক্ষ্য করার মতো। এমন অনেক শিশুর একজন তাসমিহা আমিন ঐশী। বয়স ৫ বছর। বাবা-মায়ের সাথে মাঝে মাঝে সবুজবাগ শাখায় আসে। একদিন এখানে কুপন বিতরণ দেখে ও বক্তব্য শুনে সে-ও কুপন কিনতে উদ্বুদ্ধ হয়। মাকে বলে কুপন কিনে দিতে। কিন্তু ব্যাগে বেশি টাকা না থাকায় মা পরের শুক্রবারে কুপন কিনে দেবেন বলেন। কিন্তু ছোট মনি ঐশী অনেকটা বড়দের ভঙ্গিতে বলে, বাসায় যাবার রিস্তা ভাড়া রেখে বাকি টাকা দাও না। মা দেখেন মাত্র ২০ টকাই দেয়া যাচ্ছে তখনকার মতো। ঐশী তাতেই খুশি। ২০ টাকার একটি কুপন কিনে দেয়া হলো তাকে।

এভাবেই ছোট বড় অনেক দান, গ্রাজুয়েট ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ পর্যন্ত ৩০ লক্ষাধিক টাকা সংগৃহীত হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে বাকি ১০ লক্ষ টাকাও সংগৃহীত হবে। ল্যাবের কর্মকাণ্ডে সংযুক্ত হবে সেন্ট্রিফিউজ মেশিন– একটি নতুন মাত্রা– নতুন অধ্যায়। পূরণ হবে একদল অনুভূতিশীল মানুষের সম্মিলিত মনছবি। ল্যাব থেকে কোনো মুমূর্ষের স্বজন আর রক্তের অভাবে ফিরে যাবেন না। নিয়ে যাবেন মানবতার সদা কল্যাণকামী এক দল দরদী মানুষের সম্মিলিত উপহার এক ব্যাগ রক্ত– যার কোনো বিকল্প নেই।

প্রতিবেদক : মোহাম্মদ রায়হান



বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত বিজয় দিবস র্যালির কুচকাওয়াজে প্যারেডে অংশ নিচ্ছে কোয়ান্টাম শিশুকাননের ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা।

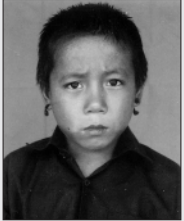
বান্দরবানের বিজয় দিবস র্যালির কুচকাওয়াজে প্রথম পুরস্কার অর্জন করলো কোয়ান্টাম শিশুকানন

প্রথমবার অংশগ্রহণ করেই সবাইকে চমকে দিলো ক্ষুদে শিশুরা। গত ১৬ ডিসেম্বর ২০০২ বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত বিজয় দিবস র্যালির কুচকাওয়াজে ২১টি স্কুলের মধ্যে প্রথম পুরস্কার অর্জন করেছে কোয়ান্টাম শিশুকানন। সেই সাথে ‘আমাদের দেশটা স্বপ্নপুরী’ গানের সাথে ডিসপ্লে পরিবেশন করে পেয়েছে তৃতীয় পুরস্কার। প্রায় নাম না জানা একটি প্রতিষ্ঠানের এই বিস্ময়কর কৃতিত্ব উপস্থিত সকল অংশগ্রহণকারী ও

শিশুকাননের চিঠি

শ্রদ্ধেয় গুরুজী,
আমার সালাম নেবেন।
আশা করি ভাল আছেন।
পরম করুণাময়ের কৃপায় আমি ও বেশ ভালআছি।

পরসংবাদ আমার ত্রুখানে খুব ভাল লাগে।
আমাদের প্রথম এবং দ্বিতীয় পাক্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে।
তাতে আমি প্রথম হয়েছি।
নভেম্বর ১৪ তারিখে আমাদের বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হবে।
আমাদের সবাইকে দোয়া করবেন।
যেন ভাল ফলাফল করতে পারি।
প্রত্যক দুই সপ্তাহ পর পর আমাদের এখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।
আমাদের সবার খুব ভাললাগে।
কেউ গান গায়, কেউ নাচ করে, আবার কেউ অভিনয় করে।
আমাদের কে আরো সবাই কে দোয়া করবেন।
যাতে ভাল করে নাচ গান এবং অভিনয় করতে পারি।
এখানে একটি দেয়ালিকা বাহির করছেন।
তাতে আমরা গান গেয়ে উদ্বোধন করেছি।
তা আমাদের খুব ভাল লাগে।
আল্লা আপনাকে যেন অনেক দিন ভাছিয়ে রাখেন।
আপনারা সুস্থ থাকুন ভাল থাকুন আজ আমার লিখা একানেই শেষ করছি।
ইতি–
নানওয়াই মুরং (ছোট)
২য় শ্রেণী, রোল-৯



অতিথিদের মাঝে আলোড়ন সৃষ্টি করে।
বান্দরবান জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মিসেস ম্যামাচিং পুরস্কার বিতরণ করেন।

কেয়াজুপাড়া পুলিশ ফাঁড়ির আইসি জনাব আলতাফ হোসেনের তত্ত্বাবধানে ছাত্রদের মার্চ পাস্টের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

লামায় দুই দিনব্যাপী দন্ত শিবির অনুষ্ঠিত

গত ৮ ও ৯ ডিসেম্বর রবি ও সোমবার লামাস্থ কোয়ান্টাম মেডিটেশন সেন্টারে দুইদিন ব্যাপী বিনামূল্যে দন্ত চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর লামায় এটি ২য় দন্ত চিকিৎসা শিবির। দূর-দূরান্ত থেকেও অনেক রোগী এই শিবিরে চিকিৎসা লাভের জন্যে আসেন।

দুই দিনে মোট ১০৬ জন রোগীকে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়। এর মধ্যে পুরুষ ছিলেন ৮৬ জন ও মহিলা ২০ জন। দাঁত তোলা হয়েছে ৫২টি।

শিবিরে আগত সকল রোগী ও শিশুকাননের শিক্ষার্থীদেরকে চিকিৎসা ও ওষুধ প্রদানের পাশাপাশি দাঁতের পরিচর্যার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

এ শিবিরের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিলো সকল রোগীকে পূর্ণ মেয়াদ ওষুধ প্রদান করা।

দন্ত শিবির পরিচালনা করেন বিশেষজ্ঞ দন্ত চিকিৎসক ডা. হাবীবুর রহমান।

শ্রদ্ধেয় গুরুজী,
আমার সালাম নেবেন।
আশা করি ভাল আছেন।
পরম করুণাময়ের কৃপায় আমি ও বেশ ভালআছি।

পরসংবাদ আমার ত্রুখানে খুব ভাল লাগে।
আমাদের প্রথম এবং দ্বিতীয় পাক্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে।
তাতে আমি প্রথম হয়েছি।
নভেম্বর ১৪ তারিখে আমাদের বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হবে।
আমাদের সবাইকে দোয়া করবেন।
যেন ভাল ফলাফল করতে পারি।
প্রত্যক দুই সপ্তাহ পর পর আমাদের এখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।
আমাদের সবার খুব ভাললাগে।
কেউ গান গায়, কেউ নাচ করে, আবার কেউ অভিনয় করে।
আমাদের কে আরো সবাই কে দোয়া করবেন।
যাতে ভাল করে নাচ গান এবং অভিনয় করতে পারি।
এখানে একটি দেয়ালিকা বাহির করছেন।
তাতে আমরা গান গেয়ে উদ্বোধন করেছি।
তা আমাদের খুব ভাল লাগে।
আল্লা আপনাকে যেন অনেক দিন ভাছিয়ে রাখেন।
আপনারা সুস্থ থাকুন ভাল থাকুন আজ আমার লিখা একানেই শেষ করছি।
ইতি–
সুমন তনচংগ্যা
২য় শ্রেণী, রোল-১১

শিশুকানন স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি

কোয়ান্টাম শিশুকাননে ২০০৩ সেশনে ৫০ জন নতুন আবাসিক ছাত্র ভর্তি করার লক্ষ্যে গত ২১ ও ২২ ডিসেম্বর ২০০২ (শনি ও রবিবার) অনুষ্ঠিত ভর্তি পরীক্ষায় প্রায় তিনশতাধিক শিশু অংশগ্রহণ করে। ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্বে ছিলেন শিশুকাননের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি বাবু তিনকড়ি চক্রবর্তী, ইঞ্জিনিয়ার হুমায়ুন কবির, সর্দার এম নুরুজ্জামান প্রমুখ। ভর্তিচ্ছু শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন ডা. মো. মনিরুজ্জামান। ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পার্শ্ববর্তী এলাকা ছাড়াও আলীকদম, রোয়াংছড়ি, ইত্যাদি দূরবর্তী অঞ্চলের শিশুরাও ছিল।

জন্মদিনে অভিনন্দন জানানোর চট্টগ্রামের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

আজ অন্তত একটি ভালো কাজ করুন– এই বার্তা পৌছানোর মাধ্যমে গ্রাজুয়েটদের জন্মদিনে অভিনন্দন জানানোর ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিয়েছে ফাউন্ডেশনের চট্টগ্রাম কেন্দ্র। কেন্দ্রের প্রবেশদ্বারে স্থাপন করা হয়েছে খ্রিটিংস বোর্ড, যাতে প্রতিদিন প্রদর্শিত হচ্ছে নির্দিষ্ট তারিখে জন্মগ্রহণকারী গ্রাজুয়েটদের নাম। চট্টগ্রামে কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা যে কোনো একটি ভালো কাজের মধ্য দিয়ে জন্মদিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে সচেষ্ট থাকেন। সেই কাজটি হতে পারে এক ব্যাগ রক্ত দেয়া, মাটির ব্যাংকে বিশেষ অর্থ রাখা, একটি গাছ লাগানো, কুপন কেনা কিংবা একজন রোগীর শয্যাপাশে দাঁড়ানো। এদিন তারা এমন একটি প্রতিজ্ঞা করেন যা সারাজীবন পালন করবেন।

শ্রদ্ধেয় গুরুজী,
আমরা সালাম নেবেন।
আশা করি ভাল আছেন।
পরম করুণাময়ে কৃপায় আছি বেশ।
ভাল আমি।
এখানে আমরা খুব ভাল লাগছে।
আমাদের একটা ভিসিআর লাগবে।
আমাদের ক্যাসেট লাগবে।
আমাদের সাইকেল একটা করে লাগবে।
আমাদের বুট জুতা লাগবে।
আমাদের ঘড়ি একটা করে লাগবে।
আমাদের টর্চ লাগবে।
আমাদের গান খাতা লাগবে।
আমার জন্য দোয়া করবে।
আমি যাতে পরীক্ষায়তে প্রথম হতে।
পড়ি।
আমরা পেন্সিল দিয়ে লিখতে চাইনা।
কলম দিয়ে লিখতে চাই।
আমরা কলম দিয়ে লেখা সুন্দর।
মাজীকে সালাম নেবেন।
মাজী ভাল আছেন।
আমাদের খাওয়া দাওয়া খুব ভাল।
ইতি–
কাইংপ্রেমুরং
প্রথম শ্রেণী, রোল ৭

[ডিসেম্বরের কোয়ান্টাম বুলেটিনে শিশুকাননের ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের বেশ কয়েকটি চিঠি আমরা প্রকাশ করেছি। বর্তমান সংখ্যায় আরো ৩টি চিঠি প্রকাশিত হলো কোনোরকম সম্পাদনা ছাড়া।]

কোয়ান্টাম বুলেটিন - ৬

কোয়ান্টাম বুলেটিন - ৭

গুরুজীর সাথে ঈদ মোলাকাত কোয়ান্টাম পরিবারের প্রতিটি সদস্যের জন্যে অনাবিল আনন্দের বারতা নিয়ে আসে। অন্যান্য বারের মতো এবারও পরিবারের সদস্যরা গুরুজী ও মা-জীর সাথে পবিত্র ঈদুল ফিতরের দিনটিতে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

ঈদের নামাজ শেষ হবার পরপরই জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর গ্রাজুয়েট ও অতিথি গুরুজীর বাসায় সমবেত হতে থাকেন। সবাইকে দরজায় দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানান গুরুজী ও মা-জী। এবারে ঈদ মোলাকাত অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছিলো গুরুজীর চামেলিবাগস্থ বাসার ৬ষ্ঠ তলায় অবস্থিত বিশাল হল রুমটিতে।

পর্যায়ক্রমে সহস্রাধিক গ্রাজুয়েট ও অতিথির আগমনে হল রুমটি মুখরিত হয়ে ওঠে। পরিবার-পরিজন বন্ধু-স্বজনের সাথে মিলে দল বেঁধে গ্রাজুয়েটরা আসতে থাকেন এক উচ্ছ্বাসিত প্রাণের আনন্দে। গুরুজীর সাথে কোলাকুলি করার এই অপূর্ব সুযোগটি কেউ হাতছাড়া করতে চান নি! তাই চটুখামের গ্রাজুয়েট মোহাম্মদ সিরাজুল হক চৌধুরি এবার ঢাকায় ঈদ করার সুযোগে সকাল সকাল চলে আসেন এখানে। সাথে রয়েছে তার চাচাতো ভাই। বললেন, বিভিন্ন সময় আমরা গ্রাজুয়েটরা একত্রিত হলেও, পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে এমন সম্মিলন খুব একটা হয় না। সকলের সাথে একত্রে গুরুজীর সান্নিধ্য পেয়ে আমি খুব আনন্দিত। আসলে এ অনুভূতি অংশগ্রহণকারী সকলের।

প্রতিবারের মতো এবারও মা-জী নিজ হাতে তবারক বিতরণ করছিলেন। মা-জী বরাবরই অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তার অনুভূতির কথা বলেন। পরিবারের অনেকের সাথে একত্রিত হতে পেরে তিনি তার ছোট বেলার কথা স্মরণ করেছেন। বললেন, আমাদের গ্রামের বাড়িতে তখন ঈদের সময় প্রচুর লোক সমাগম হতো। আমার মা খুব ভালো রান্না করতেন এবং যত্নসহকারে অতিথিদের পরিবেশন করতেন। ছোটবেলা থেকেই মা-জী তাই এই গুণ পেয়েছেন। তিনি বলেন, আমি তখন ডেকচি উঠাতে পারবো না বলে অন্যরা উঠিয়ে দিতো আর আমি রান্না করতাম। আজও সবাইকে নিজের হাতে খাবার পরিবেশন করতে পেরে আমার খুব ভালো লাগছে।

কথা হচ্ছিলো ফাউন্ডেশনের সবুজবাগ শাখার পরিচালক মিসেস মাসুদা আকতার আবেদীনের সাথে। তার কাছে গুরুজীর সান্নিধ্যে এসে ঈদের

অনাবিল আনন্দে অবগাহন ॥ গুরুজীর সাথে ঈদ উদযাপন



গুরুজীর সাথে ঈদ মোলাকাত অনুষ্ঠানের সর্বকনিষ্ঠ অতিথি প্রজ্ঞা প্রতাপ ঘোষ।

আনন্দ শেয়ার করা একটি পূর্ণতার ব্যাপার। এখানে না এলে ঈদের আনন্দ অপূর্ণ থেকে যেত। তিনি বলেন, এক জন মহিলার পক্ষে এমন দিনে ঘর থেকে বের হওয়া খুব কঠিন। তবুও ঈদের সকালের কাজগুলো আগেভাগে গুছিয়ে নিয়ে এ সময়টুকু বের করতেই হলো, ঈদের আনন্দের পরিপূর্ণতার জন্যে এটা প্রয়োজন ছিলো।

গুধু বড়রই নয়, বিপুল সংখ্যক শিশু-কিশোরের উপস্থিতিতে মুখরিত ছিলো অনুষ্ঠানটি। ফয়সাল এসেছে তার বাবা-মায়ের সাথে। পড়ে ক্লাস টু'তে। সে বলেছে, 'গুরুজী দাদা'র সাথে দেখা করতে এসেছি। ফয়সাল ওর ছোট বোন সায়মা কেও এনেছে। আবার রোকেয়া ও রাবেয়া দুই বোন তাদের মাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। এদের পরিবারের সবাই গ্রাজুয়েট। গুরুজীর সাথে ঈদ মোলাকাতের এই সুযোগকে এ পরিবার সব সময়ই খুব গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

অনেক দিন পর দেখা গেল মওলানা ফেরদৌসকে। পেশাগত কারণে ঢাকার বাইরে থাকায় তিনি অন্যান্য অনুষ্ঠানে নিয়মিত উপস্থিত হতে পারছেন না। দেশের একটি বিখ্যাত আধ্যাত্মিক পরিবারের অন্যতম সদস্য মওলানা ফেরদৌস তার অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, ঈদ মানে আনন্দ। অকৃত্রিমতার মধ্য দিয়ে প্রকৃত আনন্দের স্বাদ পাওয়া যায়। এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমি গুরুজী ও মা-জীর অপার মমতাকে অনুভব করছি।

এখানকার চমৎকার ব্যবস্থাপনা এবং এমন আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা বিনিময়

আজকাল খুব কম জায়গায় দেখা যায়। এখানকার সামগ্রিক পরিবেশ আমার খুব ভালো লেগেছে। কথাগুলো বলেছেন খিলগাঁও-এর ব্যবসায়ী মোহাম্মদ আজীম। অনেক অতিথির মতো তিনিও এসেছেন তার এক গ্রাজুয়েট বন্ধুর সাথে।

অত্যন্ত ব্যস্ততার সাথে মা-জীকে তবারক বিতরণে সাহায্যে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম সকলের প্রিয় প্রাণজিত লাল শীল। কোয়ান্টিয়ার প্রাণজিত এ অনুষ্ঠানকে নিজের পরিবারেরই অনুষ্ঠান মনে করেন।

ডা. মো. রাশেদুল হাসান শততম ব্যাচের গ্রাজুয়েট। সিলেটের ওসমানী মেডিক্যাল চাকরিরত। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন তার পরিবারের অন্য ৪ জন সদস্যকে সাথে নিয়ে। বললেন, আমি প্রতি ঈদেই এখানে আসি। নতুন ও পুরাতন অনেকের সাথে দেখা হয়। এ এক অসাধারণ উৎসব। দিনটি ছিলো জুমা বার। জুমার নামাজের আগ পর্যন্ত অতিথিদের উপস্থিতি ছিলো একই রকম। পুরো সময়টা ছিলো ভীষণ আনন্দঘন ও উৎসবের আমেজে ভরপুর। প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী সাজেদুল হক রুবেলের একটি মন্তব্য দিয়ে এই লেখার ইতি টানা যেতে পারে। তিনি বললেন, ঈদের মতো একটা ব্যস্ত দিনেও যে আমরা এখানে একত্রিত হতে পেরেছি, সেটাই বড় বিষয়। এটা আসলে এমন একটা বড় পরিবার যা আমাদের ট্রাডিশনাল পরিবারের চাইতে কোনো অংশে কম কার্যকর নয়।

প্রতিবেদক : মোহাম্মদ রায়হান

এ কোর্স করার জন্য স্ত্রীর উপর স্বামী এবং স্বামীর উপর স্ত্রী জোর খাটাতে পারেন সুলতানা রাজীয়া বেগম

এ কোর্স করতে মূল উৎসাহ দিয়েছেন আমার স্বামী। তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

বহু বছর ধরে তিনি আমাকে উদ্বুদ্ধ করছিলেন। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছেন কিন্তু জোর করেন নি। কারণ জোর করা নাকি নিষেধ।

আমার একটা প্রস্তাব থাকবে- এ মহিমাশ্রিত কোর্স করার জন্য স্ত্রীর উপর স্বামীর এবং স্বামীর উপর স্ত্রীর জোর খাটানোর নতুন আইন পাশ করা যেতে পারে। কেননা এটা উভয়ের জন্য উপকারী।

৩য় দিন গুরুজী পুরষদের উদ্দেশ্যে বললেন, তারা যেন তাদের স্ত্রীদের প্রতিদিন সকালে ও বিকেলে 'আমি তোমাকে ভালবাসি' কথাটি বলেন। গুরুজী উপদেশটি নিশ্চয়ই প্রতি কোর্সেই দিয়ে থাকেন। কিন্তু আমাদের বাসায় এ কথাটি কখনো শোনা যায় নি। গুরুজী, আপনার ছাত্ররা এ উপদেশের ব্যাপারে মোটেই যত্নবান নন। তাদের ধারণা, গুরুজীর কাছে তো আর কেউ অভিযোগ করবে না।

আজ কোর্সের শেষ দিনে যে আত্মমূল্যায়ন পত্র জমা দিলাম সেখানে আর একটি প্রশ্ন যোগ করার প্রস্তাব করছি। তা হলো, আপনার স্বামী কি আপনাকে প্রতিদিন সকালে ও বিকেলে 'আমি তোমাকে ভালবাসি'- এ কথাটি বলেন? গুরুজী, আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, প্রতিক্ষেত্রে এর উত্তর 'না' পাবেন। দায়ী কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েটদের এ ক্ষেত্রে লঘু শাস্তি দেয়ার প্রস্তাব করছি।

তবে আমার স্বামী একজন ভ্রমণ বিলাসী মানুষ। তিনি যত দেশ ঘুরেছেন আমাকে সঙ্গে নিয়েই ঘুরেছেন। যা তার ভালবাসার বহির্প্রকাশ। তাই তাকে এবারের মতো ক্ষমা করার অনুরোধ করছি। তিনি কানে কানে বলেছেন এবার আমাকে লামায় নিয়ে যাবেন।

কোয়ান্টাম পরিবারে शामिल হতে পেরে আমি মহান রাব্বুল আলামীনের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

[গৃহিণী সুলতানা রাজীয়া বেগম ১৫৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।]



কোয়ান্টাম বুলেটিন : জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০০৩। সম্পাদক : কাজী মাহতাব উদ্দিন আহমদ ॥ নাহার আল বোখারী, পরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ১১৯/পি শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ ফোন : ৯৩৪১৪৪১, ৮৩১৯৩৭৭



কোয়ান্টাম মেথডের আবেদন সার্বজনীন ফেরদৌসী মজুমদার

কোয়ান্টাম কোর্সে অংশ গ্রহণ করতে এসে আমি একটি মজার প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলাম। একজন জিজ্ঞেস করেছিলো, আপনি এত সফল, আরও সাফল্য চান? কিন্তু আমার মনে হলো আসলে সাফল্যের কি শেষ আছে? তবে আমার অভিজ্ঞতা কিছুটা ভিন্ন। দীর্ঘ ২৭ বছর ধরে নাট্যাঙ্গনের পাশাপাশি পেশাগত জীবনের ব্যস্ততাকে সামাল দিতে গিয়ে অবিশ্রান্ত ছুটেছি, ইচ্ছে মতো দাপিয়ে বেড়িয়েছি। সেই আমি যখন আর্থরাইটিস আক্রান্ত পায়ে ব্যথায় কষ্ট পাই, কিছুক্ষণ হাঁটলে বা বসে থাকলেই অস্বস্তি বোধ করি, তখন স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা হতাশ হয়ে পড়ি। এই কষ্ট নিয়েই থাকতে হবে—এটাই ছিলো আমার ধারণা। কিন্তু কোর্সের দ্বিতীয় দিন গুরুজী এত দৃঢ়তার সাথে আশার বাণী উচ্চারণ করলেন যে, আমাকে আশ্বাসন হতেই হলো। এখন মনে হচ্ছে, আমার পা ভালো হয়ে যাবে।

কোয়ান্টাম কোর্সটিকে আমার অত্যন্ত সুপরিচিন্ত এবং ফলপ্রসূ মেথড বলে মনে হয়েছে। কারণ জীবনের জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো গুরুজী যেভাবে যুক্তি ও উদাহরণের মাধ্যমে চমৎকার উপস্থাপন শৈলীতে তুলে ধরেছেন, তা মানুষের মনে গেঁথে যাবেই। আমি বিস্মিত এবং অভিভূত।

কোর্সের যে কয়েকটি বিষয় আমি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছি তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে প্রশান্তি। প্রশান্তির যে শিক্ষা গুরুজী শিখিয়েছেন এবং নিজেও চর্চা করে দেখিয়েছেন তাতে আমি ভীষণ অনুপ্রাণিত। এখন নিজের জীবনে তা প্রয়োগ করার চেষ্টা করছি।

কোর্সের ব্যাপারে আরেকটি বিষয় না বললেই নয়, তাহলো এর সার্বজনীন আবেদন। অর্থাৎ ধর্মকে বাদ দিয়ে নয় বা কোনো বিশেষ ধর্মকে শ্রেষ্ঠ করে বা অবজ্ঞা ভরে তুলে ধরেও নয়, সকল ধর্মের সকল মানুষের জন্যে গ্রহণযোগ্য হিসেবেই এ কোর্স আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে। এ এক বিরল বৈশিষ্ট্য।

[জাতীয় নাট্য ব্যক্তিত্ব ফেরদৌসী মজুমদার ১৫৬ ব্যাচের কোর্সে অংশগ্রহণ করেন।]

কোয়ান্টাম বুলেটিন মে ২০০৩

‘অবিদ্যা’ শীর্ষক গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপে গুরুজী সত্যিকারের জ্ঞানী এবং শিক্ষিত তিনিই যিনি জানেন এবং মানেন

সত্যিকারের জ্ঞানী এবং শিক্ষিত তিনিই, যিনি জানেন এবং মানেন। অর্থাৎ যিনি শিক্ষাকে শুধু জানা পর্যন্ত সীমিত না রেখে নিজের জীবনেও তা বাস্তবায়িত করেন। কারণ শিক্ষার বা জ্ঞানের প্রভাব যদি কারো জীবনে না থাকে তাহলে তাকে কখনো শিক্ষিত বা জ্ঞানী বলা যায় না।

গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক গত ১৪ মে ঢাকাস্থ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত অবিদ্যা শীর্ষক দিনব্যাপী এক কোয়ান্টাম বিশেষ ওয়ার্কশপে এ কথা বলেন। পূর্ব নির্ধারিত ছুটির এই দিনটি পরবর্তীতে সরকারী ঘোষণার মাধ্যমে পরিবর্তন করা হলেও বিপুল সংখ্যক অংশগ্রহণকারীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি ছিলো প্রাণবন্ত।

গুরুজী অবিদ্যাকে চিহ্নিত করে বলেন, যে জ্ঞান তথ্য বিশ্বাস সংস্কার কাজ আচরণ ইত্যাদি নিজের জন্যে, মানুষের জন্যে, সৃষ্টির জন্যে এবং দেশ ও সমাজের জন্যে ক্ষতিকর তা-ই অবিদ্যা। বিস্তারিত আলোচনায় তিনি আমাদের

ব্যক্তিগত এবং জাতীয় জীবনের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি সংক্রান্ত প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণাকে তুলে ধরে অবিদ্যার স্বরূপ উন্মোচন করেন।

গুরুজী বলেন, সামাজ্যবাদী মিডিয়া ভোজন এবং জৈবিক চাহিদা পূরণ— শুধু এই দুটো কাজকেই জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে প্রচার করতে সদা তৎপর। কিন্তু শুধু জৈবিক চাহিদা পূরণই জীবনের লক্ষ্য হলে মানুষ আর পশুর মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। আমাদের বর্তমান কালের সকল পার্শ্বিকতা, হিংসা, সন্ত্রাসের মূল কারণ এই অবিদ্যা।

গুরুজী বলেন, জীবনের সকল অশান্তির মূল কারণ হিসেবে এই অবিদ্যাকে মহামতি বুদ্ধ আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছেন। আর নবীজীও (স.) অবিদ্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে প্রার্থনা করেছেন।

ওয়ার্কশপে প্রাসঙ্গিক আলোচনা ছাড়াও পাঁচটি বিশেষ মেডিটেশন অনুষ্ঠিত হয়।

পরবর্তী পরিচিতি সভা ও কোর্স

- ✚ ঢাকায় ১৬২ ব্যাচের পরিচিতি সভা : ৪ জুন (বুধবার)।
মাগরিবের পর মাসিক যৌথ মেডিটেশন।
- ✚ রাজশাহীতে ১৬১ ব্যাচের কোর্স : ৬, ৭, ৮ ও ৯ জুন
(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)।
- ✚ ঢাকায় ১৬২ ব্যাচের কোর্স : ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬ জুন
(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)।
- ✚ চট্টগ্রামে ১৬৪ ব্যাচের পরিচিতি সভা : ২১ জুন (শনিবার)।

মাটির ব্যাংক থেকে ১৭ লক্ষাধিক টাকা সংগৃহীত

পেশাগত কারণে একজন চাকরিজীবী মহিলা তার একমাত্র সন্তানকে নিয়ে একাকী থাকতে বাধ্য হচ্ছিলেন। যে বাড়িতে তিনি ভাড়া থাকেন তার বাড়িওয়ালার সাথে সমস্যার কারণে সেটি ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং অন্য জায়গায় মনের মতো একটি ফ্ল্যাটও খুঁজে পেলেন। কিন্তু সমস্যা হলো যখন নতুন বাসাটির আগেকার ভাড়াটিয়া বাসা না ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। শেষ মুহূর্তে এ খবরটি শুনলেও ভদ্রমহিলার আর কিছুই করার ছিলো না। অগত্যা তিনি এ অনিশ্চিত অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার নিয়তে স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করে মাটির ব্যাংকে কিছু অর্থ দান করলেন। এমনকি ব্যাংকটি তার নিজেরও নয়, তার পরিচিত এক কোয়ান্টাম সদস্যের।

কিন্তু বিস্মিত হয়ে ভদ্র মহিলা আবিষ্কার করলেন কোনো এক অদ্ভুতভাবে তার জটিল সমস্যাটি সহজভাবে সমাধান হয়ে গেলো— আগের ভাড়াটিয়া— যিনি একসময় অত্যন্ত অনমনীয় ছিলেন বাসা না ছাড়ার ব্যাপারে— সেই তিনিই কোনো বামেলা ছাড়াই বাসা ছেড়ে দিতে রাজী হলেন এবং ভদ্রমহিলা মাসের এক তারিখেই নতুন বাসায় উঠলেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এই মহিলা মাটির ব্যাংকের এই বিস্ময়কর কার্যকারিতা দেখে অভিভূত।

শুধু এই একটি ঘটনাই নয়, মাটির ব্যাংক নিয়ে রয়েছে এরকম অসংখ্য বিস্ময়কর সাফল্যের ঘটনা। সেজন্যেই এর কার্যকারিতার প্রতি মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। তারই প্রতিফলন ঘটেছে এর পরিমাণগত প্রবৃদ্ধিতে। কেননা যেখানে প্রথম বছরে এর মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ছিলো মাত্র ৩০ হাজার টাকা, দ্বিতীয় বছরে সেটি এসে দাঁড়ায় ২ লক্ষ ২২ হাজার টাকায়। তৃতীয় বছরে মাটির ব্যাংকে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ হচ্ছে ৭ লক্ষ ৫৩ হাজার ৬৬৮ টাকা। চতুর্থ বছরে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ হচ্ছে ১৭ লক্ষ ৩৮ হাজার ৩৯৭ টাকা। অর্থাৎ প্রবৃদ্ধির হার দ্বিগুণেরও বেশি।

প্রতিবেদক : ফেরদৌসী সুলতানা

নির্বাহী ওয়ার্কশপ

আগামী ৪ ও ৫ জুলাই দুই দিনব্যাপী নির্বাহী ওয়ার্কশপ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে।

গুরুজীকে লেখা চিঠি

পরম শ্রদ্ধেয় গুরুজী,

আসসালামু আলাইকুম। মা-জীকে আমার সশ্রদ্ধ সালাম জানাবেন। আমি জানি, আপনার ভক্তদের কাছ থেকে প্রাপ্ত চিঠি আপনি মনোযোগ সহকারে পড়েন। আমি সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলার জন্য এই পত্র লিখছি।

সামান্যসামানি কথা বলার সময় ও সুযোগ অনেক ক্ষেত্রে নানা অনিবার্য কারণে হয় না। তাই এ চিঠি আপনার সময় ও সুযোগ মতো পড়বেন, এই দৃঢ় প্রত্যাশায় কয়েকটি কথা লিখছি।

গত ৫ মাসে আমার ৫টি বড় সাফল্য এসেছে। আমার মন বলছে এ ব্যাপারগুলো অতি দ্রুত আপনাকে জানানো দরকার।

১. আমার ছোট ছেলে মো. মনজুর আলম, ঢাকায় একটি নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কিছু শেয়ার নিয়ে পরিচালক হিসাবে জয়েন করেছে প্রায় দেড় বছর আগে। ২০০১ সালের নভেম্বর থেকে সে আল্লাহর রহমতে মোটামুটি আমাদের আশানুযায়ী ভালভাবে চলছে। অথচ গত ৬/৭ বছর যাবত বহু টাকা ব্যয় করেও তাকে কোনো কাজে স্থায়ী করা যায় নি।

২. বিগত প্রায় ৪৫ বছর যাবত, আমার দুই কানে ভীষণ সমস্যা ছিলো। ১৯৭৮ সালে জার্মানিতে ডান কানে অপারেশনও করিয়েছিলাম, কিন্তু সে অপারেশনও দশ দিনের মাথায় বার্থ হয়েছিল। এর আগে ও পরে দীর্ঘ ৪৫ বছর বাংলাদেশের এমন কোনো ই.এন.টি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বাদ নেই, যার কাছে যাই নি। কিন্তু ফলাফল বরাবরই শূন্য। গত বছর ২০০১ সালে জার্মানিতে ও আমেরিকার বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের দেখিয়ে পরামর্শ নিলাম। তারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বললেন, অপারেশন ছাড়া এ রোগ ভালো হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। এমন কি অপারেশন করলেও যে ভালো হবে, এমন কোনো গ্যারান্টি দেয়া যাবে না। অপারেশন খরচও অত্যধিক। দুই কানে প্রায় ১২/১৪ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। আমার বড় ছেলের অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও নানা দিক বিবেচনা করে আমি সেখানে অপারেশন করাই নি। দেশে চলে এসে ভাবছিলাম এ বছরের শেষ দিকে মাদ্রাজ গিয়ে কম খরচে অপারেশন করাবো।

তাই এই মধ্যবর্তী সময়টা কাটানোর জন্য চট্টগ্রামের একজন জুনিয়র ই.এন.টি বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে থাকলাম এবং তিনিও আমাকে মাদ্রাজে অপারেশন করতে পরামর্শ দিলেন। অতীত আশ্চর্যের ও আনন্দের ব্যাপার এই যে, গত ১৫ জানুয়ারী ২০০২ তারিখে ডাক্তার জানালেন যে, আমার ডান কানের পর্দার অনাকাঙ্ক্ষিত ছিদ্র এমনিতেই ঠিক হয়ে গেছে এবং কান ভালো হয়ে গেছে। তাই ঐ কানের অপারেশনের আর কোনো প্রয়োজন নেই।

দীর্ঘ ৪৫ বছর পর বিনা অপারেশনে ও বিনা ওষুধে একটি কান ভালো হয়ে গেল। ডাক্তার সাহেবও বুঝতে পারছেন না কিভাবে কান ভালো হলো।

৩. আমার মেজ মেয়ে রওশন আরা সুলতানা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯৬ সালে এমবিএ করেছে। তার ছোট সন্তান থাকায় সে কোনো চাকরির চেষ্টা করে নি। এখন দু'বাচ্চাই স্কুলে যায়। তাই সে গত ৩ মার্চ ২০০২ চট্টগ্রাম ফয়েজ লেকস্ ইউএসটিসি-তে কঠিন প্রতিযোগিতা-তামূলক ইন্টারভিউ দেয়। ৬ মার্চ এপয়েন্টমেন্ট লেটার হস্তগত হয় এবং ৭ মার্চ একাউন্টিং-এ প্রভাষক হিসাবে ১০,০০০ টাকা বেতনে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েই সম্মানজনক চাকরিতে যোগ দেয়।

৪. ১৯৯৯-এর মার্চে আমার ছোট মেয়ে ফেরদৌসী সুলতানা মুন্না চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.বি.এ পাশ করে। ঐ বছরের জুন মাসেই প্রবল প্রতিযোগিতামূলক ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে মার্কেন্টাইল ব্যাংক-এ অফিসার হিসাবে জয়েন করে।

মাত্র আড়াই বছরের মাথায় গত ৭ মার্চ ২০০২ তারিখে উক্ত ব্যাংকে সিনিয়র অফিসার হিসাবে পদোন্নতি হয় এবং বেতন ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

৫. এর প্রায় ২৫/২৬ দিন পর, আমার বড় ছেলে মো. ফিরোজ আলম, যে প্রায় ১১ বছর যাবত আমেরিকায় বসবাস করছে এবং গ্রীন কার্ডের জন্য অহর্নিশ চেষ্টা করছে এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছে, সে গত ২ এপ্রিল ২০০২ তারিখে টেলিফোনে জানালো যে, সে ১ এপ্রিল আল্লাহর রহমতে তার গ্রীন কার্ড হাতে পেয়েছে। যারপর নাই আনন্দিত ও বিস্মিত হয়েছি। কারণ এখন আমেরিকায় (১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১ এর পর) গ্রীন কার্ড পাওয়া খুবই কঠিন হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আমার ছেলে পেয়েছে।

মাত্র ৫ মাসের মধ্যে এই ৫টি প্রাপ্তি আমাদেরকে দারুণ ভাবে আলোড়িত করেছে। তাই আপনার সদয় অবগতি ও দোয়ার জন্য সংক্ষেপে জানালাম। আমি আল্লাহর কাছে এবং এরপর আপনার কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

আপনার দোয়া আমার উপর সব সময়ের জন্য আছে জানি, তবু পুনর্বার দোয়া চাইছি। মা'জীকে দোয়া করতে বললেন। সম্ভব হলে ওনাকেও চিঠিটা দেবেন। এখন বিদায় নিচ্ছি। খোদা হাফেজ।

আপনার একান্ত স্নেহধন্য

মো. হুমায়ুন কবীর

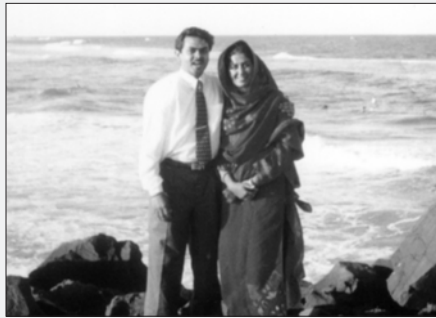
[চট্টগ্রামের ইঞ্জিনিয়ার মো. হুমায়ুন কবীর ব্যাচের গ্রাজুয়েট।]

প্রবাসে আমরা

মোহাম্মদ আশিক মোসাদ্দিক

কেমন আছি আমরা প্রবাসে? উত্তর, দেশের মতোই। কারণ জীবন সর্বদাই বৈচিত্র্যময় ও সংগ্রামী- তা সে দেশেই হোক আর প্রবাসে। শুধু ভিন্ন প্রেক্ষাপট, নতুন অভিজ্ঞতা।

প্রায় দু'বছর হতে চললো আমরা অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস-এর উত্তরে ছোট একটা শহরে আছি। পিএইচডি ডিগ্রীর জন্য কমনওয়েলথ গভর্নমেন্ট-এর স্কলারশীপ নিয়ে আমি স্বস্তীক এখানে এসেছি। দেশে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী বিভাগে শিক্ষকতা জীবন শুরু করার পরপরই ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে কোয়ান্টাম কোর্স করি। কোর্স চলাকালীন সময় থেকে আজ পর্যন্ত কোয়ান্টাম আমার জীবনে বিভিন্ণভাবে প্রভাব ফেলেছে। আজকে শুধুমাত্র কয়েক মাস আগের একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বর্ণনা করছি। হঠাৎ একদিন আমার সুপারভাইজার জানালো যে, ২০০২-এর ন্যাচারাল প্রডাক্ট গ্রুপ এবং রয়্যাল অস্ট্রেলিয়ান কেমিক্যাল ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় সিম্পোজিয়াম অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস-এ অনুষ্ঠিত হবে। ঠিক করলাম আমার পিএইচডি কাজের উপর একটা পেপার সাবমিট করবো। বিশেষ মনোযোগ দিয়ে পেপারটা তৈরি শুরু করলাম আর প্রতিদিন মেডিটেশনে মনছবি দেখতে শুরু করলাম যে, সবাই আমার গবেষণাপত্রের প্রশংসা করছে এবং আমি প্রথম পুরস্কার পেয়ে গেছি। মনের মধ্যে এই অনুভূতি বার বার অনুভব করছি এবং নিয়ত করে মাটির ব্যাংকে



(আমাদের এখানে টিনের কৌটা) কিছু ডলার ফেলে দিলাম।

তারপর আমার স্ত্রী নিতাসহ (সে-ও কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট) আমরা ১০ জনের একটা টিম সিডনি পৌঁছলাম। আমাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে নিউ সাউথ ওয়েলস ইউনিভার্সিটির কাছেই জেমিনাই হোটেলে। ৪ অক্টোবর ২০০২, সকাল বেলা মেডিটেশন করে রওনা হলাম। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস নিয়ে প্রেজেন্টেশন শেষ করলাম এবং মনটা খুশি, কারণ সকলেই প্রশংসা করলেন। যা-ই হোক লাঞ্চ-এর সময় নিউ সাউথ ওয়েলস ইউনিভার্সিটির মসজিদে জুমার নামাজ পড়ে কনফারেন্স হলে ফিরলাম। আমার এক ল্যাবমেট জানালো যে, সে আড়ি পেতে জানতে পেরেছে বিচারকরা প্রাথমিকভাবে আমাকে সহ তিনজনকে নির্বাচিত করেছে। এখন টান টান উত্তেজনা। অবশেষে প্রথম পুরস্কার, আমার নাম। আমি যেন তৈরিই ছিলাম। আমাকে তৈরি করেছে আমার মনছবি ও মাটির ব্যাংকে সং নিয়তে রাখা কিছু অনুদান। পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে শুকরিয়া।

পুরস্কার হিসাবে পাওয়া টাকার চেকটা তুলে দিলাম আমার স্ত্রীর হাতে যার আত্মত্যাগ ও একাকী ঘরে থাকার ধৈর্য্য আমাকে বিস্মিত করেছে। আমাদের প্রবাস জীবনে কোয়ান্টাম এক বড় সঙ্গী। আজকাল আমার মনছবি দেখি একদিন যুক্তরাজ্যের মতো এই অস্ট্রেলিয়ায় গুরুজী ও মা-জী আসছেন এবং এখানেও কোয়ান্টাম কোর্স হচ্ছে।

কোয়ান্টামকে সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য ছড়িয়ে দেওয়ার এই মহতী মনছবিতে আপনাদের অংশগ্রহণ কি আশা করতে পারি না। সকলকে সুদূর অস্ট্রেলিয়া থেকে কোয়ান্টাম শুভেচ্ছা।

[মোহাম্মদ আশিক মোসাদ্দিক ৮৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।]

১৬০ ব্যাচের নবীন গ্রাজুয়েট বরণ অনুষ্ঠান

গত ২৬ মে, ২০০৩ বিকেল ৫টায় ঢাকার কাকরাইলস্থ কোয়ান্টাম মেডিটেশন হলে অনুষ্ঠিত হলো নবীন গ্রাজুয়েট বরণ অনুষ্ঠান। মে মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত কোয়ান্টাম মেডিটেশন কোর্সের ১৬০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট এবং তাদের সাথে আমন্ত্রিত অতিথিদের নিয়ে প্রথম বারের মতো আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন সংশ্লিষ্ট ব্যাচের গ্রাজুয়েট ও অতিথি মিলিয়ে প্রায় ৭০ জন। মূলত কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা প্রদান এবং এর সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের পরিচিত করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের সাথে নবীন গ্রাজুয়েটদের একাত্মতা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টিই ছিলো এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে পরিচালক সমন্বয় সুরাইয়া রহমান বলেন, কোয়ান্টামের যাবতীয় কার্যক্রম দুটি মৌলিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, একটি হলো আত্ম উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এবং আরেকটি সৃষ্টির সেবা কার্যক্রম।

এর পরের পর্বে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন শাখা/সেলের পরিচালক, নির্বাহী এবং কোয়ান্টিয়ারদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। পরিচালকগণ তাদের নিজ নিজ শাখা/সেলে নবীন গ্রাজুয়েটদের আমন্ত্রণ জানান।

নবীন গ্রাজুয়েটদের মধ্য থেকে দুজন তাঁদের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব বজলুর রহমান বলেন, কোর্স করার দু/তিনদিনের মধ্যেই তার দু'টি মনছবি বাস্তবায়িত হওয়ায় তিনি এখন অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী।

নবীন গ্রাজুয়েটদের উদ্দেশ্যে ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক মাদাম নাহার আল বোখারী তাঁর বক্তব্যে বলেন, আত্মউন্নয়নের জন্যে শুধু কোর্স করাটাই যথেষ্ট নয়, এই ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্যে ফাউন্ডেশনের সাথে একাত্মতা অপরিহার্য।

সবশেষে গুরুজী শহীদ আল বোখারী সমাপনী বক্তব্য ব্যাখ্যা করে বলেন, কেন ফাউন্ডেশনের সাথে একাত্ম হতে হবে। তিনি বলেন, আসলে একা কখনো জীবন যাপন করা যায় না, সবসময় আনন্দ এবং কষ্টকে শেয়ার করতে চায় মানুষ এবং এই শেয়ার করতে গিয়েই তার দরকার হয় সমমনা সঙ্গীর যে তাকে বুঝবে। আর মেডিটেশনের অভিজ্ঞতা এবং চর্চাকে অব্যাহত রাখার জন্যেই গ্রাজুয়েটদের প্রয়োজন ফাউন্ডেশনের সাথে সম্পৃক্ততা বজায় রাখা। কারণ সংঘবদ্ধ হলেই সৃষ্টি হয় পরিচয়, স্থাপিত হয় মহান কীর্তি। আর যারা এই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমে স্বেচ্ছাসেবা দিচ্ছেন তারা নিজেরা যেভাবে উপকৃত হয়েছেন সেই উপকারেরই অংশীদার করতে চান নবাগতদের।

সবশেষে আপ্যায়ন পর্বের মাধ্যমে শেষ হয় দেড় ঘণ্টা ব্যাপী এই নবীন গ্রাজুয়েট বরণ অনুষ্ঠানটি। নিমন্ত্রিত গ্রাজুয়েট এবং অতিথিরা এ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পেরে বেশ উৎসাহী হয়েছেন।

প্রতিবেদক : রাবেয়া নাজনীন

মেধা চিল্লা : নতুন অনুভূতি

চাওয়া পাওয়ার অনুভূতির বিস্তার তফাত। আমি সবসময় চেয়েছি ভিন্ন কোনো উপায়ে সমাজের উপকার করতে। আর এ জন্য সঠিকভাবে গুণার্জন করা দরকার। কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনে একাত্মচিন্তে লেখাপড়ার জন্য চিল্লা করার সময়ই পাওয়া যায় না। কোনো না কোনো বাধা আসেই।

তাই আমি মনে করি শিক্ষার্থীদের জন্য মেধা চিল্লার চেয়ে উত্তম কোনো পথ নেই। একাত্মচিন্তে, গভীর ভাবে পাঠ্যবইয়ে মুদ্রিত ক্ষুদ্র প্রশ্নের উত্তর চিন্তা করা যায় অনায়াসে। এ অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন মেধা চিল্লায় অংশগ্রহণকারী ১০৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট নুসরাত শারমিন। গত ২৩, ২৫, ২৬ ও ২৭ মার্চ এস.এস.সি পরীক্ষার্থীদের জন্য শান্তিনগরস্থ সেমিনার কক্ষে মেধা চিল্লার বিশেষ আয়োজন করা হয়। মোট ৭ জন শিক্ষার্থী ভাই-বোন এ চিল্লার ১ম পর্বে অংশগ্রহণ করেন।

এ চিল্লায় অংশগ্রহণকে আনন্দদায়ক ও সৌভাগ্যের বলে মনে করেন আরেক শিক্ষার্থী ৭৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট শাহেদ হাসনাইন রাবিত।

তিনি বলেন, আলফা লেভেলে প্রতিটি বিষয়ের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ আমাদের জন্য একটি নতুন কৌশল। এর আগে আমরা শুধুমাত্র পড়াশোনার বিভিন্ন বিষয় মনে রাখা বা মনোযোগ বৃদ্ধির জন্য আলফা লেভেলে সাজেশন দিয়েছি। কিন্তু এ চিল্লার মাধ্যমে কঠিনতর বিষয়গুলোর কি কি পারি না ভাবতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম বিষয়গুলো বেশি কঠিন না কিংবা জটিলও না।

মেধা চিল্লার দ্বিতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত হয় ৯, ১১, ১২ ও ১৩ মার্চ। ২০০ টাকা ফিস জমা দিয়ে যে কোনো শিক্ষার্থী এই বিশেষ চিল্লায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন।

মেধা চিল্লার দ্বিতীয় পর্বে অংশগ্রহণকারী শারমিন চৌধুরী মৌরী ভিকারুনিসা নূন স্কুলের এস.এস.সি পরীক্ষার্থী। তার বক্তব্য- মেধা চিল্লায় অংশগ্রহণ করে আমার পড়ায় আগ্রহ ও মনোযোগ অনেক বেড়েছে। এই অনুভূতি আমাকে কাজক্ষিত সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌঁছে দেয়ার প্রথম সোপান হতে পারে। এই বিশ্বাসকে কার্যকর রেখে স্মৃতিশক্তি বাড়িয়ে আসন্ন পরীক্ষায় কাজক্ষিত সাফল্য লাভের জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া প্রার্থনা করছি।

প্রতিবেদক : রোকেয়া হক

নিরাময়ের আনন্দ হিলিং মেডিটেশন

মিনু চক্রবর্তী

স্রষ্টাকে স্মরণ করে শ্রদ্ধেয় গুরুজী, মা-জীকে নমস্কার। আমার ব্যক্তিগত অ ন ক উপকারিতার মাঝে একটি “হিলিং মেডিটেশন” এর সফলতা নিয়ে লিখছি। প্রায় ৩/৪



মাস পূর্বে সকালে ছেলে ঘুম থেকে উঠে বললো, মা দেখ সমস্ত শরীরে লাল লাল কি যেন উঠেছে। চুলকানির জন্য রাতে ঘুমাতে পারি নি।

প্রথমে ভাবলাম চাদরে বা শাটে বিষাক্ত পোকা জাতীয় কিছু লাগলো কি-না। ছেলের বাবা বললো, এলার্জি, (আমাদের চট্টগ্রামের ভাষায় পিড়ি বাত অর্থাৎ পিপড়া বাত) এভিল টেবলেট খেলে চলে যাবে। আমি শুধু বললাম, বিকালে

অফিস থেকে এসে যদি দেখি ভালো হয় নি, তবে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবো। আমি যথাসময়ে অফিসে চলে গেলাম। কাজের ফাঁকে অফিসেই চেয়ারে বসে রহম বলয়ে গিয়ে হিলিং করে যাচ্ছি। মনটাও খারাপ লাগছে ছেলেকে একা রেখে আসার কারণে। বিকালে বাসায় গিয়ে ছেলেকে দেখলাম আরো বেশি লালচে চাকা সমস্ত শরীরে হয়েছে।

আমি হাত মুখ ধুয়ে পূজার আসনে স্রষ্টাকে প্রণাম করে ছেলের অসুস্থতার সব আকুলতা ব্যক্ত করলাম। তারপর হিলিং মেডিটেশন করে গুরুজীর নিরাময়ের বইটা ছেলের পাশে রেখে চিত্রের নিয়মানুযায়ী বাম হাতে কোয়ান্টা ধ্বনি, ডান হাতে ২৫/৩০ বার মালিশ করে যাচ্ছি। কিছুক্ষণ পর ছেলে হাত, পা, বুক দেখে বলছে, মা অনেক চলে গিয়েছে। রাতে ঘুমানোর পূর্বে আবার একই পদ্ধতিতে মালিশ করলাম, কোনো ওষুধ দিলাম না। স্রষ্টার কৃপায় গুরুজীর আশীর্বাদে সকালে দেখলাম সম্পূর্ণ সুস্থ- ২৪ ঘণ্টার মধ্যে। হিলিং মেডিটেশন এবং নিরাময়ের আনন্দে ছেলে হাসছে। আমি স্রষ্টার কাছে ও গুরুজীর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে মনের আনন্দে হাসলাম।

[মিনু চক্রবর্তী চট্টগ্রামের ১৩৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।]

কেন্দ্রীয় কার্যক্রম

কোয়ান্টাম চিল্লা বা মৌন সাধনা : আত্মোপলব্ধি ও ধ্যানের গভীরতা বৃদ্ধির জন্যে শান্তিনগরস্থ কেন্দ্রীয় সেমিনার কক্ষে প্রতি শুক্র, শনি ও মঙ্গলবার সকাল ৯.৩০ থেকে ৫.৩০ পর্যন্ত চিল্লা বা মৌন সাধনা অনুষ্ঠিত হয়।

কোয়ান্টাম ব্যায়াম : দৈহিক আত্মিক ও মানসিক উন্নয়নের জন্যে কেন্দ্রীয় দফতরে কোয়ান্টাম ব্যায়ামের ক্লাস হয় প্রতি রবি ও বুধবার বিকেল ৪.৩০ থেকে ৫.৩০। কোর্স ফি : গ্রাজুয়েট ৫০০ টাকা ও নন গ্রাজুয়েট ১০০০ টাকা।

যৌথ মেডিটেশন : একক মেডিটেশনের চেয়ে যৌথ মেডিটেশন অনেক বেশি ফলপ্রসূ। ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় সেমিনার কক্ষে প্রতি সোমবার সকাল ১১.৩০, বিকেল ৫টা ও সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে সাপ্তাহিক যৌথ মেডিটেশন হয়।

সাইকি কোর্স ও হিলিং মেডিটেশন : অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা শাণিত করার জন্যে কেন্দ্রীয় ধ্যানঘরে প্রতি বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা থেকে ৬টা পর্যন্ত সাইকি কোর্স অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ৩ মাসে সপ্তাহে ১ দিন করে মোট ১২টি ক্লাসের এই কোর্সের ফি : সাধারণ ১০০০ টাকা, শিক্ষার্থী ৫০০ টাকা।

শাখা-সেলের কার্যক্রম : সারা দেশের বিভিন্ন শাখা-সেলে প্রতি শুক্রবার সকাল ৯.৩০ মিনিটে যৌথ মেডিটেশন অনুষ্ঠিত হয়।



জাবলে শামসের পথে

ধ্যান বা সাধনা যে শুধু কষ্টকর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই চর্চা করতে হবে তা-ই নয়, আনন্দ উপভোগের মাধ্যমেও যে তা হতে পারে- এ উদাহরণই উপস্থাপিত হলো ২০০৩ সালের ১৪, ১৫ এবং ১৬ ফেব্রুয়ারী দ্বিতীয় বারের মতো আয়োজিত লামা ধ্যান যাত্রার মাধ্যমে। আর তাই এ অনুষ্ঠানের নামও ছিলো ‘লামা ধ্যান উৎসব’।

২০০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথম লামা ধ্যান যাত্রার ফলপ্রসূ আয়োজনের পর এবার আরও বর্ধিত কলেবরে এই লামা ধ্যান উৎসব অনুষ্ঠিত হয় যাতে অংশ নেন ঢাকা থেকে ১২০ জন সহ রাজশাহী, সিলেট, বগুড়া ইত্যাদি বিভিন্ন স্থান থেকে সব মিলিয়ে দুইশত জন গ্রাজুয়েট ও মেহমান। পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম এলাকায় এরকম ব্যাপক আয়োজন সফলভাবে করার জন্যে লামার কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবীরা নিঃসন্দেহে আন্তরিক ধন্যবাদের দাবিদার।

ঢাকার দলটি ১৩ ফেব্রুয়ারি রাতে শান্তিনগরস্থ কেন্দ্রীয় অফিস থেকে তিনটি বাসে করে যাত্রা শুরু করেন। ঢাকা ছাড়া অন্যান্য অঞ্চল থেকে অংশগ্রহণকারীরা অবশ্য ১৩ তারিখেই লামায় পৌঁছে যান। বাসে ওঠা থেকে শুরু করে ধ্যান উৎসব সমাপ্ত করা পর্যন্ত পুরো সময়টুকু ছিলো ফাউন্ডেশন কর্তৃক নির্ধারিত নির্ঘণ্টে বাঁধা। প্রতিটি পর্যায়ের জন্যে দল এবং দলনেতা মনোনিীত করে দেওয়ার ফলে শৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থাপনার ব্যাপারটি নিশ্চিত করা গেছে।

সারা রাতের মৌন ভ্রমণের পর সকালে যখন তারা জিপে চড়ে লামায় পৌঁছান তখন তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবার প্রক্রিয়ায় বিস্মিত হয়েছিলেন



জাবলে শামসে সূর্যের দিকে মুখ করে মেডিটেশন

প্রায় সবাই। কারণ স্থানীয় উপজাতিদের নিজস্ব বাদ্যযন্ত্র দিয়ে সৃষ্ট সুরের আন্তরিক নিবেদন স্পর্শ করেছিলো তাদের হৃদয়কে। সেই সাথে ছিলো শিশুকাননের ছোট ছোট শিশুদের মুখে স্বাগতম স্বাগতম ধ্বনি।

এরপর অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকে নাম রেজিস্ট্রেশন শেষে নিজ নিজ হিল স্টেশনে ব্যাগ, জিনিসপত্র রেখে দরবার হলে সমবেত হন। কিছুক্ষণ পরই গুরুজী এ ধ্যান উৎসবের ব্যাপারে

নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন এবং দিনের কর্মসূচি জানিয়ে দেন।

প্রথমেই ছিলো বোধিপ্রপাত নামক বর্ণা ও টানেল ভ্রমণ। বোধিপ্রপাতে মহামতি বুদ্ধের পাথরে খোদাই করা মুখমণ্ডলের প্রতিকৃতি প্রাকৃতিক কারণে ক্ষয়ে গেলেও পিচ্ছিল পাথর, ঠাণ্ডা পানি আর খাড়া পথের এ ভ্রমণ অনেককে এডভেঞ্চর-ধর্মী ছবির কথা মনে করিয়ে দিয়েছে।

গোসলের পর্বে মহিলারা আবে কুদরতে ও পুরুষরা আবে শেফা নামক দুটো ছড়ায় গোসল করেছেন। সবাই ছড়ার তীরবর্তী হলুদ মাটি ও বালু ইত্যাদি মুখমণ্ডল ও সমস্ত শরীরে মেখে নিচ্ছিলেন- কারণ এ অঞ্চলের মাটি ত্বক পরিষ্কারক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

দুপুরে খাবারের ব্যবস্থা হয়েছিলো স্টেশন নেয়ামতে। সেখানে এপ্রন পরিহিত আইডি কার্ডধারী খাদেমদের আন্তরিক আপ্যায়নে সবাই ছিলেন মুগ্ধ।

প্রথম দিন বিকেলের সূচি ছিলো জাবলে শামস্ নামক পাহাড়ে গমন। গুরুজীর নেতৃত্বে সবাই দরবার হল চত্বর থেকে নিজ নিজ গ্রুপে সারিবদ্ধ হয়ে যাত্রা শুরু করেন। এ যাত্রার শৃঙ্খলা ছিলো অভূতপূর্ব। প্রতিটি সদস্য একটি মাত্র লাইনে একজন আরেকজনকে অনুসরণ করেছেন। এত উঁচু পাহাড়ে নানা চড়াই-উৎরাই পেরোতে গিয়ে একজনও লাইনচ্যুত হন নি। কেউ ব্যথা পান নি বা কোনো অস্বস্তিবোধ করেন নি।

পাহাড়ে ওঠার সময় গুরুজী কিছুক্ষণ পরপর থামার নির্দেশ দিচ্ছিলেন যাতে পিছিয়ে পড়া দল সামনের দলকে ধরতে পারে। তখন মনে হচ্ছিলো

আমরা কেউ কারও থেকে বিচ্ছিন্ন নই, সবাই এক সুতোয় বাঁধা।

জাবলে শামসে বসার সুবিধার জন্যে আগে থেকেই মঞ্চ তৈরি করা ছিলো। পাহাড়ে উঠে প্রত্যেকে তার সুবিধামতো জায়গায়- কেউ প্রজ্ঞা মঞ্চে কেউ করুণা মঞ্চে, আবার কেউ মাটিতে বসে পড়লেন। বিকেল চারটায় শুরু হলো প্রখর রোদের মধ্যে বসে সূর্যের দিকে তাকিয়ে মেডিটেশন। প্রচণ্ড রোদ, কিন্তু গরম লাগছে না বরং অনুভূত হচ্ছে এক ঠাণ্ডা, হৃদয় প্রশান্ত করা বাতাস- এই অভূতপূর্ব উপলব্ধির সুযোগ বোধ হয় জীবনে খুব কম সময়ই আসে- এরকম অনুভূতিই ছিলো প্রায় সকলের।

সন্ধ্যায় ধ্যান যাত্রীদের জন্যে বিশেষ আকর্ষণ ছিলো ক্যাম্প ফায়ার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। স্কুলের ছাত্ররা স্বাগতম স্বাগতম গানের তালে তালে নেচে অতিথিদের অভ্যর্থনা জানায়। ত্রিপুরা



জাবলে শামসের বিবেক মঞ্চ, করুণা মঞ্চ, মমতা মঞ্চ ও প্রজ্ঞা মঞ্চে মেডিটেশন

ভাষায় স্বদেশ প্রেমের গান আর ঐতিহ্যবাহী কলস নৃত্য পরিবেশন করেন শিশুকানন স্কুলের দু’জন সিস্টার রেবেকা ও বাস্কানা। বমদের



জাবলে শামস থেকে নেমে আসছেন ধ্যানযাত্রীরা

লামা ধ্যান উৎসব ২০০৩

ঐতিহ্যবাহী বিয়ে নৃত্য, বাঁশনৃত্য পরিবেশন করেন আরো দুজন সিস্টার। জুম চাষ নিয়ে ক্ষুদে চার শিল্পীর নৃত্যও সবার নজর কেড়েছে।

উপজাতীয়দের ঐতিহ্য রীতিতে পাঁচটি ফানুসও উড়ানো হয় এ অনুষ্ঠানে- তবে সবচেয়ে আবেগঘন মুহূর্তটি ছিলো যখন ছয় পাহাড়ের মাঝে গুরুজী ধ্যানঘর বানাইছে শীর্ষক গানটিসহ তমু গায়নের গাওয়া গানটি পরিবেশিত হয়। রাতের অন্ধকারেও শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ের কান্না লুকোতে চেয়ে কেউ কেউ তা পারেন নি। রাতের খাবারের পরপরই মূল অনুষ্ঠানে প্রবেশ করলেন সবাই। মৌনতা শুরু হলো।

দ্বিতীয় দিন ফজরের জামাতের পর শুরু হলো মৌন ভ্রমণ। আগের মতোই নির্ধারিত গ্রুপে বিভক্ত হয়ে সবাই নিঃশব্দে পরিদর্শন করলেন মেডিটেশন সেন্টারের বিভিন্ন স্থাপনা- ধ্যান ঘর, হাওয়া মঞ্চ, বোধি মঞ্চ, হুজরা, শিশুকানন, স্কুল ও আবাসিক হোস্টেল, নার্সারী, হাঁস-মুরগীর খামার ও পুকুর, তখতে জামালী-কামালী-জালালি-তাজাল্লি ইত্যাদি। বিস্মিত হয়ে সবাই দেখলেন অল্প কয়েক বছরের ব্যবধানে কত রক্ষ, উষর ও বৃক্ষহীন একটি এলাকা এখন সবুজ সুশোভিত ও সমৃদ্ধ। পরিকল্পিতভাবে লাগানো হয়েছে নানা প্রজাতির বনজ ও ফলজ গাছ। নিয়মিত পরিচর্যায় গাছগুলোতে রীতিমতো ফল ফলতেও শুরু করেছে। সভ্যতার অত্যাচারে জর্জরিত প্রকৃতি এখানে যেন খানিকটা স্বস্তি পেয়েছে।

মৌন ভ্রমণের পর সারাদিনের নির্ধারিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রথমেই সবাই দরবার হলে বসে গুরুজীর নির্দেশনা অনুযায়ী ঘণ্টাখানেক মেডিটেশন করেন।

এরপর দিনের বাকি সময় মৌনতা অবলম্বন করে অবস্থানের জন্যে গুরুজী মহিলাদেরকে ধ্যানঘরে এবং পুরুষদেরকে গ্রুপভিত্তিক বিভিন্ন স্থান নির্দেশ করে দেন।

সুপ্রাচীনকাল থেকেই সাধকরা পাহাড়ের নির্জনতায় গিয়েছেন গভীরভাবে ধ্যানমগ্ন হতে এবং পরম সত্যকে অনুধাবন করতে। গুরুজীর নির্দেশনা অনুযায়ী লামায় এই মৌন সাধনায় অংশ নিয়েও অনেকে পেয়েছেন বিচিত্র অনুভূতি। বিকেলে দরবার হলে ফিরে এলেও মৌনতা চলছিলো। তারপর একে একে আসর, মাগরিব ও এশার জামাত এবং রাতের খাবারের পর সবাই আবার সমবেত হন দরবার হলে।

রাত ৮.৩০ মিনিটে গুরুজী এলেন দরবার হলে। সারাদিন মৌন থাকার কারণে সবাই এক গভীর মগ্নতায় নিমজ্জিত। ভরা পূর্ণিমার চাঁদে আলোকিত সেই রাতের নৈঃশব্দে মানুষ আর প্রকৃতি একাকার হয়ে গিয়েছিলো। সেদিন গুরুজী যে মেডিটেশনটি করিয়েছিলেন তা অনেকের জীবনেই এক বিরল অনুভূতিময় অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে। এরপর গুরুজী রাতের জন্যে সার্বক্ষণিক একটি প্রার্থনা পাঠের নির্দেশ দিয়ে সবাইকে নিজ নিজ হিল স্টেশনে যেতে বললেন।

পরদিন অর্থাৎ উৎসবের শেষদিন ভোর ৬টায় মৌনতার সমাপ্তি ঘটিয়ে শুরু হয় পিঠা উৎসব। তেহারীর সাথে ছিলো শীতের মুখরোচক আয়োজন এই ভাঁপাপিঠা, চিতল বা চিতই পিঠা এবং নারকেল ও গুড়ের রস।

সকাল ১১টা পর্যন্ত সময়কে সবার জন্যে শিথিল করে দেয়া হয়েছিলো যাতে প্রত্যেকে ইচ্ছেমতো সময় কাটাতে পারেন। তরুণরা এ সময় কেউ কেউ রোপ ক্লাইমিং, কেউবা শিশুকাননের শিশুদের সাথে খেলায় মেতেছিলো। উপজাতিদের হাতে তৈরি নানারকম হস্তশিল্প ও কারুপণ্য প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের সুযোগও ছিলো এসময়।

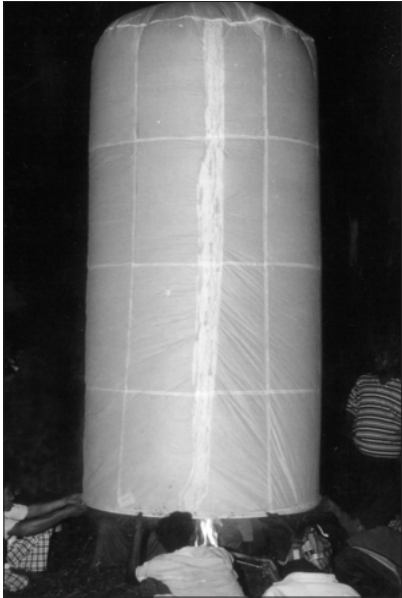
অবশেষে ফিরে আসবার পালা। সবাই ব্যাগ গুছিয়ে দুপুরের খাবার খেয়ে দরবার হলে উপস্থিত হলেন।

বিদায়ী ভাষণের শেষ পর্যায়ে গুরুজী তার



লামায় আগত ধ্যানযাত্রীদের স্বাগত জানাচ্ছে পাহাড়ী বাঁশি নৃত্যের মাধ্যমে

পেছনে দাঁড়ানো শিশুকাননের শত শিশুর দিকে তাকিয়ে আবেগজড়িত কণ্ঠে বলেন, আপনারা যে যেখানে থাকুন এই শিশুদের কথা মনে রাখবেন;



উপজাতীয়রা পাহাড়ী ঐতিহ্যে ফানুস ওড়ানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে

প্রতি বেলা খাবারের আগে এদের মুখ মনে করে ভাববেন, আমার এক সন্তান বা আমার এক ভাই বা বোন লামায় আমার সাহায্যের আশায় পথ চেয়ে আছে। আমি খাবার পাঠালে সে খাবে, আমি পোষাক পাঠালে সে পরবে। তাহলেই দেখবেন এদের কোনো অভাব থাকবে না। এ সময় পুরো হলে এক আবেগময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। শিশুদের প্রতি মমতার অনুভূতি সবার হৃদয়ের গভীরে ঠাঁই করে নেয়।

সাধনা কষ্টের। কিন্তু তা যখন আনন্দ চিত্তে করা হয়, তখন সে কষ্টই আনন্দে রূপান্তরিত হয়। ধ্যান উৎসব নামকরণের পেছনে মূল

দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো এটি। ধ্যানযাত্রীরা তাই আনন্দচিত্তে সাধনার মাধ্যমে নিজেদের কিছুটা হলেও সমৃদ্ধ করে ফিরে গেলেন যার যার গন্তব্যে।

ধ্যান উৎসবে অংশগ্রহণকারী কয়েকজন তাদের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি ব্যক্ত করেছেন। ঢাকার গ্রাজুয়েট মায়মুনা বেগম বললেন, লামায় যাওয়ার ব্যাপারে সবার মধ্যে বিপুল আগ্রহ দেখে মনে হতো, কী আছে এ পাহাড়ে-জঙ্গলে যা মানুষকে

এত আকৃষ্ট করছে। প্রথম বারের মতো লামায় গিয়ে বুঝলাম আসলে এখানকার প্রশান্ত পরিবেশ এবং আকর্ষণ ক্ষমতা এতটাই গভীর যা শুধু অনুভবই করা যায়, ব্যাখ্যা করা যায় না। যার টানে বারবার যেতে ইচ্ছে হয় সেখানে।

সরকারী কর্মকর্তা আলম আরা বেগমের ভাষায়, প্রথমবারের লামা ভ্রমণ আমার জন্য এতটা তৃপ্তির ও আনন্দদায়ক হয়েছিলো যে, এবারও আমি এ সুযোগ মিস করি নি। আর এবারের ভালো লাগা ছিলো আরও বেশি।

১৪৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট শ্যামল কৃষ্ণ সরকারের মতে, একজন অপেক্ষাকৃত নবীন সদস্য হিসেবে লামা ভ্রমণ ছিলো আমার জন্য একটি চমক। কারণ সেখানে না গেলে কোয়ান্টাম সম্পর্কে আমার ধারণা অস্বচ্ছ থেকে যেতো। বিস্মিত হয়েছি আমি এরকম একটি দুর্গম পার্বত্য এলাকায় এতসব স্থাপনা দেখতে পেয়ে।

‘এ’ লেভেলের ছাত্র



অনুষ্ঠানে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় কৃষক আবদুস সালাম ও তার স্ত্রী, কন্যা ও জামাতাকে- যার দান করা জমিতে নির্মিত হয়েছে শিশুকানন স্কুলঘর ও ছাত্রাবাস

কাজী ইমতিয়াজ ইবনে মাহতাব আরও বেশ ক’বার লামায় গিয়েছেন। কিন্তু এবারে প্রথম দর্শনেই তিনি একটু ভিন্নরূপে লামাকে দেখলেন। কারণ প্রবেশ পথেই চোখে পড়লো এক বিশাল হলরুম যাতে পরবর্তীতে তারা একসাথে অনেকে অবস্থান করেছেন।

নারায়ণগঞ্জের গ্রাজুয়েট পারভীন আক্তার তার উপলব্ধিকে খুব সংক্ষেপে ব্যক্ত করলেন এভাবে- প্রকৃতির কাছাকাছি গেলেই সত্যিকারের আত্মিক বন্ধন সম্ভব, কারণ দেহরূপী আবাস তখন কোনো বাধা তৈরি করতে পারে না আর ফেলে আসা জীবনের উদ্বেগ-উৎকর্ষাও যেন তখন ভেসে যায়।

বগুড়ার গ্রাজুয়েট মাসফিকুর রহমানের অভিজ্ঞতা এরকম- প্রকৃতির কাছাকাছি ধ্যানের গভীরতা যে এত বেশি হতে পারে তা বুঝতে পেরেছি যখন মাত্র একদিনের চিন্তা থেকেও আমার উপলব্ধি অনেক বেশি হয়েছে।

ধ্যান উৎসবে বেশ কয়েকজন স্কুল পড়ুয়া কিশোর-কিশোরীও অংশ নেয়। সেরকমই একজন- আইডিয়াল স্কুলের ছাত্র নুরুল মুক্তাদীর। একটি কথা দিয়েই তার উপলব্ধিকে বোঝা সম্ভব- বাসায় ফিরে এলাম আনন্দিত ও দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে, কারণ ভ্রমণ অভিজ্ঞতা ছিলো চমৎকার আর ফিরে আসাটা ছিলো কষ্টদায়ক।

প্রতিবেদক : রোকেয়া হক



বমদের ঐতিহ্যবাহী বাঁশ নৃত্য

১৫ বছরের মাইথ্রেন উধাও

মো. ফখরুল ইসলাম

কোর্স করে আমার এই আত্মবিশ্বাস হয়েছে যে মানুষ যা ভাবতে পারে, যা বিশ্বাস করতে পারে তা অর্জন করতে পারে।

১৫ বছর যাবত মাইথ্রেনে ভুগছিলাম। কোর্স করার পর আমার এতদিনের মাইথ্রেনকে খুঁজে পাচ্ছি না।

[মো. ফখরুল ইসলাম, শিক্ষার্থী, ১৫১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।]

জীবন বদলানো যায়

মো. মমিনুল ইসলাম স্বপন

মাঝে মাঝে খুব রেগে যেতাম। অফিসে রেগে গিয়ে বেশ কয়েকবার ভাউচার ছিঁড়ে ফেলেছি। এম.ডি সাহেব অনেকদিন থেকে এ কোর্সটি করতে বলছিলেন। অবশেষে তিনিই ভর্তি করিয়ে দিলেন।

এত দীর্ঘ সময় বসে থাকতে পারবো কি-না সন্দেহ হচ্ছিলো। কিন্তু কোর্সে গুরুজীর গল্পের চঙে চমৎকার শিক্ষণীয় আলোচনা শুনতে শুনতে আমি ভুলেই যাচ্ছিলাম কোথায় আছি।

১ম দু’দিন কোর্স শেষে এ পর্যন্ত আর রাগি নি। অফিসের সহকর্মীরা বেশ অবাক।

মেডিটেশন করে সত্যিই নিজেকে বদলানো যায়। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই মেডিটেশনের পথ ধরে আমরা অনন্য মানুষে পরিণত হতে পারি।

[প্রাকৌশলী মো. মমিনুল ইসলাম স্বপন ১৫১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।]

জীবন যাপনের সুন্দর পথ হোসনে আরা বেগম

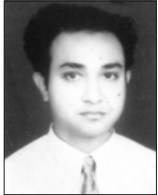
কোর্সে এসেছি আমার মেয়ের অনুপ্রেরণায়। ফ্রান্সে ছিলাম। সেখানে চিকিৎসা করিয়েছি। কিন্তু অতোটা সুস্থ হই নি। আমার মেয়ে বললো– এ কোর্স করলে ইনশা আল্লাহ পুরোপুরি সুস্থ হবেন।

আমি এখন বেশ ভালো আছি। এ বৃদ্ধ বয়সে আমি যে শিক্ষা পেয়েছি, জীবন যাপনের এ সুন্দর পথে যে আসতে পেরেছি, এজন্য আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গুরুঞ্জীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

[হোসনে আরা বেগম, গৃহিণী, ১৫১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।]

কোনো ফাঁক খুঁজে পাই নি আব্দুস সালেক

আমি জীবনে আমার অফিসের কাজেও অতোটা মনোযোগ দেই নি যতটা মনোযোগ দিয়ে গুরুঞ্জীর প্রতিটি আলোচনা শুনেছি। আসলে আমি ভীষণভাবে চেষ্টা করেছি আলোচনায় ফাঁক খোঁজার;



কিন্তু সত্যি বিস্ময়কর, কোথাও পাই নি।

মানুষ সব হতাশাগ্রস্ত হয়ে এদিক-সেদিক ছুটোছুটি করছে– কার কাছে গেলে প্রশান্তি পাওয়া যাবে। জীবনকে আলোকিত করার সত্যিকার মানুষ হলেন গুরুঞ্জী। আমরা এখান থেকে যা পেলাম তা পুরো দেশে ছড়িয়ে দিতে হবে।

[আব্দুস সালেক, ব্যবসায়ী, ১৫১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।]

ওষুধ ফেলে দিয়েছি খন্দকার আবুল কাশেম

আমি হাইপার টেনশনের রোগী। প্রতিদিন ওষুধ খেতে হতো। আমার একটা ধারণা হয়েছিলো কখনো বোধ হয় এ রোগ যাবে না এবং আমাকে জীবনভর টেনশনমুক্তির ওষুধ খেতে হবে।

কিন্তু সকলের দোয়ায় আমি ওষুধ ফেলে দিয়েছি। আমার একটুও অসুবিধা হয় নি এবং হবেও না বলে বিশ্বাস করি।

অতি আধ্যাত্মিকতায় আমার তেমন বিশ্বাস ছিলো না। কিন্তু এ কোর্সে এসে আমার এরূপ ধ্যান-ধারণা পুরোপুরি বদলে গেছে। মেডিটেশন কোর্সের এ আধুনিকায়নে, মেডিটেশনকে এমন সহজ রূপ দেয়ার পেছনে গুরুঞ্জী যে শ্রম-সাধনা, যে মেধা ব্যয় করেছেন তা অকল্পনীয়।

[আইনজীবী খন্দকার আবুল কাশেম ১৫১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।]

অনিদ্রা দূর হলো হাবীবুর রহমান চৌধুরী

আমার বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে একটি ঘোরতর সমস্যা ছিলো অনিদ্রা। ২৮ ডিসেম্বর মেডিটেশন করে ২৯ ডিসেম্বর থেকে আমি প্রচুর ঘুমিয়েছি। মেডিটেশন করতে করতে ঘুমিয়ে গেছি।

এ কোর্স শেষে আমার এই উপলব্ধি হয়েছে যে– মেডিটেশন মানব-জীবন উন্নয়নে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি বিষয়।

[হাবীবুর রহমান চৌধুরী ১৫১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।]

শুভ যাত্রা শুরু করেছি মো. আনিসুর রহমান খান

আমি একজন মু’মিনের অনুসন্ধান করছিলাম। সমাজে মুসল্লীর সংখ্যা বাড়লেও মু’মিনের সংখ্যা যেন জ্যামিতিক হারে কমে যাচ্ছে। গুরুজীর কথা আমি শুনেছি আমার ছেলে-মেয়ে, স্ত্রীর কাছে– তারা কোর্স করেছে– তার বইও পড়ৈছি। আমার একটা বিশ্বাস জন্মেছে জীবন-যাপন প্রণালীতে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে, আমি যে সংকটের মধ্য দিয়ে দিন যাপন করছিলাম, এছাড়া কিছু শারীরিক সমস্যা– যেমন ব্যাক পেইন– এসবের একটা সমাধান এখানে পাওয়া যাবে।

মেডিটেশন একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার একটা শুভ যাত্রা আমরা শুরু করেছি।

গুরুজীর প্রতিটি আলোচনা, প্রতিটি শিক্ষাকে অনুসরণের মাধ্যমে এর পরিপূর্ণতা আসবে।

অন্যের ক্ষতির চিন্তা বা কাজ করা যাবে না, রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন– এ শিক্ষা আগেও ছিলো; এখানে এসে এ শিক্ষা পরিপূর্ণতা পেয়েছে।

বিশ্বাসের অভাবে আজকে আমাদের এই সামাজিক দুর্গতি। তাই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে এই প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।

[প্রবীণ আইনজীবী মো. আনিসুর রহমান খান ১৫১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।]

লামায় সেবা দিতে চাই ডা. শাহাদাৎ হোসেন

আমরা এক গহীন অন্ধকারে নিমজ্জিত। পাশ্চাত্যের সমাজ জীবন দেখেছি। এত উন্নত হওয়ার পরও তাদের মনে শান্তি নেই। সেখানে রয়েছে আত্মিক শূন্যতা।

আমরা এই অশান্তি থেকে, সমস্ত অন্ধকার থেকে মুক্ত হওয়ার পথ পেলাম এ কোর্সের মাধ্যমে। কোর্সের দু’টি দিক আমার খুব ভালো লেগেছে। এক– সব ধর্মের অনুসারীরাই এ কোর্সের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। দ্বিতীয়ত– সততার শিক্ষা।

লামার কার্যক্রম শুনে আমার বেশ ভালো লেগেছে। ডাক্তার হিসেবে গুরুজীর অনুমতি সাপেক্ষে আমি সেখানে সপ্তাহ খানেকের জন্য দুঃস্থদের চিকিৎসা সেবা দিতে আগ্রহী।

[চর্ম ও যৌন রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. শাহাদাৎ হোসেন ১৫১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।]

যুগোপযোগী কোর্স এ.এফ.এম আওরঙ্গজেব

প্রচুর ব্যস্ততার মাঝেও অফিস থেকে তিন দিনের ছুটির ব্যবস্থা করলাম। সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র থাকতেই আমার মাইথ্রেন ছিলো। কোর্সের প্রথম দিন থেকেই খুব ভালো বোধ করলাম। এখন আর কোনো রকম মাইথ্রেনের সমস্যা নেই।

বিদেশের অনেক সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশ গ্রহণ করেছি। জীবনে প্রচুর বক্তা দেখেছি। কিন্তু গুরুজীর মতো এত বড় শিক্ষক, এত বড় বক্তা আর দেখি নি। প্রতিটি বিষয়ে তার গভীর জ্ঞান আমাকে মুগ্ধ করেছে। গুরুজীর প্রাণবন্ত বক্তব্য শুনতে আমার মনোযোগ এক মিনিটের জন্যও বিচ্ছিন্ন হয় নি। আমার জীবনে দেখা একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ তিনি।

আমাদের সমাজের অধিকাংশ মানুষই অস্থিরতায় ভুগছে। প্রায় প্রতিটি পরিবারেই রয়েছে অশান্তি। এই অস্থিরতা এবং অশান্তি দূরীকরণে কোয়ান্টাম যুগোপযোগী একটি কোর্স। এ কোর্সের জন্য কোনো বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন হয় না। কারণ ‘একজন সন্তুষ্ট ভোক্তাই একটি বড় বিজ্ঞাপন’; অর্থাৎ কোনো ভোক্তা ‘পণ্যে’ সন্তুষ্টি লাভ করলে এমনিতেই সে প্রচারণা চালাবে। আমার এখানে শতভাগ সন্তুষ্টি রয়েছে। আমার স্ত্রীকেও কোর্স করতে উৎসাহিত করবো বলে আশা রাখি।

[চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এ.এফ.এম আওরঙ্গজেব ১৫৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।]

সফল চিকিৎসা পদ্ধতি ডা. মো. মঞ্জুরুল হক

মেডিটেশন অত্যন্ত ফলপ্রসূ চিকিৎসা পদ্ধতি। দেশের বাইরে যাবার সুযোগ আমার হয়েছে। সেখানে দেখেছি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিকে মেডিক্যাল সাইসে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়।

শিখিলায়ন বা মেডিটেশনকে প্রতিটি মানুষের জন্যে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে উপস্থাপন করেছেন গুরুজী। তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন– শতকরা ৭০ ভাগ রোগই মনোদৈহিক। এর জন্য কোনো ওষুধ বা চিকিৎসার প্রয়োজন নেই। দরকার শুধু রিলাক্সেশন বা শিখিলায়ন। আমার কাছে প্রতিদিন অনেক রোগী আসে গ্যাস্ট্রিক/আলসারের সমস্যা নিয়ে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি ৬৫% রোগীর কোনো অরগানিক সমস্যা থাকে না। তারা শুধু শিখিল হতে পারলেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে। কোর্স করে এই শিখিলায়নের গুরুত্ব অনুভব করেছি।

[সৈয়দপুর জেনারেল হাসপাতালের সিনিয়র কনসাল্টেন্ট ফিজিশিয়ান, গ্যাস্ট্রোইনটেস্টিনল সার্জন ডা. মো. মঞ্জুরুল হক ১৫২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।]

মানুষের কল্যাণে কাজ করে যেতে চাই রওশন আরা

আমার একটা কঠিন অসুখ হয়েছিলো– ব্রেন টিউমার। অপারেশন হয়েছে। অফিসে আমি সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠতে পারি না। প্রচণ্ড কষ্ট হয়। এখনে প্রথম দিন পাঁচতলায় উঠতে প্রচণ্ড কষ্ট হয়েছিলো। কিন্তু এখন আমার এত ভালো লাগে যে, আমি তরতর করে পাঁচতলায় উঠে যাই। একটা আত্মবিশ্বাস জন্মেছে আমি বাঁচবো এবং আমি বাঁচতে চাই। মানুষের কল্যাণে কাজ করে যেতে চাই।

[রওশন আরা চাকরিজীবী। ১৫২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।]

জীবন যাপনের বিজ্ঞান সুফিয়া বেগম

হোস্টেলে আমার ক্লমমেটকে চূপচাপ বসে থাকতে দেখে এক প্রকার ভয় পেয়ে গেলাম। মনে মনে ভাবছিলাম এ আমি কাকে আশ্রয় দিলাম, যে চোখ বন্ধ করে বসে থাকে কিন্তু ডাকলে জবাব দেয় না। পরে জানলাম সে মেডিটেশন করছিলো। তার আচার-ব্যবহার আমাকে খুব মুগ্ধ করতো। তারই অনুপ্রেরণায় আমি কোয়ান্টাম কোর্স করতে উৎসাহী হই। ভয়-ভীতি, অস্থিরতা দূরীকরণে এটি চমৎকার একটি কোর্স। এটি আমাদেরকে সেই শিক্ষাই দেয় যা একজন মানুষকে অনন্য মানুষ হিসাবে গড়ে তোলে, জীবনকে সুন্দর করে সাজাতে শেখায়। ভালো ছাত্র হওয়ার জন্যেও সহায়ক এ কোর্স। এক কথায় কোয়ান্টাম হচ্ছে জীবন যাপনের বিজ্ঞান।

[সুফিয়া বেগম, শিক্ষার্থী। ১৫৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।]

যুক্তি ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয় এম.এ কাদির

কোর্সের প্রতি আমার তেমন কোনো আগ্রহ ছিলো না। বড় দুই মেয়ের অনুপ্রেরণায় কোর্স করতে উৎসাহিত হই। কোর্স করে অনেকখানি উপকৃত হয়েছি। প্রতিটি মানুষেরই এ কোর্সটি করা উচিত। যুক্তি, ধর্ম ও বিজ্ঞান– এ তিনটির সংমিশ্রণেই কোয়ান্টাম মেথড। গুরুজী এমন কোনো কথা বলেন নি যাতে এ তিনটির যোগসূত্র নেই। গুরুজীর প্রতিটি কথাই আমার ভালো লেগেছে। আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত তাকে অনুসরণ করা এবং তার প্রতিটি কথা মেনে চলা।

[ব্যবসায়ী এম.এ কাদির ১৫৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।]

সাইনুসাইটিস থেকে মুক্তি লাভ তাহরীমা জামিল এলিজা

দীর্ঘদিন থেকে সাইনুসাইটিসে ভুগছিলাম। রাইনোজল নামে নাকের ড্রপ ব্যবহার করতাম নিয়মিত। কিন্তু মেডিটেশন কোর্স করার পর ড্রপ কিংবা মাথা ব্যথার কোনো ওষুধ নিতে হয় নি। মেডিটেটিভ লেভেলে নিজেকে হিলিং করার পর শুধু শারীরিক নয়, মানসিক ভাবেও পরম তৃপ্তি এবং প্রশান্তিবোধ করছি– যা মেডিসিন কখনো দিতে পারবে না।

একটা সময় ছিলো যখন আমি ভীষণ অস্থিরতায় ভুগতাম। প্রতিদিনের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো নোট বুকে লিখে রাখতে হতো। এখন আর তা করতে হয় না। বরং যথা সময়ে মনই আমাকে সচেতন করে দেয় সঠিক কাজটি করার জন্য। আমার স্মৃতিশক্তি প্রখর হয়েছে। দৈনন্দিন কাজকর্ম নিয়ে যে হতাশা বোধ করতাম এখন তা থেকে নিস্তার পেয়েছি।

[তাহরীমা জামিল এলিজা ১৪৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।]

স্বামীকেও নিয়ে আসবো ডা. ফারজানা জাহান

আমি ভীষণ ভুলো মনের। বদমেজাজীও। যার জন্য ঘরে তো অবশ্যই, পাশাপাশি ডাক্তার ও রোগীর পারস্পরিক সম্পর্কেও সমস্যা হচ্ছিলো। প্রায়ই রোগীর সাথে গামা লেভেলের আচরণ করে নানা সমস্যা তৈরি করতাম। এসব স্বীকার করতে এখন আর লজ্জা পাচ্ছি না বরং অনুশোচনা হচ্ছে এবং নিজের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হছি আমার আচরণ ও ব্যবহার এখন অনেক আন্তরিক এবং মানবিক করবো। পাশাপাশি ঘরের সম্পর্কটিকেও যেন খুব দৃঢ় করতে পারি সে জন্য আগামী ব্যাচে আমার স্বামীকেও নিয়ে আসবো। কারণ শুধু এক পক্ষের ভালো আচরণ এই সম্পর্কে সুন্দর করতে পারে না। এ জন্য প্রয়োজন উভয়ের আন্তরিক প্রচেষ্টা। [ডা. ফারজানা জাহান, ওমসানি মেডিক্যাল কলেজে কর্মরত ১৫৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।]

আমি গর্বিত ও আনন্দিত কাজী আসিফুল ইসলাম

আমাদের বাসায় গত ৬ বছর যাবৎ মেডিটেশনের চর্চা রয়েছে। আমার মেঝা ভাই প্রথম কোয়ান্টাম কোর্স করেন। একে একে আমাদের পরিবারে ১৩ জন এ কোর্স সম্পন্ন করেন। আমাদের পরিবারে প্রতি বৃহস্পতিবার পরিবারিক মেডিটেশন এবং প্রতি শুক্রবার যৌথ মেডিটেশন চালু রয়েছে। শুধু মেডিটেশনই করতাম। তেমন কিছু বুঝতাম না বা উপলব্ধি করতে পারতাম না। কোর্স করে এখন বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারছি। এ কোর্স করে সত্যিই আমি গর্বিত ও আনন্দিত।

[শিক্ষার্থী কাজী আসিফুল ইসলাম ১৫৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।]

একটি সং সংগঠন দিলরুবা খানম

কোর্স করার পূর্বে প্রচণ্ড হতাশাগ্রস্ত ছিলাম। মানুষের মঙ্গলের চিন্তা করতাম। কিন্তু কীভাবে করবো ঠিক বুঝতে পারতাম না। ভালো সংগঠনের খোঁজ করেছি। যেখানেই গিয়েছি সেখানেই কোনো না কোনো ফাঁক লক্ষ্য করতাম। মনে হতো এমন কি কোনো ভালো সংগঠন নেই যারা মানুষকে হতাশা থেকে মুক্তি দিতে পারে, ভালো ছাত্র হওয়ার উপায় বলে দিতে পারে এবং অনন্য মানুষ হতে সহায়তা করবে। কোথাও পাই নি। কোয়ান্টাম কোর্স করে সেই ভালো সংগঠনের দেখা পেলাম। গুরুজীর মতো অনন্য মানুষকে খুঁজে পেলাম। এখন নিজেকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করবো।

[সাংস্কৃতিক কর্মী দিলরুবা খানম ১৫৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।]

কোয়ান্টাম আলোকিত হতে শেখায় বদরুল হোসেন শাহিন

আমার একটি ফার্মেসি আছে। একটি ছেলে প্রতি মাসেই ৫/৬ হাজার টাকার ওষুধ কিনতো আমার কাছ থেকে। হঠাৎ খেয়াল হলো, গত এক বছরে সে একবারও ওষুধ কিনতে আসে নি। ব্যাপারটা খোঁজ নিতে গিয়ে কোয়ান্টাম মেথডের কথা শুনলাম। তারপর আর সময় নষ্ট না করে চলে এলাম দেখতে– কী এমন জাদু আছে এখানে, যার জন্য এত পুরনো একজন ক্রেতাকে হারাতে হলো।

কিছুটা অবিশ্বাস আর দ্বিধা-দ্বন্দ্বের টানা-পোড়েনেই প্রথম দিন চুকেছিলাম। ক্লাসে আজ বেরিয়ে যাবো নতুন এক আত্মউপলব্ধি নিয়ে যা আমাকে, আমাদেরকে জীবন সংগ্রামে জয়ী হতে শেখাবে, আলোকিত হতে শেখাবে।

[বদরুল হোসেন শাহিন, ব্যবসায়ী, ১৫৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।]



কোয়ান্টাম বুলেটিন - ৭

ছাত্র জীবনে শিক্ষকের কাছে শিখেছি এবং শিক্ষক হয়ে ছাত্রদের শিক্ষা দিয়েছি, জীবনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার শিক্ষক ইত্যাদি হওয়া। কিন্তু ২১ ফেব্রুয়ারী গুরুজীর কাছে শিখলাম জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে অনন্য মানুষ হওয়া। এই অর্জনের পথ হচ্ছে সৃষ্টির সেবা করা এবং সেই সেবা করার উপায় বা প্রক্রিয়া হচ্ছে সুপ্ত মেধার বিগ্ধ বিকাশ ঘটিয়ে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক বা অন্যান্য পেশায় নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তোলা। সক্রিয় গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপের অনুভূতি এভাবেই ব্যক্ত করেছেন ১০০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট টেক্সট মেহেরনিগার মেমোরিয়াল একাডেমির প্রিন্সিপাল আব্দুল মান্নান সরকার।

গত ২১ ফেব্রুয়ারী ও ২৬ মার্চ দুই পর্বে বিভিন্ন শাখা ও সেলের অগ্রসর গ্রাজুয়েটদের নিয়ে ফাউন্ডেশন একটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করে। ১০৬ জন গ্রাজুয়েট এতে অংশগ্রহণ করেন। তাদেরই একজন ১৩৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট ডা. হাবিবুর রহমান। তিনি বলেন, অগ্রসর গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ নিঃসন্দেহে একটি দুর্লভ সুযোগ। টানা ১০ ঘণ্টা গুরুজীর সান্নিধ্য আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দদায়ক। এর ফলে কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যদের সাথে হৃদয়তাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এ ওয়ার্কশপের

অগ্রসর গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপে গুরুজী : জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত অনন্য মানুষ হওয়া

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনন্য মানুষ হওয়ার শর্তাবলী সম্বন্ধে আলোচনা। আমরা যদি গুরু নির্দেশিত পথে চলতে পারি তবে অবশ্যই অনেক উচ্চ গুণাবলি সম্পন্ন মানুষ হতে পারবো।

ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছেন ১৪১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট ব্যবসায়ী জনাব দেলোয়ার হোসেন। তিনি বলেন, শৃঙ্খল মুক্তির মেডিটেশনটি খুব ভালো লেগেছে। কোয়ান্টামের যে কোনো প্রোগ্রামে অংশ নিয়ে আমি খুব লাভবান হই।

কোয়ান্টামের যত প্রোগ্রামে অংশ নিয়েছি তার মধ্যে এই ওয়ার্কশপ এক নতুন উপলব্ধির সৃষ্টি করেছে আমার মধ্যে। ভাষা শহীদদের কিভাবে শ্রদ্ধা জানাতে হয় তা এ ওয়ার্কশপে গুরুজী শিখিয়েছেন। খুব ভালো লেগেছে আমাদের মধ্যে ‘সুপারম্যান পাওয়ার’ জাহত করার বিষয়টি। জীবনের লক্ষ্য কি হবে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা পেয়েছি। এভাবেই অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন ১০০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট চাকরিজীবী মিসেস জাকিয়া সুলতানা।

৭৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট আইডিয়াল স্কুলের ছাত্র নূরুল মুজাদ্দীর। এ ওয়ার্কশপে তার অনুভূতি ছিলো এরকম— আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন এসেছে। আগে অতিরিক্ত উত্তেজনা নিয়ে পড়াশুনা বাদ দিয়ে খেলা দেখতে বসতাম। প্রিয় দল পরাজিত হলে চোখে পানি এসে যেত। কিন্তু এখন বুঝি এটা কত হাস্যকর। আগে ভাবতাম বিজ্ঞান নিয়ে না পড়লে পড়াশুনা করে কি লাভ? কিন্তু এখন আমার কাছে জীবনে প্রথম হতে পারার লক্ষ্য আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

কোর্স যখন করি তখন উদ্দেশ্য ছিলো নিজেকে গড়ে তোলা। আর এখন মনে হচ্ছে শুধু নিজেকে গড়ে তোলা নয় বরং পরিপূর্ণ তখনই হতে পারবো যখন অন্যের জন্য কিছু করতে পারবো। সুপারম্যান মেডিটেশনটি আমার মধ্যে এই বোধ জাহত করেছে। আমার মিশনকে সুনির্দিষ্ট করতে এই ওয়ার্কশপের খুব প্রয়োজন ছিলো— বলেছেন ১৩৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট ডা. সোনিয়া হোসেন উর্মি।

প্রতিবেদক : সাদিয়া পারভীন

চিল্লার সাফল্য

সৈয়দা আমিনা বেগম

কোর্স করার আগে আমার অনেক সমস্যা ছিলো। কিন্তু এখন আমি আল্লাহর রহমতে সমস্যা মুক্ত।



মৌন সাধনা বা চিল্লার মাধ্যমে প্রাপ্ত আমার কয়েকটি সাফল্যের ঘটনা লিখছি।

আমার এক আত্মীয়কে ব্যবসা করার জন্য ১০ লক্ষ টাকা দিয়েছিলাম। কিছু দিন পর লক্ষ্য করলাম লাভ তো দূরের কথা, আমার আসল টাকারই কোনো হদিস নেই। এ নিয়ে খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম। তখন আমি গুরুজীর সঙ্গে দেখা করলাম। গুরুজী আমাকে পরামর্শ দিলেন— টাকা আমি ফেরত পাবো, তবে আমাকে চিল্লা করতে হবে। গুরুজীর পরামর্শ মতো চিল্লা শুরু করলাম। এটা ১৯৯৬ সালের কথা, দৈনিক ৮ ঘণ্টা করে মনোযোগের সাথে চিল্লা করতে থাকলাম। এ ভাবে ৩ বছরের মধ্যে আমি আমার পাওনা টাকা ফিরে পেলাম কোনো প্রকার হুমকি ছাড়াই। এখানে উল্লেখ্য যে, আমি উক্ত ব্যক্তির সাথে টাকার ব্যাপারে কখনো সরাসরি যোগাযোগ করি নি। ফোন ও চিঠির মাধ্যমেই যোগাযোগ করেছি। আমি এবং আমার পরিবারের সবাই নিয়মিত চিল্লা ও মেডিটেশন করি। বর্তমানে আমরা বিভিন্ন সমস্যা থেকে মুক্ত।

আমি একটি তৈরি বাড়ি ক্রয় করেছিলাম। পরে তা বিক্রিও করে দিই। এই বাড়ির ব্যাপারে আমার এক আত্মীয় আমাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করেছিলো। আমরা নিয়মিত চিল্লা করেছি। আল্লাহর রহমত ও গুরুজীর দোয়ায় আমাদের কোনো বিপদ হয় নি। এ জন্য গুরুজীর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

চিল্লা করে স্বামী-স্ত্রীর অনেক বছরের দাম্পত্য সমস্যার সমাধান হয়েছে। আমার বড় ছেলে একটি ভালো চাকরি পেয়েছে।

আমরা নিয়মিত চিল্লা করবো, পরিবারে শান্তি বজায় রাখবো। চিল্লা প্রসঙ্গে গুরুজী বলেছেন, মাসে এক বছরে বারো তার বেশি যত পারো।

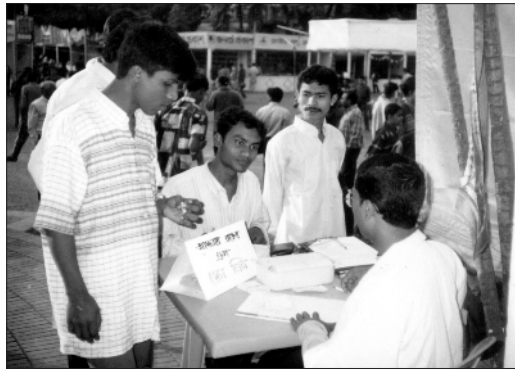
চট্টগ্রাম মহিলা সেলের পরিচালক সৈয়দা আমিনা বেগম ৪০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।

একুশের বইমেলায় মাসব্যাপী স্বেচ্ছা রক্তদান ক্যাম্প

গত বছরের মতো এবারও বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে একুশের বই মেলায় মাসব্যাপী রক্তদান ক্যাম্পের আয়োজন করে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম। কোয়ান্টামের পাশাপাশি এবারও রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, বাংলাদেশ খেলাসেমিয়া সোসাইটি, সন্ধানী, নেগেটিভ ব্লাড গ্রুপ এসোসিয়েশন এবং লায়স ক্লাব মেলায় ব্লাড ক্যাম্পের স্টল নেয়।

কোয়ান্টামের ক্যাম্প আয়োজিত হয় বাংলা একাডেমির বর্ধমান ভবনের ব্যালকনিতে তথ্য কেন্দ্রের পাশে। রক্তদানে উদ্বুদ্ধকরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বাক্য সম্বলিত ফেস্টুন ও ব্যানার ছিলো পুরো মেলা জুড়ে। এছাড়াও তথ্যকেন্দ্র থেকে মাইকিং এর পাশাপাশি কোয়ান্টামের স্বেচ্ছা কর্মীরা মেলায় আগত মানুষদের রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করেন। তারা রক্তদাতার সুবিধাসমূহ এবং দেশে চলমান বিগ্ধ রক্তের সংকট সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত করেন। এই মোটিভেশনের

একুশের বই
মেলায়
মাসব্যাপী
রক্তদান ক্যাম্প
ফর্ম পূরণ
করছেন
কয়েকজন
ডোনার।



ফলে কোয়ান্টাম ছাড়াও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ক্যাম্পে রক্ত দাতার সংখ্যা অনেক বেড়েছে।

মেলায় ক্যাম্পে প্রতিদিন বিভিন্ন বয়সের লোকজন রক্তদান করেছেন। তবে এর মধ্যে তরুণ-তরুণীদের সংখ্যাই ছিলো বেশি। রক্তদাতাদের মধ্যে অনেকে গতবারের ক্যাম্পেও রক্ত দিয়েছিলেন। কেউ কেউ জীবনে প্রথমবারের মতো রক্ত দিয়েছেন। কেউ আবার নিজস্ব পরিমণ্ডলে ব্লাড ক্যাম্প আয়োজনে আগ্রহ প্রকাশ করেন। অনেক খ্যাতিমান লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ক্যাম্প পরিদর্শন

করেন এবং কোয়ান্টামের কার্যক্রমের প্রশংসা করেন। সংবাদপত্র, রেডিও ও টিভি মিডিয়াগুলো এ সম্পর্কিত খবর ও অনুষ্ঠান প্রচার করে।

এবার বই মেলায় ক্যাম্পে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২৫ ব্যাগ রক্ত সংগৃহীত হয়। এর মধ্যে একদিনের সর্বোচ্চ সংগ্রহ ছিলো ৭২ ব্যাগ। রক্তদান ছাড়াও প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৪০ জনের গ্রুপিং করা হয়।

বইমেলায় এই মাসব্যাপী রক্তদান ক্যাম্প সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে রক্তদান সচেতনতা বৃদ্ধি করে।

প্রতিবেদক : আমজাদ হুসাইন

কোয়ান্টাম বুলেটিন : মে ২০০৩। সম্পাদক : কাজী মাহতাব উদ্দিন আহমদ ॥ নাহার আল বোখারী, পরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ১১৯/পি শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ ফোন : ৯৩৪১৪৪১, ৮৩১৯৩৭৭

কোয়ান্টাম বুলেটিন

রক্তদাতা সম্মাননা সংখ্যা



রক্তদান পারলৌকিক মুক্তির পথ সুগম করবে প্রফেসর ডা. নুরুল ইসলাম

উত্তম কাজের জন্যে উত্তম পুরস্কার ছাড়া আর কী থাকতে পারে? পবিত্র কোরআনের এই উদ্ধৃতি থেকেই বলা যায় যারা অজানা অচেনা মুমূর্ষু মানুষকে বাঁচাতে কোনো প্রতিদানের আশা না করেই স্বেচ্ছা রক্ত দিচ্ছেন, বিপুল রক্তকে নিশ্চিত করতে আন্তরিকভাবে কাজ করছেন তাদের এই উত্তম কাজের উত্তম প্রতিদান নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের দেবেন।

ডেঙ্গু, থ্যালাসেমিয়াসহ এমন কিছু রোগ আছে যার চিকিৎসার একমাত্র ওষুধই হলো রক্ত। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই দেখা যায় মুমূর্ষু অবস্থায় রক্ত পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলেও হয় দাম বেশি, নয় এইডস, হেপাটাইটিস সহ নানা জীবাণু আক্রান্ত। তাই রক্ত যেমন খুব প্রয়োজন তেমন প্রয়োজন জীবাণুমুক্ত ও নিরাপদ রক্ত।

কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম এই নিরাপদ রক্ত নিশ্চিত করতে স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের সংগঠিত করা সহ রক্তের বিভিন্ন সংক্রামক রোগ-ব্যাদির পরীক্ষা কম খরচে করিয়ে মানবতার সেবাতোই নিজেদের নিবেদিত করেছে। সম্প্রতি তারা নিজেদের অর্থে মূল্যবান কিছু যন্ত্রপাতি কিনেছে যা দিয়ে রক্তের উপাদান পৃথক করে বহুমুখী সেবা দেয়া সম্ভব হবে। দেশ ও মানুষের কল্যাণে অত্যন্ত উপকারী এই পদক্ষেপের জন্যে আমি তাদের জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন এবং প্রার্থনা করি এ কাজের প্রতিদান পরম করুণাময় তাদের দিন।

[ইউএসটিসির প্রতিষ্ঠাতা জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম বাংলাদেশে উচ্চতর চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষার অগ্রপথিক। অগ্রয়োজনীয় ওষুধের বিরুদ্ধে সবসময় সোচ্চার কণ্ঠস্বর। অগ্রয়োজনীয় ওষুধ নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে জাতীয় ঔষধনীতির তিনি মূল স্থপতি। ধূমপানের বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির তিনিই মূল উদ্যোক্তা। একজন সফল চিকিৎসাবিদ হিসেবে রোগ নিরাময়ে মনের অসীম ক্ষমতাকে সব সময়ই প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই তিনি দশ বছর আগে নিঃসঙ্কোচে বলেছেন যে, আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা ও কোয়ান্টাম মেথড পরস্পর সম্পূরক ও পরিপূরক।]

সহস্র আজীবন স্বেচ্ছা রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠান

সুস্থ ও নিরাপদ রক্তদান আন্দোলনে নতুন যুগের সূচনা

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম সহস্র আজীবন স্বেচ্ছা রক্তদাতাকে সম্মাননা প্রদানের মাধ্যমে সুস্থ ও নিরাপদ রক্তদান আন্দোলনে নতুন যুগের সূচনা করেছে।

গত ৬ জুলাই ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে আজীবন স্বেচ্ছায় রক্তদানে অঙ্গীকারাবদ্ধ রক্তদাতাদের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম এবং বিশেষ অতিথি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। তারা সবাই কমপক্ষে তিনবার রক্ত প্রদান করার পর আজীবন রক্তদানের এই অঙ্গীকার করেছেন এবং স্বীকৃতিস্বরূপ পেয়েছেন সার্টিফিকেট এবং বিশেষ আইডি কার্ড।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান শহীদ আল বোখারী মহাজাতকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন বিশেষ অতিথি দেশের প্রবীণতম রক্ত পরিসঞ্চালন বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ডা. মুজিবুর রহমান, কোয়ান্টাম ল্যাবের অনারারী পরিচালক প্রফেসর ডা. এবিএম ইউনুস, পরিচালক মোটিভেশন শিল্পপতি কাজী মাহতাব উদ্দিন আহমদ এবং স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের প্রধান সমন্বয়ক মাদাম নাহার আল বোখারী।

সহস্র আজীবন রক্তদাতাদের সাথে রয়েছেন একবার বা দু'বার রক্ত দিয়েছেন এমন ৮ হাজার রক্তদাতা সমন্বয়ে সুসংগঠিত ব্লাড ডোনার পুল যা দেশে এই প্রথম। তারা গত তিন বছরে ১৩,০০০ ব্যাগ রক্ত দান করেছেন।



প্রধান অতিথির কাছ থেকে সম্মাননা ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন একজন আজীবন রক্তদাতা।

কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম এখন প্লাটিলেট কনসেন্ট্রেট, ফ্রেশ প্লাজমা, ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা, প্লাটিলেট রিচ প্লাজমা, প্লাটিলেট পুওর প্লাজমা, ক্রায়ো-প্রিসিপিটেট, প্রোটিন সলিউশন ও আরসিসি সহ রক্তের সকল উপাদান প্রদানে সক্ষম।

যোগাযোগের ঠিকানা :



স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম
কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

১/১ পায়োনিয়ার রোড, (সেগুনবাগিচা) কাকরাইল, ঢাকা।
ফোন : ৮৩৩৫১৯৬৯, ৮৩২২৯৮৭, ০১৭৪-০১০৮৬৯



পাওয়া নয় দেওয়ার মধ্যেই বড় আনন্দ

অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

তখন আমি ক্লাস এইটের ছাত্র। একদিন স্কাউটিং স্যার বললেন, ইছামতি নদীর অমুক ব্রিজের নিচে কচুরিপানা জমে নদী মরে যাচ্ছে, চলো আমরা সবাই মিলে সেগুলো পরিস্কার করি। কথামতো একদিন সকালে আমরা কয়েকজন নামলাম নদীতে। প্রচণ্ড রোদের মধ্যে ঘেমে-নেয়ে কাজ করতে করতে যখন দুপুর দুটো বাজলো, হঠাৎ তাকিয়ে দেখি সমস্ত নদী স্বচ্ছ পানিতে টালমল করছে। দৃশ্যটা দেখে এক গভীর শান্তিতে আমার বুকের ভেতরটা ভরে গেলো। মনে হলো, শুধু নিজের জন্যে নয়, সবার জন্যে যে কষ্টটা করলাম এর মধ্যে এক অদ্ভুত তৃপ্তি আছে। সেদিনই বুঝলাম পাওয়ার মধ্য দিয়ে নয়, দেয়ার মধ্য দিয়েই বড় আনন্দ পেতে পারে মানুষ।

সংস্কৃত ভাষায় 'দেওতা' শব্দটির মানে যিনি দেন। বাংলায় বলে 'দেবতা'। এই দেবতা আকাশে থাকে না, এই দেবতা চারপাশের অসংখ্য মানুষ- যারা দেন।

এখানে সমবেত রক্তদাতাগণও একেকজন দেবতা- যারা কোনো লাভের জন্যে নয় বরং দুঃখী মানুষকে ভালোবেসে মৃত্যুপথযাত্রীকে বাঁচাবার আনন্দে রক্ত দিচ্ছেন। এই দেয়ার জন্যে আমি আপনাদের অভিনন্দন জানাই। কারণ শত শত মানুষের এই বিন্দু বিন্দু দানের প্রবণতা দেখে প্রচণ্ড হতাশার এই দিনেও মনে আশা জাগে যে, এর মধ্য দিয়েই বাংলাদেশ তৈরি হচ্ছে।

আর রক্ত দেয়ার মধ্য দিয়ে যে দিতে শিখছে মানুষ, এই শিক্ষাই একদিন তাকে এমন কিছু দিতে অনুপ্রাণিত করবে যা সে সাধনা করে, ত্যাগ দিয়ে অর্জন করেছিলো।

তাই আজীবন রক্তদাতার সংখ্যা এক হাজার নয়, এমন দিনের প্রত্যাশা আমরা করছি যেদিন তের কোটি মানুষের মধ্যে যারাই সক্ষম তারাই রক্ত দেবে। আর এ দেয়ার মধ্য দিয়েই দেশ একটু একটু করে এগিয়ে যাবে। কারণ একটা জাতি তখনই তার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে পারে যখন অসংখ্য মানুষের আত্মত্যাগ সেখানে থাকে।

[সর্বজন শ্রদ্ধেয় পরিবেশবিদ এবং বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ প্রদত্ত 'সহস্র আজীবন স্বেচ্ছা রক্তদাতা সম্মাননা' অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যের সারসংক্ষেপ।]

প্রত্যেকের লক্ষ্য হওয়া উচিত নিরাপদ রক্ত সরবরাহ নিশ্চিত করা

খোন্দকার জাকারিয়া খালেদ



কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন অল্প কয়েক বছর হলো এগিয়ে এসেছে দেশে নিরাপদ রক্ত সরবরাহের কর্মসূচি নিয়ে। সম্প্রতি কোয়ান্টাম রক্তের বিভিন্ন উপাদান পৃথকীকরণ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে

রক্তের আধুনিক ব্যবস্থাপনার জগতে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। তারা সাধুবাদ পাবার যোগ্য।

নিরাপদ রক্ত আন্দোলনের কাজটি কষ্টকর হলেও তা মহৎ ও তুষ্টিকর। কাজটি একজন বা একটি প্রতিষ্ঠানের নয়, সম্ভবও নয়। তাই অনেক সংগঠন ও ব্যক্তিত্বকে এই কাজে এগিয়ে আসতে হবে; বেশ কিছু সংগঠন নিয়োজিত আছেও। তবে মনে হয়, প্রত্যেকের লক্ষ্যই থাকা উচিত নিরাপদ রক্ত/রক্ত উপাদান সরবরাহ নিশ্চিত করা। যেনতেন ভাবে রক্ত সংগ্রহ করে বিতরণ করা খুব প্রশংসনীয় কাজ নয়। কারণ এক ব্যাগ রক্ত যেমন একজন মূর্খ রোগীর জীবন বাঁচাতে সাহায্য করে, ঠিক তেমনি জীবাণুযুক্ত রক্ত একজন মানুষকে মৃত্যুর কোলেও ঠেলে দিতে পারে। আমরা যেন কাউকে সাহায্য করতে চেয়ে ক্ষতি না করি, বাঁচাতে গিয়ে মেরে না ফেলি এটা খেয়াল রাখতে হবে। এটি শান্তিযোগ্য অপরাধ বটে।

[খোন্দকার জাকারিয়া খালেদ দেশের স্বৈচ্ছা রক্তদানে উদ্বুদ্ধকারী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব, ডাইরেক্টর ট্রেনিং, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি।]

রক্তদানে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করতে হবে

ডা. শাহানা জাফর



আসলে স্বৈচ্ছায় রক্তদানের ধারণাকে যত বেশি ছড়িয়ে দেয়া যাবে ততই নিরাপদ রক্ত প্রাপ্তিকে নিশ্চিত করা যাবে। আর এজন্যে চালাতে হবে ব্যাপক মোটিভেশন কার্যক্রম। এ কাজে সংবাদপত্র, টেলিভিশন এমনকি

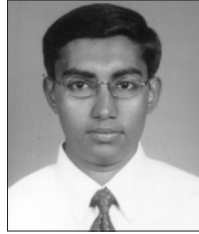
স্কুল পাঠ্য বইকেও কাজে লাগানো যেতে পারে যার মাধ্যমে বোঝানো হবে রক্ত দেয়া প্রতিটি সক্ষম মানুষের নৈতিক দায়িত্ব এবং নিয়মিতভাবেই সে তা দিতে পারে। রেডক্রিসেন্ট এখন এ বিষয়টিতেই জোর দিচ্ছে। গত বছর আমরা মোট ১৭ হাজার ব্যাগ রক্ত সংগ্রহ করেছি এবং উপাদান পৃথক করে সরবরাহ করেছি ২৫ হাজার ব্যাগ রক্ত।

[ডা. শাহানা জাফর অফিসার ইন চার্জ, রেড ক্রিসেন্ট ব্লাড সেন্টার, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।]

নিরাপদ রক্ত আন্দোলনের পথিকৃৎ ও সহযোগীরা

দেশের প্রবীণ রক্ত পরিসংখ্যানবিদ প্রফেসর ডা. মুজিবুর রহমানের তত্ত্বাবধানে ১৯৭২ সালের ১০ জুন জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম নিজ রক্তদানের মাধ্যমে বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বৈচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের সূচনা করেন। ১৯৭৩ সালে রেডক্রস (পরবর্তীতে রেড ক্রিসেন্ট হিসেবে) এবং ১৯৭৮ সালে সন্ধানী এ কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্যমে সাংগঠনিকভাবে বাংলাদেশে স্বৈচ্ছা রক্ত আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীতে এগিয়ে এসেছে অরকা (১৯৮২), বাঁধন (১৯৯৭) বা লায়ন্স বাংলাদেশের মতো রক্ত সংশ্লিষ্ট স্বৈচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো। এই পথ ধরেই ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কোয়ান্টামের স্বৈচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম। রক্ত কার্যক্রমের কয়েকজন সাংগঠনিক ব্যক্তিত্বের সাথে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতেই এই প্রতিবেদন।

স্বৈচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর সমন্বয় প্রয়োজন মো. আশিক রায়হান



৭৮ সালের ২ নভেম্বর কিছুসংখ্যক মেডিকেল ছাত্রের উদ্যোগে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংকে একটি রক্তদান কর্মসূচি আয়োজনের মাধ্যমে সন্ধানীর স্বৈচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের যাত্রা শুরু। পরবর্তী ২৬ বছরে

এ কার্যক্রমকে ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে সন্ধানী দেশব্যাপী গঠন করেছে ১৪টি মেডিকেল কলেজ ইউনিট। এখন বছরে প্রায় ৪০/৪২ হাজার রক্ত সংগৃহীত হয় আমাদের মাধ্যমে। কিন্তু বছরে ৪ লক্ষাধিক ব্যাগ রক্তের চাহিদার তুলনায় এ পরিমাণ যথেষ্ট নয় তা বলাই বাহুল্য। তাই আমি মনে করি এখন আমাদের উচিত রক্ত কার্যক্রমের সাথে জড়িত স্বৈচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে নিয়ে সমন্বিতভাবে কাজ করা।

[মো. আশিক রায়হান, সাধারণ সম্পাদক, সন্ধানী কেন্দ্রীয় পরিষদ।]

ক্রীনিং সহ রক্ত দেয়া কোয়ান্টামের ভালো দিক পার্থ সরকার



স্বৈচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম বাঁধন সংগঠিত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্যোগে। আমরা মূলত আমাদের তালিকাভুক্ত ডোনারদের মধ্য থেকে যখন যে গ্রুপের রক্ত প্রয়োজন সে অনুযায়ী তাদেরকে

ক্লিনিক বা হাসপাতালে পাঠাই রক্ত দেয়ার জন্য। বাংলাদেশে নিরাপদ রক্ত সংগঠন আইন ২০০১ অনুযায়ী যে পাঁচটি টেস্ট বাধ্যতামূলকভাবে করা উচিত তা সব জায়গায় করা হচ্ছে না। কোয়ান্টাম এই পাঁচটি টেস্টেই রক্ত ক্রীনিং করে সরবরাহ করছে।

[পার্থ সরকার, সভাপতি, বাঁধন।]

অরকা'র লক্ষ্য বিশুদ্ধ রক্ত নিশ্চিত করা এডভোকেট ইফতেখার আহমেদ



বিশুদ্ধ রক্ত নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'অরকা'। প্রতিষ্ঠার সময় থেকে এ পর্যন্ত ১৩০টির বেশি অনুষ্ঠান করে আমরা প্রায় ৮০০০ ব্যাগ রক্ত পেয়েছি। ব্লাড ব্যাংক না

থাকায় আমরা মোটিভেশন করে অনুষ্ঠান আয়োজন করি— যেখান থেকে সন্ধানী বা রেড ক্রিসেন্ট রক্ত সংগ্রহ করে। আমরা প্রতিটি ডোনারকে বছরে অন্তত দুবার রক্ত দিতে উদ্বুদ্ধ করছি। প্রচারমাধ্যমগুলোরও এ কাজে পৃষ্ঠপোষকতা করা উচিত। তবে শুধু সরকারের আশায় বসে না থেকে আমাদের উচিত নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করা।

[বিশিষ্ট আইনজীবী এডভোকেট ইফতেখার আহমেদ সদস্য সচিব, অরকা ব্লাড ফর লাইফ। নিজে এ পর্যন্ত ৫৯ বার রক্ত দিয়েছেন।]

বিস্ময়কর অগ্রগতি

লায়ন মোহাম্মদ আবদুল হাই



পেশাদার রক্তদাতাদের হাত থেকে মানুষকে বাঁচাতে হলে স্বৈচ্ছা রক্ত দাতাদের সংখ্যা বাড়তে হবে। সে প্রেক্ষিতে মোটিভেশন জোরদার করতে হবে। পারিবারিকভাবে এই পদক্ষেপ নিতে হবে যে

পরিবারের অন্তত একজন সক্ষম সদস্য নিয়মিত রক্তদান করবেন। স্বল্প সময়ে সহস্র রক্তদাতা পুল সৃষ্টির মাধ্যমে স্বৈচ্ছা রক্তদাতাদের সংগঠিত করার কাজে কোয়ান্টাম যেভাবে এগিয়েছে তা সত্যিই বিস্ময়কর।

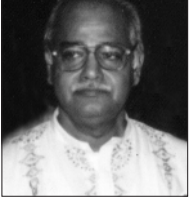
[লায়ন মোহাম্মদ আবদুল হাই, সভাপতি, লায়ন্স বাংলাদেশ ব্লাড ব্যাংক।]

সাক্ষাৎকার গ্রহণে : সুমন ধর ও শম্পা রায়

নিরাপদ রক্ত ব্যবহারকারীদের অনুভূতি

গ্রামেও ছড়িয়ে দিতে হবে স্বেচ্ছা
রক্তদানের ধারণা

সৈয়দ দিদার বখ্ত



১৯৮৯ সালে থ্যালাসেমিয়া রোগীদের অভিভাবকদের নিয়ে গঠিত হয় থ্যালাসেমিয়া সমিতি। প্রথমে শুধু মোটিভেশনের কাজ চালালেও পরে বিদেশি সাহায্যে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে রক্ত সংগ্রহ ও

সরবরাহ শুরু করি সম্পূর্ণ অলাভজনক ভিত্তিতে।

কিন্তু আমাদের এখানে রক্তের চাহিদা এত বেশি যে, আমাদের নিজস্ব সংগ্রহে তা পূরণ করা সম্ভব নয়। তাই আমরা কোয়ান্টাম, সন্ধানী বা রেড ক্রিসেন্টের উপর নির্ভরশীল।

থ্যালাসেমিয়া এমন একটি রোগ যার একমাত্র চিকিৎসাই হলো নিয়মিত রক্ত নেয়া। বাংলাদেশে ৯ লক্ষ ব্যাগের চাহিদার বিপরীতে যেখানে মাত্র ৩/৪ লক্ষ ব্যাগ সংগৃহীত হয়, তার ৬০/৭০ ভাগই প্রয়োজন হয় থ্যালাসেমিয়াকদের।

আমাদের সমিতিতে ১৫০০ জন তালিকাভুক্ত রোগী আছে। তাদের জন্যে গড়ে প্রতিদিন ২৫ ব্যাগ রক্ত দরকার হয়। এমনকি একদিনে ৪০/৪৫ ব্যাগও লাগে। একেকটা বেডে তখন দু'জনকে রাখতে হয়। সেটাও মেনে নেয়া যায়, কিন্তু রক্ত পাওয়া না গেলে যে ভয়াবহ অবস্থা হয়, তা বলে বোঝানো মুশকিল। হয়তো ৫/৭ দিন চলতে পারে, কিন্তু তারপর রোগীর অবস্থার ক্রমাবনতি ঠেকানো মুশকিল।

তাই এ অবস্থায় নিরাপদ রক্তের একমাত্র উৎস স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের সংখ্যা বাড়ানো ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এক্ষেত্রে কোয়ান্টাম যেভাবে মোটিভেশনাল প্রোগ্রাম চালাচ্ছে তা খুবই সম্ভাষণজনক। আসলে শুধু শহরে সীমাবদ্ধ না রেখে অল্প দূরত্বের গ্রামগুলোতেও যদি প্রচারণা চালানো যায় তাহলে সেখানেও ব্লাড ক্যাম্প আয়োজন করে রক্ত সংগ্রহ করা সম্ভব।

[সাবেক মন্ত্রী সৈয়দ দিদার বখ্ত, উপদেষ্টা, থ্যালাসেমিয়া সমিতি। দীর্ঘদিন সাংবাদিকতায় নিয়োজিত ছিলেন, বর্তমানে সমাজ সেবার সঙ্গে যুক্ত।]

কোয়ান্টামের রক্তকে প্রাধান্য দিই

ডা. মো. জামাল উদ্দিন



কোয়ান্টামের রক্তের গুণগত মান রক্ষা করা হয় অত্যন্ত সচেতনভাবে। তাই আমাদের হাসপাতালে এনিমিয়া বা কিডনী ফেইলিওর রোগীদের রক্তের জন্যে আমরা সবসময় কোয়ান্টামের

রক্তকে প্রাধান্য দিই এবং এ পর্যন্ত রক্তের গুণগত মানের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ আমরা পাই নি। তাছাড়া এখানে রক্তের ক্রীনিং চার্জও অনেক কম যা এতগুলো রোগের পরীক্ষার তুলনায় অবিস্বাস্য।

[ডা. মো. জামাল উদ্দিন, পরিচালক, দি কিডনী হাসপিটাল এন্ড ডায়ালিসিস সেন্টার।]

চিকিৎসা সেবার সাথে জড়িত ব্যক্তির
নিরাপদ ও সুস্থ রক্তের নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান হিসেবে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা
রক্তদান কার্যক্রমের ওপর আস্থাশীল।
তাদেরই কয়েকজনের অনুভূতি—

ডোনারপুল তৈরির সাফল্য

ডা. সিরাজুল ইসলাম

স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের সংগঠিত করে কোয়ান্টাম যে ডোনারপুল গঠন করেছে তা আমার জানামতে দেশে প্রথম। এতে রক্তের চাহিদা আরও বেশি পরিমাণে পূরণ হবে বলে আশা করছি।

[ডা. সিরাজুল ইসলাম, চিফ সায়েন্টিফিক অফিসার, বারডেম।]

সাশ্রয়ী মূল্যে নিরাপদ রক্ত

ডা. আবদুস সালাম



আমার পেশাগত জীবনের একটি ঘটনা— একবার এক বাবার রক্তের প্রয়োজন হলে তার ছেলের একজন রক্ত দিতে চাইলেন। কিন্তু বড় ছেলে আপত্তি তুললেন এই বলে যে, বাবা তোকে

খাইয়ে পরিয়ে বড় করেছেন রক্ত দেয়ার জন্যে নয়। অর্থাৎ আপন জনের জন্যে রক্ত দেয়ার ব্যাপারেও সাধারণের মনে কত ভুল ধারণা রয়ে গেছে। এক্ষেত্রে কোয়ান্টামের মতো স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন-গুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। শুধুমাত্র সার্ভিস চার্জ ধার্য করে সাশ্রয়ী মূল্যে ক্রীনিং সহ রক্ত সরবরাহ করার যে উদাহরণ কোয়ান্টাম স্থাপন করেছে তা-ও ব্যতিক্রমী।

[ক্যান্সার হোম-এর পরিচালক ডা. আবদুস সালাম প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, ক্যান্সার ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন।]

প্লাটিলেটের অভাব মিটবে

ডা. শফিউল আলম

আমাদের এখান থেকে মূলত লিউকেমিয়া ও ক্যান্সার রোগীরা রক্ত সংগ্রহের জন্যে কোয়ান্টাম ল্যাবে যায়। এখানকার রক্তের গুণগত মানের ব্যাপারে আমরা খুবই সন্তুষ্ট। আর এখন সেল সেপারেটর মেশিন সংগ্রহের ফলে ক্যান্সার ও ডেঙ্গু রোগীদের জন্যে প্লাটিলেটের অভাবও কিছুটা দূর হবে।

[ডা. শফিউল আলম ধানমন্ডি হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার।]

নির্ভুল ক্রীনিং

রবিউল আলম রনি

কোয়ান্টামের সরবরাহকৃত রক্ত আমরা পুনরায় পরীক্ষা করি। এখন পর্যন্ত রক্তের গুণগত মান নিয়ে আমাদের কোন সংশয় নেই। অর্থাৎ কোয়ান্টাম রক্তের যে পাঁচটি ক্রীনিং করে তার রিপোর্ট আসলেই সঠিক।

[রবিউল আলম রনি মেট্রোপলিটন মেডিকেল সেন্টারের মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট।]

সুসংগঠিত কার্যক্রম

ডা. আসাদুল ইসলাম



সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি স্বেচ্ছা রক্তদান সংস্থাগুলো যেভাবে এগিয়ে এসেছে তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কোয়ান্টাম রক্ত কার্যক্রম। আমার জানামতে এটি অত্যন্ত সুশৃঙ্খল এবং সুসংগঠিত-

ভাবে কাজ করে থাকে, যাদের রয়েছে নিজস্ব ডোনার পুল। সম্প্রতি তাদের ল্যাবে সংযোজিত কম্পোনেন্ট সেপারেটর মেশিনটি সহ দেশে এখন এরকম ১৯টি মেশিন রয়েছে। ফলে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের দেশের রক্তের চাহিদা পূরণ করে দেশের বাইরেও পাঠাতে পারবো বলে আশা করি।

[ডা. আসাদুল ইসলাম, কনসালট্যান্ট, ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগ, BSMMU।]

সেবার মনোভাবের প্রমাণ

ডা. মিরাজুল ইসলাম

নেগেটিভ গ্রুপের রক্ত কিছুটা দুঃপ্রাপ্য হওয়ায় দাম বেশি হলেও মুমূর্ষু রোগীর জন্যে তার আত্মীয়রা বাধ্য হন সে রক্ত সংগ্রহ করতে। কিন্তু কোয়ান্টাম নেগেটিভ গ্রুপের রক্তও একই দামে সরবরাহ করে সেবামূলক মনোভাবেরই প্রমাণ রাখছে।

[ডা. মিরাজুল ইসলাম মেডিকেল অফিসার, দি বারাকাহ কিডনী হাসপাতাল।]

সুস্থ রক্তের নির্ভরতা

ডা. আলতাফ মাহমুদ

কোয়ান্টাম দিচ্ছে শতকরা একশ ভাগ স্বেচ্ছা রক্তের নিশ্চয়তা। এটা আমাদের পেশার লোকদের জন্যে একটা বিরাট নির্ভরতা। কারণ সুস্থ করার বদলে রক্ত দিয়ে রোগীকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেয়া অবশ্যই কোনো ডাক্তারের কাম্য নয়। আর সম্প্রতি রক্তের কম্পোনেন্ট সেপারেটর সংগ্রহের মাধ্যমে কোয়ান্টাম তাদের সেবা কার্যক্রমকে আরও বাড়িয়েছে, এটা অবশ্যই আমাদের জন্যে আনন্দের।

[ডা. আলতাফ মাহমুদ রেনাল হোপ মেডিকেল সেন্টারের সিনিয়র মেডিকেল অফিসার।]

সুশৃঙ্খল এবং আন্তরিক সেবা

ডা. এম. এ. হাশেম



কোয়ান্টাম ল্যাবের শুরু থেকেই আমরা রক্তের জন্য তাদের কাছে রোগীর আত্মীয়কে পাঠাই। কারণ দু'টি— তারা পুরনো রক্ত ব্যবহার করে না আর তাদের আন্তরিক ব্যবহার। নিয়মিত ক্যাম্প হবার

কারণে তাদের রক্ত সংগ্রহও ভালো। আর ক্রীনিং-এর জন্য যে চার্জ তারা নেয় সেটাও যুক্তিসঙ্গত। ফলে, রক্তগ্রহীতা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। মূলত এসব কারণেই আমরা কোয়ান্টামে রোগীর আত্মীয়-বন্ধুকে পাঠাই রক্তের জন্যে।

[ডা. এম.এ. হাশেম, ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতাল এবং কনসালটেন্ট, গ্রীন ভিউ ক্লিনিক।]

সাক্ষাৎকার গ্রহণে : ফেরদৌসী সুলতানা, নাজমুন্নাহার, সাইফুদ্দিন হাওলাদার ও মীর নাহিদ মাহমুদ।

৬ জুলাই, ২০০৩ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে আয়োজিত সহস্র আজীবন স্বেচ্ছা রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন সহস্রাধিক মানুষ। সকলের জন্যে উন্মুক্ত এই অনুষ্ঠানে ঢাকাসহ সারা দেশের রক্তদাতারা ছাড়াও ছিলেন চিকিৎসা সেবার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিগণ, রক্তদান সংশ্লিষ্ট স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মিবৃন্দ। এমনকি রক্তদাতা নন এমন অনেক কিশোর-প্রবীণও ছিলেন। বিকেল চারটায় প্রোগ্রাম গুরুত্ব কথা থাকলেও তিনটা থেকেই অতিথিরা আসতে শুরু করেন। শৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থাপনার কারণে নির্ধারিত প্রোগ্রাম প্রায় সময়মতোই শেষ হয়েছে। অনুষ্ঠানে আগতদের সাথে কথা বলে জানা গেলো তাদের অনুভূতি সম্পর্কে।

নারায়ণগঞ্জ থেকে এসেছিলেন একজন রক্তদাতা, পেশায় যিনি ধোপা। তিনি বলছিলেন, এ অনুষ্ঠানে আসার জন্যে ক’দিন ধরেই তিনি প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সকালের মধ্যেই সব কাজ গুছিয়ে দুপুর একটায় রওনা হয়েছেন ঢাকার পথে। সম্মাননা স্মারক হিসেবে সামান্য একটি ক্রেস্টও তার কাছে অনেক মূল্যবান। কারণ, তিনি বলেন, আমার জীবনে আমি কারও কাছ থেকে এরকম সম্মান পাই নি।

রিনা আক্তার এসেছিলেন তার স্বামীকে সাথে নিয়ে। তারা দু’জনই আজীবন রক্তদাতা হিসেবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তার ভাষায় এরকম একটি অনুষ্ঠানে আসতে পেরে নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান মনে হচ্ছে।

আরেকজন রক্তদাতা আসিফ রহমান অনুষ্ঠান সম্পর্কে বললেন, আসলে এটি ছিলো একটি ভিন্ন মাত্রার অনুষ্ঠান, তাই এর আবেদনটাও ছিল ভিন্ন। আমার জানামতে, এত আন্তরিকতার সাথে কেউ কোনদিন রক্তদাতাদের সম্মান দেখায় নি। এটি আমার জন্য এক বিরল সম্মান।

প্রায় একই ভাষায় বললেন রোকেয়া আরশাদা, এটি একটি মহৎ প্রোগ্রাম। দুঃস্থ ও অসহায় মানবতার সেবায় যারা রক্ত দিয়ে জীবন বাঁচান তাদেরকে সম্মানিত করার এই প্রচেষ্টা সত্যিই প্রশংসনীয়।

অনুষ্ঠানে আগত স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের মধ্যে কেউ কেউ ১৮ বছর বয়স হবার সাথে সাথেই নিয়মিত রক্ত দিচ্ছেন। তাদেরই একজন

সুরাইয়া আক্তার মোনালিসা। তিনি এ যাবৎ চার বার রক্ত দিয়েছেন। সেদিনের অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এ রকম একটি অনুষ্ঠান মানুষকে রক্ত দানের ব্যাপারে আরো বেশি উদ্বুদ্ধ করবে। রক্তদান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এটা আমার নৈতিক দায়িত্ব, কোন প্রতিদানের জন্যে নয় বরং আত্মিক প্রশান্তি ও শ্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্য রক্ত দিচ্ছি।

মেয়েদের মধ্যে সর্বাধিক ৮ বার রক্ত দিয়েছেন আসমা বেগম। তার ভাষায়– সেদিনের অনুষ্ঠানটি ছিলো অসাধারণ।

আজীবন স্বেচ্ছা রক্তদাতা জিন্নাতুন নাহার বিউটি সে দিনের অনুষ্ঠান সম্পর্কে বলেন, ৬ জুলাই আমার কাছে ঈদের মতো আনন্দদায়ক মনে হয়েছে। কেন না আমরা তিন বোনের সবাই আজীবন রক্তদাতা এবং তিনজনই একসাথে স্টেজে উঠে ক্রেস্ট নিয়েছি। জিন্নাতুন নাহার এ পর্যন্ত ৬ বার রক্ত দিয়েছেন এবং কোনবারই তিনি সামান্যতম অস্বস্তিও বোধ করেন নি।

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির প্রথম বর্ষের ছাত্র গোলাম রাব্বানী রিপনের ভাষায়, সেদিনের প্রতিটি বক্তার বক্তব্যের মাধ্যমে আমি অনেক কিছু শিখতে পেরেছি। এতদিন আমরা জেনেছি আমাদের বিশাল সংখ্যক আজীবন স্বেচ্ছা রক্তদাতা রয়েছে। কিন্তু এ দিনই প্রথম বিশাল সংখ্যক রক্তদাতা দেখতে পেলাম এবং তখন মনে হচ্ছিল আমরা আজ আর একা নই। রিপন এ পর্যন্ত ৬ বার রক্ত দিয়েছেন।

সাত বার রক্তদাতা মারুফা আক্তার লিপি বলেন, আমি প্রথম রক্ত দিই সোহরাওয়ার্দি হাসপাতালে, রোগীকে না দেখেই। ১৯৯৯ সালের মাঝামাঝি কোয়ান্টাম মোবাইল ডোনার পুলের মাধ্যমে ক্যান্সারের এক রোগীকে রক্ত দিই। রোগী একজন মহিলা এবং পরবর্তীতে তিনি অত্যন্ত খুশি হয়ে এমনভাবে দোয়া করেছিলেন যে, আমার রক্তদানের আত্মহ বেড়ে যায়। এরপর আমি তো রক্ত দিয়েছিই, দেশের বাইরে থাকা আমার মেজ ভাই এবং সেজ ভাইকেও উদ্বুদ্ধ করেছি। দেশে এলেই তারা কোয়ান্টাম ল্যাবে রক্ত দেন।

ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন শাখার পরিচালকগণ জানিয়েছেন সম্মাননা অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রভাব সম্পর্কে। মগবাজার শাখার পরিচালক সি.এম কামরুন্মুনীরের মতে এ অনুষ্ঠান মূলত ৩ বছরের কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের সফলতারই প্রমাণ। কারণ এত অল্প সময়ের মধ্যে এ ধরণের ব্যাপক আয়োজন করতে পারাটা যেকোনো সংগঠনের সাংগঠনিক দক্ষতার এক গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা।

দেশের প্রথম সহস্র আজীবন স্বেচ্ছা রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে



সহস্র আজীবন স্বেচ্ছা রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট (বাম থেকে) অনারারী ল্যাব ডিরেক্টর ডা. এবিএম ইউনুস, বিশেষ অতিথি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, প্রধান অতিথি জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম, সভাপতি শহীদ আল বোখারী মহাজাতক, বিশেষ অতিথি প্রফেসর ডা. মুজিবুর রহমান, প্রধান সমন্বয়ক নাহার আল বোখারী, পরিচালক মোটিভেশন শিল্পপতি কাজী মাহতাব উদ্দীন আহমদ-এর সঙ্গে ফাউন্ডেশনের স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের কোয়ান্টিয়ার ও প্রো-কোয়ান্টিয়ারবৃন্দ।

মতিঝিল শাখার পরিচালক অধ্যাপিকা খাদিজা মাহতাবের অভিজ্ঞতা খুবই ইতিবাচক। কারণ তার এলাকার যে স্পোর্টিং ক্লাবে নিয়মিত ব্লাড ক্যাম্প হতো সেখানকার উদ্যোক্তারা ভীষণ উদ্বুদ্ধ হয়েছে এ অনুষ্ঠানে এসে। তার মতে এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিশ্রুতি পূর্ববের ব্যাপারে আন্তরিকতার যে ইমেজ কোয়ান্টামের রয়েছে তা আরও ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরকম অভিজ্ঞতাই সবুজবাগ শাখার পরিচালক মাসুদা আক্তার আবেদীনের। কারণ এ অনুষ্ঠানের পরপরই তার এলাকার একটি সংগঠনে ব্লাড ক্যাম্প আয়োজনের অনুমতি তিনি পেয়েছেন খুব সহজেই, যেখানে আগে তা পেতে যথেষ্ট আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হতো।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি সায়ীদ স্যারের বক্তব্যে ‘দেওতা’ শব্দটি অর্থাৎ যিনি দেন– সবাইকে খুব নাড়া দিয়েছিলো। অনেকেই সেদিন এই সত্যটি উপলব্ধি করলেন যে, সত্যিকারের আনন্দ পাওয়ায় নয়, দেয়ার মধ্য দিয়েই আসতে পারে। নিজেকে উজাড় করে বিলিয়ে দেবার স্বপ্ন ছিলো সবার চোখে মুখে।

অনুষ্ঠানে যারা সম্মানিত অতিথি হিসেবে মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন, অনুষ্ঠান শেষে তাঁরাও জানিয়েছেন তাদের অনুভূতির কথা। মাননীয় বিশেষ অতিথি দেশের প্রবীণতম রক্ত পরিসঞ্চলনবিদ প্রফেসর ডা. মুজিবুর রহমান বলেন, আমার জীবনের শেষ ইচ্ছা একটাই যে, বাংলাদেশে যে রোগীরই রক্তের দরকার হোক না কেন, তাদের প্রত্যেককেই যেন স্বেচ্ছা

রক্তদাতাদের রক্ত নেয়। আর স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের সংগঠিত করার যে কাজ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন করছে তার উত্তরোত্তর প্রসার ঘটুক, এটাই আমার প্রার্থনা। আমার এ বয়সেও যদি পরামর্শ দিয়ে আপনাদের কোনো সহযোগিতা করার সুযোগ পাই, তবে নিজের তারুণ্যকেই অনুভব করবো।

বিশেষ অতিথি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেন, এত মানুষের প্রাণবন্ত এ সম্মেলন দেখে, যারা ভালোবেসে, অন্যের দুঃখের জন্যে স্বেচ্ছায় রক্ত দিয়েছে, আমার আশা জাগছে মনে। যে বড় বাংলাদেশ গড়তে হবে আমাদেরকে তার সূচনা দেখতে পাচ্ছি এখানে।

প্রধান অতিথি, জাতীয় অধ্যাপক নুরুল ইসলাম বলেন, ভিক্ষে করে অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার যে কোনো প্রয়োজন আমাদের নেই, আমাদের রত্নভাণ্ডার দিয়ে আমরা নিজেরাই যে সমৃদ্ধ হতে পারি সে কথাই আবারও প্রমাণিত হলো এখানে।

সবশেষে এ অনুষ্ঠানকে সুশৃঙ্খল আয়োজনের জন্যে নেপথ্যে যিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন সেই পরিচালক সমন্বয় মিসেস সুরাইয়া রহমানের মন্তব্য দিয়েই শেষ করছি। তিনি বলেন, পাবলিক প্রোগ্রাম হওয়ায় অন্যান্য ঘরোয়া প্রোগ্রামের চেয়ে বিভিন্ন বিষয়ে কিছুটা বিশেষ নজর রাখতে হয়েছিলো, কিন্তু অনুষ্ঠান আশাতীতভাবে সুশৃঙ্খল হয়েছে যা সকলের আন্তরিক দায়িত্বপালনের ফলেই সম্ভব হয়েছে।

প্রতিবেদক : ফেরদৌসী সুলতানা

১১ বার রক্ত দিয়েছেন অনির্বাণ হক



কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমে কমপক্ষে তিনবার রক্তদান করেছেন এমন সহস্রাধিক লাইফলং ডোনারের পাশাপাশি এমনও রক্তদাতা আছেন যারা তিনবারেরও বেশি রক্ত দিয়েছেন। তেমনি একজন অনির্বাণ হক, যিনি ১১ বার রক্ত দিয়েছেন। তিনি তার অনুভূতি জানালেন এভাবে, রক্তদানে আমার মূল অনুপ্রেরণা শ্রদ্ধেয় গুরুজী। রক্তদান অর্থ মানুষের জীবন বাঁচানো। এক্ষেত্রে কতবার রক্ত দিলাম সেই সংখ্যা নয়, রক্তদানের মানসিক ভৃত্তিই মূল বিবেচ্য বিষয়।

কেন নিয়মিত রক্তদান করছি শিমুল মাহমুদ

২০০০ সালের আগে কখনো রক্ত দেই নি। সে বছর এক ওয়ার্কশপে গুরুজীর বক্তব্য শুনে এতটাই অভিভূত হয়েছি যে, পরদিন ল্যাবে গিয়ে প্রথম রক্ত দিলাম। রক্ত দেয়ার পর ড্রিংকস খাচ্ছি, এমন সময় একজন বললেন, আপনার ব্লাডটা এখনি চলে যাচ্ছে; রোগীর

আত্মীয় বসে আছে। শুনে ভালো লাগায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় মন। সেই থেকে নির্দিষ্ট সময় পর পর নিয়মিত রক্ত দিচ্ছি। সাড়ে ৩ বছরে ১০ বার।

দুঃসময়ের জন্য

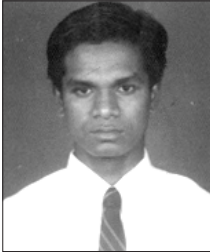
আমি রক্ত সঞ্চয় করি। এটা অনেক মুমূর্ষু মানুষের জীবন রক্ষা করছে। তাই, আমি বিশ্বাস করি, এ জনেই আমার নিজের কখনো রক্তের প্রয়োজন হবে না।

আমরা যদি নিয়মিত রক্ত দেই, তাহলে লোহিত কণিকার প্রাণবন্ততা বেড়ে যায়। দুরারোগ্য অনেক রোগ থেকে আমরা মুক্ত থাকতে পারি। সবচেয়ে বড় কথা, প্রতি বার রক্ত দিয়েই আমি জেনে যাচ্ছি আমার দেহে রক্ত ঘটিত কোনো রোগ আছে কিনা। প্রায় দু’আড়াই হাজার টাকা মূল্যের ৫টি রোগের টেস্ট রিপোর্ট পেয়ে যাচ্ছি বিনামূল্যে। আমার জ্বীনিং রিপোর্ট দেখে দু’বন্ধু এখন নিয়মিত রক্ত দিচ্ছে। আমার দেয়া রক্ত মুমূর্ষু মানুষের জীবন রক্ষার কাজে লাগছে, এটা খুবই পরিতৃপ্তির বিষয়। নিয়মিত রক্ত দেয়ার জন্যে এসবই কি যথেষ্ট নয় ?

[আজীবন রক্তদাতা সদস্য শিমুল মাহমুদ পেশায় একজন সাংবাদিক।]

রক্ত কার্যক্রমে অংশ নিলেই মনে প্রশান্তি চলে আসে

শওকত আহমেদ



হলো, কখনো যদি নিজেকে মানসিকভাবে

কিছুটা অশান্ত মনে

হয় তখন রক্ত

দিলে বা রক্ত

কার্যক্রমের কোনো

স্বেচ্ছা সেবায়

অংশ নিলে

কিছুক্ষণের মধ্যেই

অশান্তি ভাব কেটে

গিয়ে মনে চলে

আসে একটা

প্রশান্তি এবং তার

রেশ থাকে বেশ

কিছুদিন।

[মাস্টার্সের ছাত্র

শওকত আহমেদ

একজন ব্লাড

কোয়ান্টিয়ার।]

জীবন বাঁচাতে রক্তদান

শেখ মো. ফয়সল

আমি জীবনে প্রথম

রক্ত দিই ১৯৯৫

সালে। ১৯৯৮

সালের মাঝামাঝি

কোয়ান্টাম

ফাউন্ডেশন স্বেচ্ছা

রক্তদান কার্যক্রমের

‘মোবাইল ডোনার

পুল’ গঠিত হয়

যেখানে আমি

পাঁচবার রক্ত দিই এবং এখানেই রক্ত দেয়ার

প্রতি আমার আত্মহ বাড়ে। সেসময় তানভীর

নামে থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত একটি ছোট্ট

শিশুকে রক্ত দেবার জন্য প্রিন্স ভাই আমাকে

ডাকেন। কোনো এক ঈদের আগের ঘটনা

এটি। গ্রীন ভিউ ক্লিনিকে গিয়ে আমি দেখলাম

এক করুণ দৃশ্য। সামনে ঈদ, বাচ্চাকে নতুন

জামা কিনে দেয়ার বদলে বাবা-মা করুণ স্বরে

মিনতি করছেন এক ব্যাগ রক্তের জন্যে। রক্ত

দেয়ার পর তানভীরের বাবা-মা রীতিমতো

কাতর ভঙ্গিতে চারমাস পর তার বাচ্চার জন্য

এক ব্যাগ রক্ত চাইলেন। ফুটফুটে তানভীরকে

পরবর্তীতে আরো চারবার রক্ত দিয়েছি।

কোয়ান্টাম ল্যাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যখন

ল্যাবে স্বেচ্ছা সেবক হিসেবে যোগ দিই,

তখনকার অভিজ্ঞতা আরো কষ্টের। এমনও

হয়েছে একই পরিবারের দু-তিনটি শিশু

থ্যালসেমিয়ায় আক্রান্ত। মায়ের সাথে বড় বাচ্চা

যখন রক্ত পরীক্ষা করাচ্ছে, সঙ্গে অবোধ শিশুটি

ল্যাবের মেঝেতে হামাগুড়ি দিচ্ছে। আমরা

সবাই জানছি, রক্ত না পেলে এ সুন্দর নিষ্পাপ

শিশুটি মরে যাবে অকালে। তখন আমার শুধু

মনে হতো– এ নিষ্পাপ মুখগুলো তো আমাদের

দিকেই তাকিয়ে।

মূলত অবুঝ সেই ফুটফুটে চেহারাগুলোই

আমার ১০ বার রক্তদানের অনুপ্রেরণা। আমরা

সবাই মিলে কি পারব না, মানুষের মানবিকতা

দিয়ে ঐ নিষ্পাপ ফুলগুলোকে বাঁচাতে?

[শেখ মো. ফয়সাল একজন আজীবন স্বেচ্ছা

রক্তদাতা।]



হাস্যোজ্জ্বল এক তরুণী রক্তদাতা ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন সভাপতির কাছ থেকে।

কোয়ান্টাম বুলেটিন - ৪

কোয়ান্টাম বুলেটিন - ৫



চট্টগ্রাম থেকে আগত একজন রক্তদাতার হাতে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন বিশেষ অতিথি।

রক্ত কার্যক্রমে নিবেদিত স্বেচ্ছাসেবীদের কথা

সেবা করতে পারাটাই আনন্দ

জহিরুল ইসলাম প্রিন্স



কারও রক্তের প্রয়োজনের কথা শুনলেই আমার মনে পড়ে প্রায় ৩/৪ বছর আগের একটি ঘটনা। তখন ব্লাড ক্যাম্পে আক্রান্ত এক কিশোরের জন্যে ১৭/১৮ ব্যাগ রক্ত সংগ্রহ করে দিয়েছিলাম আমরা। ছেলেটির

মা এবং কাঠমিল্লী বাবা প্রতিবার রক্ত পাওয়ার পর এমনভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন যে আমরা বিব্রত বোধ করতাম। পরে অবশ্য ছেলেটি মারা যায়। কিন্তু এখনও মাঝে মাঝে সেই বাবা দেখা করতে আসেন।

আরেকবার এক বয়স্ক অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তার ওপেন হার্ট সার্জারির জন্যে এ-নেগেটিভ রক্ত লাগবে। তার আত্মীয়রা মরিয়া হয়ে ছুটে এলেন আমাদের কাছে রাত ১১ টায়। বললেন, যেকোনো ভাবেই হোক, আজ রাতের মধ্যেই ৪ ব্যাগ রক্ত যোগাড় করতে হবে। একেতো দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের ৪ ব্যাগ রক্ত, তার উপর মধ্য রাত পার হয়েছে। পরম করুণাময়ের অনুগ্রহে রাত তিনটের মধ্যেই চার জন ডোনার ডেকে এনে রক্তের ব্যবস্থাও করে ফেললাম। সফল অপারেশনের পর সেই ভদ্রলোক সেরে উঠলেন এবং এখনও সুস্থ আছেন। আন্তরিক সেবার এই ইমেজের কারণে পরবর্তীতে ঐ পরিবারের রেফারেন্সে বহুজন এসেছেন। আসলে মানুষের সেবা করতে পারাটাই আনন্দের।

[জহিরুল ইসলাম প্রিন্স কো-অর্ডিনেটর মোটিভেশন। তিনি একজন ব্যবসায়ী]

রক্ত না দেয়াটা অপরাধ

মো. মুসা



স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের সাথে জড়িত আছি ২০০১ সাল থেকে এবং এ পর্যন্ত প্রায় দেড়শত ক্যাম্পে কাজ করেছি। ল্যাভে যখন কাজ করছি তখন এক একজন থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুর দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছে কোনো সুস্থ সবল মানুষের জন্য রক্ত না দেয়াটা একটা অপরাধ। মানুষের মঙ্গলের কাজে আমার সামান্য একটু সময় আর শ্রম দানে যখন মানুষ সেবা পাচ্ছে তখন কেন আমি কোয়ান্টাম ল্যাভে কাজ করবো না?

[ক্যাম্প মোটিভিয়ার মো. মুসা রাবার বাগান মালিক]

স্বর্গীয় অনুভূতি

প্রাণজিৎ লাল শীল



যদিও স্বর্গে কখনো যাইনি তবে মনে হয় স্বর্গীয় অনুভূতি বলে যে কথাটি প্রচলিত সে অনুভূতিটা সম্ভবত এরকমই যা আমার মাঝে এসেছে। এটা আসলে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আর আমার মনে হয় হক্কুল ইবাদের সরাসরি সুযোগ আর তৃপ্তি দুটোই এখান থেকে পাওয়া যায়। ল্যাভে যখন থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুরা আসে, তখন ওদের সাথে কথা বলতে, মিশতে খুব ভালো লাগে।

[ব্লাড কোয়ান্টিয়ার প্রাণজিৎ লাল শীল একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার]

ব্লাড ক্যাম্প আয়োজনে সবারই

সহযোগিতা পাচ্ছি

অধ্যাপিকা খাদিজা মাহতাব



কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের জনসংযোগের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের আস্থা ও সহযোগিতার প্রমাণ পেয়েছি প্রচুর। বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে বেশ সাড়া পেয়েছি।

এখন আমাদের লক্ষ্য হলো ঢাকার কমপক্ষে ৪০টি প্রতিষ্ঠানে নিয়মিতভাবে বছরে দুটো করে ব্লাড ক্যাম্প আয়োজন করা। কারণ এতে করে সংগঠিত উপায়ে নিয়মিতভাবে রক্ত প্রাপ্তি নিশ্চিত করা যাবে। এ জন্যে প্রয়োজনীয় জনসংযোগ এবং অন্যান্য পদক্ষেপ ইতোমধ্যেই গ্রহণ করা হয়েছে।

[অধ্যাপিকা খাদিজা মাহতাব কো-অর্ডিনেটর, জনসংযোগ]

মুমূর্ষের প্রতি সহমর্মিতার আনন্দ

জহিরুল ইসলাম



কোয়ান্টাম ল্যাভ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অল্প কিছুদিন পর থেকেই আমি এর সাথে যুক্ত আছি। মনে পড়ে আট-নয় মাস আগে নোয়াখালী থেকে এক রোগীর আত্মীয় এসেছিলেন কোয়ান্টাম ল্যাভে বি-পজেটিভ রক্তের জন্য। ঢাকায় তার চেনা কেউ নেই। অনেক খোঁজার পর যখন এক ব্যাগ বি-পজেটিভ রক্ত ঐ লোককে দেয়া হলো তখন তার সেই আনন্দের অভিব্যক্তি ছিলো মনে রাখার মতো। আরেকবার এক বাবা-মা হারা মেধাবী ছেলে ইলেকট্রিক শকে দারুণ আহত হলো। শরীরের এক জায়গার চামড়া অন্য জায়গায় লাগাতে হচ্ছে। প্রচুর রক্ত লেগেছিলো তার।

এরকম অসংখ্য আত্ম প্রাণ বেঁচে উঠবে এই রক্তদান কার্যক্রমের মাধ্যমে যাতে আমারও অংশগ্রহণ আছে, এটা আমার জন্যে মানসিক প্রশান্তির এক অপূর্ব উৎস।

[জহিরুল ইসলাম কো-অর্ডিনেটর, ফাইন্যান্স। একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী]

সৃষ্টির সেবার আনন্দে

সাইফুর রহমান জুয়েল



একান্তরের মুক্তিযুদ্ধের একজন বীর সৈনিককে রক্তদান করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলাম। রক্ত দেবার পর তিনি বলেছিলেন সেই একান্তরের পর এই প্রথমবারের মতো মনে হচ্ছে মানুষের জন্য সত্যি সত্যি কিছু করলাম। এই ঘটনার মত আরও একটা জিনিস আমাকে কাজ করতে অনুপ্রেরণা যোগায়। তা হলো একজন নতুন রক্তদাতা প্রথমবার রক্তদান করার পরেই যখন বোঝেন যে রক্ত দান করে তার কোন ক্ষতি হচ্ছে না, তখন তিনি নিজেই তার পরিচিত পরিমণ্ডলের মানুষকে রক্তদান করতে উৎসাহিত করেন।

[ব্লাড কোয়ান্টিয়ার সাইফুর রহমান জুয়েল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ব্যবস্থাপনায় অধ্যয়নরত]

আন্তরিকতাই আসল শক্তি

সি.এম কামরুন্নাহ মুন্সীর



১৯৯৯ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে যখন কোয়ান্টাম ল্যাভের অবকাঠামো তৈরি হচ্ছে তখন থেকেই এ কাজে জড়িত হবার সুযোগ ঘটেছে। আসবাবপত্র, সাজসজ্জা ইত্যাদির তদারকি করতে

করতে মাঝে মাঝে সন্দ্বিগ্ন হয়ে যেতো। রমজানের সেই মাসে তখন শ্রমিকদের সঙ্গে ইফতার করে নিতাম। তাই দেখে একজন আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন আমি এ কাজের কন্ট্রাস্ট নিয়েছি কিনা।

কোয়ান্টিয়ারদের কাজের আন্তরিকতা দেখে অনেকেই এই প্রশ্ন করেন। আসলে আমার মনে হয়, অন্য যেকোনো সংগঠনের চেয়ে এখানে অনেক বেশি আন্তরিকতা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজগুলো করা হয়।

[কো-অর্ডিনেটর সি.এম কামরুন্নাহ মুন্সীর একজন ব্যবসায়ী]

চমৎকার টিমওয়ার্ক

আবু রেজা অপু



কোয়ান্টাম ল্যাভে আমরা চমৎকার একটা টিম হিসেবে কাজ করি। আমার আনন্দ এই চমৎকার টিমের সাথে কাজ করে। একজন মানুষকে যখন রক্তদানের মতো পুণ্যের কাজে অনুপ্রাণিত করতে পারি সেটা আমাকে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রেরণা যোগায় স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমে কাজ করার পেছনে। আর থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের চোখের আকৃতি আমাকে বাধ্য করে কাজ করতে।

[ব্লাড কোয়ান্টিয়ার আবু রেজা অপু ডিগ্রী পরিক্ষার্থী]

স্রষ্টার কাছে শুকরিয়া

তারিক চৌধুরী



অবসর সময় নষ্ট না করে একটা ভাল কাজে ব্যয় করবো এরকম উদ্দেশ্য নিয়েই ল্যাভে কোয়ান্টিয়ার হিসেবে কাজ শুরু করি। থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত শিশুদের দেখে আমার কাজের আগ্রহ আরও বেড়ে গেছে।

[ব্লাড কোয়ান্টিয়ার তারিক চৌধুরী সিটি কলেজের ডিগ্রী ছাত্র]

এখন অবসরটাও সৎসঙ্গে

মেহেদী আল মাসুদ



মানুষের সেবা করার বাসনায় দু'বছর আগে কাজ শুরু করেছিলাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমে। পড়াশোনার পরে যে সময়টুকু অবসর থাকে তা আগে হয়ত গঠনমূলক কাজে ব্যয় করতাম না। কিন্তু এখন অবসরটাও সৎ সঙ্গে একাত্ম থাকতে পারছি।

মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করে যে এত আনন্দ, এত তৃপ্তি তা আগে এভাবে উপলব্ধি করি নি।

[ব্লাড কোয়ান্টিয়ার মেহেদী আল মাসুদ ডেন্টাল ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র]

অনুলিখন : জহুর আল-সাদাঈন সাবিত

রক্ত সংগ্রহই সব নয় বিশুদ্ধ রক্তই গ্রহণযোগ্য

মেজর জেনারেল এ.এস.এম. মতিউর রহমান

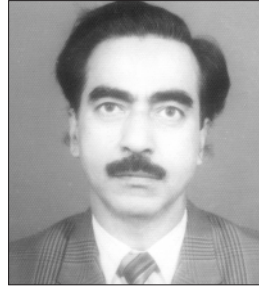
রক্ত কোনো লাল রঙের তরল পদার্থ নয়, রক্ত হলো ১০০ ভাগ আরোগ্য দানকারী গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ। কারণ রক্ত গ্রহীতা এবং রক্ত দাতা দু'জনের জন্যেই এটি গুরুত্বপূর্ণ থেরাপী। যিনি রক্ত গ্রহণ করলেন তার প্রাণ রক্ষা হলো, আর যিনি দান করলেন তার দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে গেল, দেহের প্রতিটি কোষ নতুনভাবে উজ্জীবিত হয়ে আরো বেশি কর্মশক্তি লাভ করলো। এই প্রচারগাটি অর্থাৎ রক্ত দানের মাধ্যমে যে নিজেরই উপকার করা হয়, এটা যত বেশি ছড়াবে তত স্বেচ্ছায় রক্তদাতার সংখ্যা বাড়বে। সেই সাথে ডোনার কেন্দ্রিক কার্যক্রমে বাড়তে হবে তরুণ-তরুণীদের অংশগ্রহণ।

কিন্তু বিপুল সংখ্যায় রক্ত সংগ্রহই সব নয়। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, একমাত্র বিশুদ্ধ ও নিরাপদ রক্তই গ্রহণযোগ্য। এজন্যে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা নির্দেশিত পাঁচটি মৌলিক ক্রীনিং ছাড়া রক্ত কোনোভাবেই রোগীকে দেয়া যাবে না এবং তা-ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা ক্রসম্যাচিং করাবার পর।

বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে যে কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এই সুস্থ ও নিরাপদ রক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে জাতির জন্যে কিছু করছে তার মধ্যে কোয়ান্টাম অন্যতম।

[মেজর জেনারেল ডা. এ.এস.এম. মতিউর রহমান আর্মড ফোর্সেস ইনস্টিটিউট অব প্যাথলজির (AFIP) ডিপার্টমেন্ট অব মাইক্রোবায়োলজি, ভাইরোলজি এন্ড ইমিউনলজির বিভাগীয় প্রধান।]

নিরাপদ রক্তের জন্য করণীয় প্রফেসর ডা. মোশাররফ হোসেইন



সেফ ব্লাড
ট্রান্সফিউশন
প্রোগ্রামের মাধ্যমে
আমরা নিরাপদ ও
সুস্থ রক্ত নিশ্চিত
করতে নানা রকম
পদক্ষেপ নিচ্ছি।
প্রথমত
পেশাদারদের রক্ত
বর্জন করে

সাধারণ মানুষকে স্বেচ্ছায় রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করা। তা নিজের আত্মীয়ের প্রয়োজনে হতে পারে বা হতে পারে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনে রক্ত দেয়ার মাধ্যমে। কারণ গবেষণায় দেখেছি পেশাদার রক্তদাতাদের ২৯% হেপাটাইটিস-বি, ২২% সিরিফিস এবং ৬% হেপাটাইটিস-সি তে আক্রান্ত।

তবে আশার কথা হচ্ছে এসব রক্তের ব্যাপারে এখন মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। ফলে আগে যেখানে ৭০% রক্তের চাহিদা পূরণ হতো পেশাদারদের মাধ্যমে, এখন তা নেমে এসেছে ৪০%-এ। আর এক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো

একটা বড় ভূমিকা পালন করছে। তাছাড়া নিরাপদ রক্তের জন্যে ৫টি মৌলিক ক্রীনিং করাটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং তা হবে রক্ত নেয়ার পরপরই। এতে জরুরি প্রয়োজনে রক্তগ্রহীতা সহজেই সংরক্ষিত রক্ত পেয়ে যাচ্ছে।

তবে একজন রক্তদাতার দেহ থেকে রক্ত সংগ্রহ করতে হবে সবসময়ই একজন ডাক্তার বা টেকনিশিয়ানের উপস্থিতিতে। এটাই নিরাপদ রক্ত সংগঠনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নীতি। আর সবশেষে বলবো কম্পোনেন্ট থেরাপির কথা। অর্থাৎ এক ব্যাগ রক্তকে বিভিন্ন উপাদানে আলাদা করে ৪/৫ জন রোগীর প্রয়োজনে মেটানো- এই থেরাপীই চলছে বিশ্বের সর্বত্র। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরোব্যাগ রক্তের বদলে রোগীর প্রয়োজন হয় ঘাটতির ধরণ অনুযায়ী বিভিন্ন উপাদান। এতে রক্তের যথাযথ ব্যবহারও নিশ্চিত হয়।

কাজেই রক্তের সাথে জড়িত বাংলাদেশের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে মানুষকে রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি এ বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে। আর আমি মনে করি, কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম তা যথাযথভাবেই অনুসরণ করছে।

[প্রফেসর ডা. মোশাররফ হোসেইন কনসালট্যান্ট, সেফ ব্লাড ট্রান্সফিউশন প্রোগ্রাম এবং পিজির ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগের অনারারী অধ্যাপক।]



-৮৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রার ডিপ ফ্রিজ

নিরাপদ রক্তের প্রশ্নে কোয়ান্টাম আপোষহীন

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন, স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম নিজস্ব ল্যাব প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন থেকেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্ধারিত ৫টি মৌলিক ক্রীনিং সম্পন্ন করে রক্ত প্রদানের ব্যাপারে আপোষহীন মনোভাব নিয়ে কাজ করে আসছে। রক্ত হেপাটাইটিস-বি, হেপাটাইটিস-সি, সিরিফিস, এইডস বা ম্যালেরিয়া- যে কোনো একটির জীবাণুর উপস্থিতি সম্পর্কে কোনো রকম সংশয় বা প্রশ্ন দেখা দিলে সে রক্তের ব্যাগ সাথে সাথে বাতিল ও ধ্বংস করা হয়। এই আপোষহীন মনোভাবের কারণে কোয়ান্টাম ল্যাব থেকে সরবরাহকৃত রক্তের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা এখন পুরোপুরি আস্থাশীল।

তাদের এই আস্থার ফলে প্রতিষ্ঠার তৃতীয় বছরেই কোয়ান্টাম থেকে ৬৪৭০ ব্যাগ রক্ত প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। গত জুলাই মাসে সরবরাহ করা হয়েছে ৮ শতাধিক ব্যাগ রক্ত।

গত বছরে হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস সন্দেহে ১২৯ ব্যাগ, হেপাটাইটিস-সি সন্দেহে ৭ ব্যাগ, সিরিফিস সন্দেহে ২৯ ব্যাগ ও এইডস সন্দেহে ৪ ব্যাগ রক্ত বাতিল ও ধ্বংস করা হয়। কোয়ান্টাম ল্যাবের কনসালটেন্ট রক্ত পরিসংখ্যান বিশেষজ্ঞ ডা. এম.এম. হাবিবুল্লাহ প্রতিদিন নিয়মিত স্লাইড বা ডিভাইজ নিরীক্ষা করেন। এছাড়া মেডিক্যাল অফিসার ডা. রাজু আহমেদ এবং ডা. শোহাব নাহিয়ান রক্ত সংগ্রহ ও ক্রীনিং তত্ত্বাবধান করেন। এছাড়া ল্যাবের অনারারী ডিরেক্টর প্রফেসর ডা. এ.বি.এম ইউনুস ল্যাব পরিচালনা ছাড়াও মাঝে মাঝে আকস্মিক ভিজিট করেন।

বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, টেকনোলজিস্ট, ল্যাব কর্মী, কর্মকর্তা ও স্বেচ্ছা সেবকদের আন্তরিক সেবার মানসিকতার ফলেই পরম করুণাময়ের অনুগ্রহে কোয়ান্টামের সরবরাহ করা প্রতি ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান হয়ে উঠেছে নিরাপদ- নিশ্চিত মনে ব্যবহারযোগ্য।



(বামে) ল্যাবের অনারারী ডিরেক্টর প্রফেসর ডা. এ.বি.এম. ইউনুস এলাইজা মেশিনের প্রসেসিং দেখছেন। পাশে সাহায্য করছেন মেডিক্যাল অফিসার ডা. রাজু আহমেদ। অন্যদিকে সেন্ট্রিফিউজ মেশিনে সেল সেপারেশনের প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করছেন কনসালট্যান্ট ডা. এম.এম. হাবিবুল্লাহ।

(নিচে বামে) কর্মব্যস্ত ল্যাব।

(নিচে ডানে) ল্যাবের ফ্রন্ট অফিসে প্রোগ্রাম অফিসার জিয়াউল ইসলাম খন্দকার ও রুবিনা ইয়াসমিন।



স্বেচ্ছা রক্তদাতারাই রক্তদান আন্দোলনের প্রাণ

প্রফেসর ডা. মুজিবুর রহমান



১৯৫৪ সালে রক্ত পরিসঞ্চালনবিদ হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করার সুবাদে বাংলাদেশে রক্ত পরিসঞ্চালন কার্যক্রমের সূচনালগ্ন থেকেই

আমি এর সাথে জড়িত। আমাকে বলতেই হচ্ছে যে, আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধান অতিথি জাতীয় অধ্যাপক প্রফেসর নুরুল ইসলাম যথার্থই স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের হাতে সম্মাননা তুলে দেয়ার জন্যে একজন উপযুক্ত ব্যক্তি। কারণ আমার কাছেই ১৯৭২ সালের ১০ জুন নিজে রক্তদানের মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের সূচনা করেন। তারপর তাঁর উদ্যোগেই ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হলো দেশের বৃহত্তম রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্র। শুধু তা-ই নয়, তাঁর আন্তরিক সহযোগিতায় আমরা চালু করলাম রক্ত পরিসঞ্চালন বিষয়ে বিশ্বের প্রথম ডিপ্লোমা কোর্স যা পরবর্তীতে অন্যান্য দেশে চালু হয়েছে।



রক্তদান
কার্যক্রম
এখন
২য় ধাপে

প্রফেসর ডা. এবিএম ইউনুস

রক্তশূন্যতা, রক্তক্ষরণ নয়তো ব্লাড ক্যান্সার এসব রোগ নিয়েই বেশিরভাগ রোগী আমার কাছে আসেন। একবার পুরনো ঢাকার একজন ব্লাড ক্যান্সার রোগী এলেন। রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। রোগীর জন্যে ফ্রেশ রক্ত লাগবে। অভিভাবকরা একটি ব্লাড ব্যাংকে গিয়ে নিজেদের ভাষায় বললেন, ‘গরম রক্ত লাগবে’। অতএব ফ্রিজের রক্ত বের করে গরম পানি ভর্তি গামলায় কিছুক্ষণ রেখে গরম রক্ত তাদেরকে দেয়া হলো। রোগীর দেহে সে রক্ত দেয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি মারা গেলেন।

আরেকবার আমাদের প্রফেশনেরই একজন চীফ টেকনোলজিস্টের মেধাবী একমাত্র ছেলে ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়। কিছুদিন চিকিৎসা করে ব্লাড ক্যান্সার থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়। কিন্তু পরবর্তীতে জন্ডিস এবং শেষে লিভার ফেইলিওর হয়ে সে মারা যায়। ব্লাড ক্যান্সারের চিকিৎসার সময় স্ক্রিনিং ছাড়া রক্ত দেয়ার কারণেই তার জন্ডিস হয়েছিল। তার বাবার ধারণা ছিল পরিচিত আত্মীয়-স্বজন রক্ত দিচ্ছেন তাই এতে কোনো জীবাণু নেই।

ঠিক এরকম ধারণাই করেছিলো এক ছেলে তার মায়ের জন্যে রক্ত সংগ্রহ করতে গিয়ে। মামার ব্লাড ব্যাংক থেকে রক্ত নিতে গিয়ে তার একবারও সন্দেহ হয় নি যে, এ রক্তই ডেকে আনবে তার মায়ের মৃত্যু। কারণ তা ছিলো স্ক্রিনিংবিহীন দূষিত রক্ত।

একজন রক্ত পরিসঞ্চালনবিদ হিসেবে আমি খুব স্পষ্টভাবে বলি যে, নিরাপদ ডোনার মানেই নিরাপদ রক্ত। স্বেচ্ছা রক্তদাতারাই হলেন সুস্থ ও নিরাপদ রক্ত আন্দোলনের প্রাণ, ভিত্তির একেকটি ইট।

১৯৭৫ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক ঘোষণায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় যে, সকল রক্ত পরিসঞ্চালন কার্যক্রম হবে স্বেচ্ছা এবং পুনঃবিপণন অযোগ্য রক্তদানের মাধ্যমে। একই সাথে সেখানে রক্তদাতা এবং রক্তগ্রহীতা উভয়েরই নিরাপত্তা বিধানের কথা বলা হয়।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন এই মহান মানবিক কাজে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এ কার্যক্রমে যত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এগিয়ে আসবে এবং যত বেশি মানুষ স্বেচ্ছা রক্তদানে উদ্বুদ্ধ হবে, ততই নিরাপদ ও সুস্থ রক্তের নিশ্চয়তা দেয়া সম্ভব হবে।

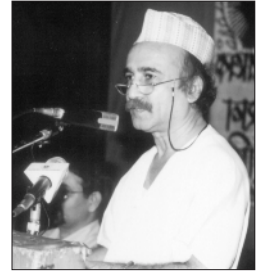
[প্রফেসর ডা. মুজিবুর রহমান বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা প্যানেলের সদস্য, পিজি-র ব্লাড ট্রান্সফিউশন সার্ভিসের প্রতিষ্ঠাতা ডাইরেক্টর। তিনি বাংলাদেশে নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথিকৃত। স্বেচ্ছা রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বিশেষ অতিথির ভাষণের সার সংক্ষেপে।]

আমার পেশাগত জীবনের এরকম আরও কিছু ঘটনা আমাকে অত্যন্ত আন্দোলিত করে, ব্যথিত করে। এর মধ্যে জানলাম কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের জহিরুল ইসলাম প্রিন্স নামের একটি ছেলে ব্লাড ডোনার নিয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে যেয়ে রক্ত দেয়ার ব্যবস্থা করে। কিন্তু রক্ত সংগ্রহ এবং তা প্রসেস করার নিজস্ব কোনো ব্যবস্থা তাদের নেই। কিছুদিন পর এক বন্ধুর সাথে মেডিটেশন কোর্স করতে গিয়ে মহাজাতক সাহেবের সাথে পরিচিত হলাম। অনেক স্বেচ্ছা রক্তদাতাও লক্ষ্য করলাম। তাদের সঙ্গে মিলেই সিদ্ধান্ত নিলাম এমন একটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করবো যেখানে নিজস্ব ডোনার পুল সৃষ্টির মাধ্যমে নিরাপদ ও সুস্থ রক্ত সুলভে সরবরাহ করা সম্ভব হবে। এর টেকনিক্যাল দিকগুলো দেখার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় আমি নিলাম।

২০০০ সালের এপ্রিলে শুরু হলো কোয়ান্টাম ল্যাবের কার্যক্রম। মাত্র তিন বছরের এই পদযাত্রায় আমরা এগিয়েছি স্বতঃস্ফূর্তভাবে। বিশেষ করে এ বছর আমাদের ল্যাবে সংযুক্ত হয়েছে রক্তের কম্পোনেন্ট সেপারেটর (সেন্ট্রিফিউজ মেশিন), স্ক্রিনিং-এর জন্যে আধুনিক এলাইজা মেশিন, -৮৫ ডিগ্রী সে. তাপমাত্রার ডিপ ফ্রিজ। আগামী মাস থেকেই কোয়ান্টাম রক্ত কার্যক্রম প্লাটিলেট, ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা, প্লাটিলেট রিচ প্লাজমা, আরসিসি সহ রক্তের সকল উপাদান সরবরাহে সক্ষম হবে। ফলে এখন ডেঙ্গু, আইটিপি, ব্লাড ক্যান্সার, হিমোফিলিয়া, লিউকেমিয়া, আণ্ডনে পোড়া, সিভিয়ার এনিমিয়া, প্রাক্টিক্যাল এনিমিয়াসহ বিভিন্ন রোগীর প্রয়োজনীয় রক্ত উপাদান সরবরাহ করে আরো বেশি সেবা দিতে পারবো। রক্ত কার্যক্রমের দ্বিতীয় ধাপে প্রবেশের এই আনন্দক্ষেণে আমরা পরম করুণাময়ের শুকরিয়া আদায় করছি।

[প্রফেসর ডা. এবিএম ইউনুস ব্লাড ক্যান্সার ও রক্তরোগ বিশেষজ্ঞ, সহযোগী অধ্যাপক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি কোয়ান্টাম ল্যাবের অনারারী পরিচালক।]

সবটাই
আপনাদের
আন্তরিক
প্রচেষ্টার
ফসল



শহীদ আল বোখারী মহাজাতক

যদি সমবেতভাবে চেষ্টা করা যায়, যদি অর্থ, শ্রম, মেধা এবং মমতা দিয়ে সম্পৃক্ত হওয়া যায় তাহলে আমরা নিজেরাই যে কিছু করতে পারি তার প্রমাণ এই কোয়ান্টাম রক্তদান কার্যক্রম। কারণ কোনো রকম সরকারি বা বিদেশি সাহায্য ছাড়াই শুধুমাত্র আপনাদের মতো অসংখ্য মানুষের নিঃস্বার্থ রক্তদান, অর্থদান এবং স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতেই সূচিত হয়েছিল এ কার্যক্রম যা এখন দ্বিতীয় ধাপে উন্নীত হয়েছে।

তাই আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় বিশেষ অতিথি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদদের কথার প্রতিধ্বনি করেই বলতে চাই, যে আলোকিত মানুষ গড়ার স্বপ্ন তিনি দেখেন, রক্তদানের এই পথ ধরে আমরাও সেই আলোকিত মানবিক মহাসমাজ গড়তে চাই।

আমাদের এই পথ চলার একেবারে শুরু থেকেই যিনি স্নেহময় পিতার মতো সমর্থন ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন তিনি আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জাতীয় অধ্যাপক প্রফেসর ডা. নুরুল ইসলাম। দশ বছর আগে তিনি নিঃসঙ্কোচে বলেছেন আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা ও কোয়ান্টাম মেথড পরস্পরের সম্পূরক ও পরিপূরক। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ আমরা বান্দরবানের লামায় দুঃস্থ শিশুদের জন্যে প্রতিষ্ঠিত শিশুকাননের প্রথম আবাসিক হলটিকে তাঁর নামে নামকরণ করেছি।

যে কথাটি আমরা সবসময় বলি, তাহলো মানুষের দুঃখ-কষ্ট-বঞ্চনার কথা বলা উচিত। কারণ এমন হতে পারে যে, সেই কথা শুনে দশজনের মধ্যে অন্তত একজনের হৃদয়ে দাগ কাটতে পারে এবং দুঃখ দূর করার জন্যে সে সচেষ্ট হতে পারে। আসলে আমরা যে রক্ত কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়েছি তা-ও এরকমই এক দুঃখের ঘটনা শুনে বেদনাতুর হওয়ার কারণে। ঘটনাটি ছিলো এ রকম- দু’বোন থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত। বড় বোনের বয়স ১০ এবং ছোট বোনের ৭ বছর। তাদের দু’জনের জন্যে রক্তের প্রয়োজন, কিন্তু কোথাও রক্ত পাওয়া যাচ্ছে না। অবশেষে অতি কষ্টে এক ব্যাগ রক্ত সংগ্রহ করা গেল। বাবা-মা সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না কোন সন্তানকে রক্ত দেবেন। দু’বোনই তখন হাসপাতালের বেডে শুয়ে, উঠে বসার শক্তি নেই। একজন অন্যজনের দিকে তাকাচ্ছে। এমন সময় বড় বোন ছোটটিকে দেখিয়ে বললো ওকেই দাও, ও খুব দুর্বল, ওরই রক্ত বেশি প্রয়োজন। ছোট বোনকে রক্ত দেয়া হলো। বড় বোনটি কিন্তু আর বাঁচে নি। ঘটনাটি যখনই মনে হয়, তখনই ভাবি একজন মুমূর্ষু কিশোরী যদি রক্তের ব্যাগ আর একজনকে দিয়ে দিতে পারে, তবে আমরা সুস্থ মানুষরা কেন রক্ত দিতে পারবো না!

তাই, দুঃখের কথা সবসময় বলবেন, কারণ দেরিতে হলেও তা কারও না কারও মনে ক্রিয়া করবেই।

[সহস্র আজীবন স্বেচ্ছা রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণের সার সংক্ষেপে।]

কোয়ান্টাম বুলেটিন : রক্তদাতা সম্মাননা সংখ্যা : আগস্ট, ২০০৩। সম্পাদক : কাজী মাহতাব উদ্দিন আহমদ ॥ নাহার আল বোখারী, পরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ১১৯/পি শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ ফোন : ৯৩৪১৪৪১, ৮৩১৯৩৭৭

কোয়ান্টাম ল্যাব থেকে রক্তের সকল উপাদান সরবরাহ শুরু

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম থেকে এখন রক্তের সকল উপাদান সরবরাহ শুরু হয়েছে। এখন শুধু হোল ব্লাড বা আরসিসি নয়—রোগী তার প্রয়োজন অনুসারে প্লাটিলেট কনসেন্ট্রেট, ফ্রেশ প্লাজমা, ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা, প্লাটিলেট রিচ প্লাজমা, প্লাটিলেট পুওর প্লাজমা, ক্রায়ো প্রিসিপিটেট, প্রোটিন সলিউশন সহ রক্তের যে কোনো উপাদান সংগ্রহ করতে পারছেন।

গত জুলাই মাসে ল্যাবে সেল সেপারেটর সেন্ট্রিফিউজ মেশিন, -৮৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার ডিপ ফ্রিজ, এলাইজা মেশিন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযুক্ত হওয়ার পর রক্ত উপাদান বিয়ুক্তির পরীক্ষামূলক কাজ শুরু হয়। সফল পরীক্ষা শেষে আগস্টের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে রোগীদের চাহিদা অনুসারে রক্তের সকল উপাদান সরবরাহ শুরু হয়। ফলে এখন প্রতিদিন রক্ত উপাদানের জন্যে রোগীদের ভীড় বাড়ছে।

উল্লেখ্য যে, ২০০২ সালের আগস্ট মাস থেকে গুরুজীর ডাকে সাড়া দিয়ে গ্রাজুয়েটরা রক্ত দান উন্নয়ন তহবিলের অর্থ সংগ্রহ শুরু করেন এবং ২০০৩ সালের আগস্ট পর্যন্ত ৪৮ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেন। তাদের সংগৃহীত এই অর্থ দিয়েই ল্যাবের অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়।

প্রতিবেদক : শম্পা রায়

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের কর্মসূচি

- ১. চট্টগ্রামে গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ : ১৯ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার)।
- ২. চট্টগ্রামে ১৬৮ ব্যাচের পরিচিতি সভা : ২০ সেপ্টেম্বর (শনিবার)।
- ৩. চট্টগ্রামে ১৬৮ ব্যাচের কোর্স : ৩, ৪, ৫ ও ৬ অক্টোবর (শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)।
- ৪. ঢাকায় ১৬৯ ব্যাচের পরিচিতি সভা : ৮ অক্টোবর (বুধবার)। মার্গরিবের পর মাসিক যৌথ মেডিটেশন।
- ৫. ঢাকায় ১৬৯ ব্যাচের কোর্স : ১৭, ১৮, ১৯ ও ২০ অক্টোবর (শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)।
- ৬. রাজশাহীতে গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ : ১৪ অক্টোবর (মঙ্গলবার)।
- ৭. রাজশাহীতে ১৭০ ব্যাচের পরিচিতি সভা : ১৫ অক্টোবর (বুধবার)।
- ৮. রাজশাহীতে ১৭০ ব্যাচের কোর্স : ২৪, ২৫, ২৬ ও ২৭ অক্টোবর (শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)।

কোয়ান্টাম বুলেটিন সেপ্টেম্বর ২০০৩

অগ্রসর গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপে গুরুজী অনন্য মানুষ হতে হলে গ্রহীতা নয়, দাতা হতে হবে

‘অনন্য মানুষ হচ্ছে দাতা। অনন্য মানুষ হতে হলে দাতা হতে হবে। গ্রহীতা নয়, দাতার নামই কালের পাতায় অক্ষয় হয়ে থাকে।’ গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক গত ৫ সেপ্টেম্বর কোয়ান্টাম মেডিটেশন হলে দিনব্যাপী অগ্রসর গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপের তৃতীয় পর্বের সমাপ্তি আলোচনায় এই দিক-নির্দেশনা দেন।

তিনি অগ্রসর গ্রাজুয়েটদের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পরিবর্তনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন যে, অনন্য মানুষ হওয়ার অভিযাত্রীদের লক্ষ্য হচ্ছে দেয়া। সবসময় মনে রাখতে হবে আমি পৃথিবীতে বড় কিছু করার জন্যে এসেছি, পৃথিবীতে দিতে এসেছি। এ কথা মনে রাখলেই সময় মতো কাজ করা যাবে, সময়কে কাজে লাগানো যাবে, মেধার বিকাশ ঘটানো যাবে, দক্ষতা ও নৈপুণ্যের ছাপ রাখা যাবে।

গুরুজী বলেন, একজন অগ্রসর গ্রাজুয়েটকে সব সময় স্বাবলম্বী ও সুশৃঙ্খল হতে হবে। ঘরে নিজের কাজ নিজেকে করতে হবে। অন্যের ওপর নির্ভরতা দূর করতে হবে। পরিবারের অন্যান্যদের কাছ থেকে সেবা নেয়ার পরিবর্তে তাদেরকে যতদূর সম্ভব সেবা দিতে হবে। ঘরে সেবা দেয়ার মতো ছোট ছোট দান থেকেই বড় দান করার অভ্যাস গড়ে উঠবে। দাতা

হওয়ার মনোভাব পরিপুষ্ট হবে। আর সুশৃঙ্খল হলেই কাজের পরিপূর্ণ ফল পাওয়া যাবে।

অগ্রসর গ্রাজুয়েটদের সবসময় ফাউন্ডেশন বা সং সংঘে একাত্ম থাকার গুরুত্ব প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সংঘই শক্তি। বড় কিছু করতে হলে, বড় মাপের কিছু করতে হলে একই চেতনায় উদ্বুদ্ধদের সাথে একব্যবস্থাবে কাজ করতে হবে। পৃথিবীর সকল মহান ও বড় কাজই সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার ফসল। ফাউন্ডেশনের আত্মশুদ্ধি ও সৃষ্টির সেবা কার্যক্রমে যত বেশি অংশ গ্রহণ করবেন, তত আপনার সাংগঠনিক দক্ষতা, নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা বাড়বে, মহৎ চিন্তা ও বড় পরিকল্পনা করার মনোবল পাবেন, আপনার মেধা বিকশিত হবে আর বড় দাতা হওয়ার পথে আপনি এগিয়ে যাবেন।

মা-জী নাহার আল বোখারীর সূচনা বক্তব্যের পর ওয়ার্কশপে মওলানা ছায়ীদুল হক ধর্মীয় দৃষ্টিতে সং কাজে সংঘবদ্ধ থাকার গুরুত্ব সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন। তিনি বলেন, পৃথিবীতে মহৎ কিছু কখনো একক প্রচেষ্টায় হয় নি। এ জন্যে নবী-রসূলরা সবসময়ই সংঘবদ্ধ জীবনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

দীর্ঘ প্রশ্নোত্তর পর্ব ও কয়েকটি নতুন মেডিটেশনের মধ্য দিয়ে সারা দিনের এই আকর্ষণীয় ওয়ার্কশপটি সমাপ্ত হয়।

প্রতিবেদক : সুমন ধর

বিজ্ঞান মনষ্ক মেথড শাহজাহান সরদার

আজ আমি
দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে
বলতে পারি,
তিনি যেমন
আমার
সাংবাদিকতায়
অগ্রজ ছিলেন,
তেমনি সমৃদ্ধ
জীবন গড়ার



গুরু হিসেবেও তার কাছে নতুনভাবে দীক্ষা নিলাম। আমি একজন সাংবাদিক এবং গুরুজীও এক সময় সাংবাদিক ছিলেন। সেই সম্পর্কের টানে মাঝে মাঝে এখানে ছুটে আসতাম। কিন্তু কোর্সে অংশ নেয়ার ১০ দিন আগেও ভাবি নি, এভাবে আমার পুনর্জন্ম হবে।

এই কোর্সটিতে অংশ নিই মূলত আমার স্ত্রীর তাগিদে। আমার দু ছেলেও কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট এবং তারা নিয়মিত মেডিটেশন করছে। তারাও আমাকে মেডিটেশন করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। পেশাগত কারণে ব্যস্ত থাকা এবং ছুটোছুটি করতে অভ্যস্ত আমি যে এই কোর্সটি সৃষ্টিভাবে করতে পারলাম সেটাই ছিলো আমার জন্যে এক বড় বিস্ময়। প্রো-অ্যাকটিভ হবার শিক্ষা পেলাম আমি এখানে। আমার বিশ্বাস এ কোর্স থেকে আমি আরো উপকৃত হবো।

আমি একজন বাস্তববাদী মানুষ। বাস্তবতার নিরিখেই আমি বলতে চাই, আমাকে যখন সমাজের কথা, পার্লামেন্টের কথা লিখতে হয়, তখন লেখার মতো আমি কিছুই পাই না। কিন্তু এই কোর্সের এক দিনের বক্তব্য যদি আমাকে লিখতে বলা হতো তবে দৈনিক ইত্তেফাকের মোট চক্কিশ পাতায়ও তা শেষ করা যেতো না।

পেশার সুবাদে আমি পৃথিবীর বহু দেশের বহু সেমিনারে অংশ নিয়েছি। কোনো বক্তাই আমাকে আকৃষ্ট করতে পারে নি। কিন্তু এখানে মাত্র একজন বক্তা আমার মতো এত দুরন্ত লোককে তৃপ্ত করেছে। গুরুজীর আলোচনায় পৃথিবীর বড় বড় মনীষীদের উদ্ধৃতি রয়েছে। সমাজনীতি, অর্থনীতি, স্বাধীনতা সংগ্রাম সবই রয়েছে। তিনি মূলত সমাজের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে জ্ঞানের আলো দিয়ে আমাদেরকে যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, যে ভাবে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন, সে শিক্ষা আমি অন্য কারো কাছ থেকে পাই নি।

এ কোর্সটি সম্পূর্ণ বিজ্ঞান মনষ্কতার ভিত্তিতে তৈরি এবং কোর্সটি তৈরি করে তিনি দেশপ্রেমের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

[ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির প্রাক্তন সভাপতি এবং দৈনিক ইত্তেফাকের সিনিয়র কorespondent শাহজাহান সরদার ১৫৬ ব্যাচে কোর্স করেছেন।]

একজন কাজী রওনাক হোসেন : সাফল্যের সহজ স্বতঃস্ফূর্ততা

জীবনে যে কাজটিতে তিনি হাত দিয়েছেন তাতেই সোনা ফলেছে। জীবন তার কাছে একটি প্রবাহমান নদীর মতো। সাফল্যের বার্নাধারা যাতে এসে মিশেছে অবিরত।

দেশের একমাত্র নিয়মিত সংগীত বিষয়ক পত্রিকা ‘সরগম’ এর সম্পাদক কাজী রওনাক হোসেন। ফুলের ছড়িয়ে থাকা পাপড়ি সদৃশ অজস্র পরিচয়ে পল্লবিত তিনি। একাধারে সম্পাদক, শিক্ষক, ফটো সাংবাদিক, অনুবাদক, লেখক, বিজ্ঞাপনী সংস্থার প্রধান, ক্রীড়ামোদী, সংগীত বিশেষজ্ঞ, সমাজসেবক এবং একজন বিশিষ্ট কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট— যে পরিচয়টি দিতে তিনি ভালবাসেন, স্বচ্ছন্দবোধ করেন।

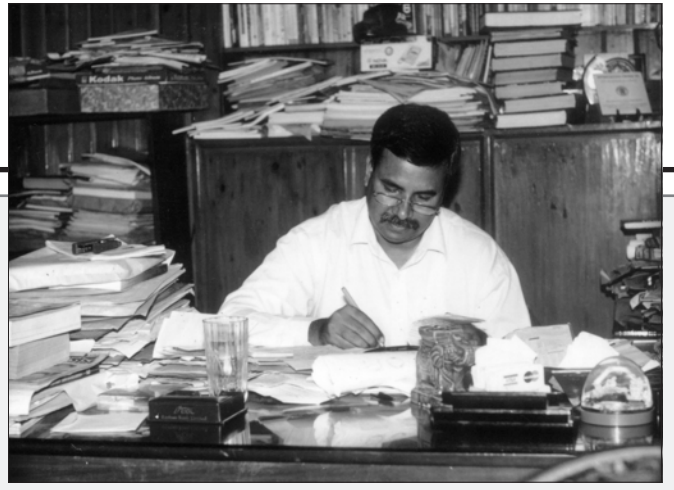
এখন যারা বয়সে প্রবীণ তাদের অনেকেই হয়তো স্মরণ করতে পারেন কাজী রওনাকের সেই বিখ্যাত ছবিটির কথা— ‘রোহিঙ্গারা আসছে’ শিরোনামে ১৯৯১ সালে দৈনিক বাংলার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত এ ছবিতে দেখা যায়— নৌকা বোঝাই হয়ে মিয়ানমার থেকে রোহিঙ্গা শরণার্থীরা নারায়ণ নদী পাড়ি দিচ্ছে বাংলাদেশে আশ্রয়ের সন্ধানে। শরণার্থী জীবনের অনিশ্চয়তা ও হাহাকারের এই শিল্পিত রূপটি বিশ্বখ্যাত সংবাদ মাধ্যম এএফপি’র মাধ্যমে সবখানে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিশ্ব সংস্থাগুলোর নজরে আসে রোহিঙ্গা সমস্যাটি। এছাড়াও ৮৮’র ঘূর্ণিঝড়ে উরিচরের বিধ্বস্ত জনপদ, ৯১’র ঘূর্ণিঝড়ের ছবি ভীষণ কভারেজ পায় সে সময়ে।

১৯৮১ সালে জার্নালিজমে মাস্টার্স করার পর কাজী রওনাক ফটোগ্রাফী শুরু করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালিজম বিভাগের অনার্স প্রথম ব্যাচের ছাত্র তিনি। ১৯৮৩ সালে দৈনিক বাংলায় যোগ দেন ফটো সাংবাদিক হিসেবে। জার্নালিজমে মাস্টার্স করে তিনিই প্রথম এদেশে ফটো সাংবাদিকতাকে পেশা হিসাবে নিয়েছেন। বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্নালিজমের থণ্ডকালীন শিক্ষক।

কাজী রওনাক ছাত্র জীবন থেকেই সাপ্তাহিক ‘চিত্র সন্ধানী’ ও ‘ললনাতো’ ফিচার লিখেছেন। ৮০’র দশকে বাংলাদেশের প্রধান সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাগুলোর প্রচ্ছদ করেছেন একচেটিয়া। এর মধ্যে বিচিত্রা, রোববার, সচিত্র সন্ধানী, তারকালোক অন্যতম।

এমনকি দেশের বাইরেও তিনি ম্যাগাজিনের জন্য প্রচ্ছদ করেছেন। ইংরেজী নিউ নেশন পত্রিকায় নাট্য-সংস্কৃতির সমালোচনা করতেন নিয়মিত। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তার লেখা ফিচারের সংখ্যা হাজার খানেক।

১৯৯৩ সালে দৈনিক বাংলা ছেড়ে নিজের পত্রিকা ‘সরগম’ শুরু করার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠা করেন বিজ্ঞাপনী সংস্থা Vision যা এখন দেশের প্রথিতযশা বিজ্ঞাপনী সংস্থাগুলোর মধ্যে অন্যতম। বিভিন্ন সময়ে তার প্রতিষ্ঠানটি নানা উন্নত ও প্রশংসনীয় কাজ করেছে। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক, সিলভারলাইন গ্রুপ, মেরী স্টোপস ক্লিনিক-এর মতো নামকরা প্রতিষ্ঠান এর গ্রাহক।



তার ‘ক্যাপ্টেন হেটেরাস’ ও ‘নোঙ্গর ছেঁড়া’ অনুবাদ গ্রন্থ দু’টি সেবা প্রকাশনীর জুলভার্ন সিরিজের সবচেয়ে বেশি বিক্রিত বইগুলোর অন্যতম।

সদা প্রশান্ত, হাস্যময় ও সদালাপী কাজী রওনাক হোসেন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট কোর্স করেন ৪র্থ ব্যাচে। কোয়ান্টাম মেথড প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেবার আগে থেকেই যে ক’জন সৌভাগ্যবান গুরুজীর সাথে প্রাথমিক পর্যায়ে মেডিটেশন-এ অংশ নিতেন তিনি তাদের একজন। সে দিনগুলোতে তিনি গুরুজীর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে থাকতে পেরেছিলেন।

মূলত মেডিটেশন-এ আগ্রহ তার ছোট বেলা থেকেই। বিভিন্ন ধরনের মেডিটেশন পদ্ধতি নিয়ে তিনি প্রচুর পড়াশোনা করেছেন। কিন্তু কোথাও সেভাবে তৃপ্ত হতে পারেননি না। কাজী রওনাক বলেন, ‘আমি গুরুজীর কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। তার তত্ত্বাবধানে পদ্ধতিগত ভাবে মেডিটেশন শিখতে পেরেছি।’ কোয়ান্টাম মেথড তার কাছে অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক একটি পদ্ধতি মনে হয়েছে যা জীবন বদলে দিতে পারে। মেডিটেশন তার কাছে কোনো অলৌকিক ব্যাপার নয়, সঠিকভাবে অনুশীলন করলে যে কোনো পদ্ধতির মেডিটেশনই মানুষের প্রভূত উপকার সাধন করবে। সাধনার পথ ধরেই এখানে সাফল্য পাওয়া যায়। তিনি বিশ্বাস করেন নিজের উপর আস্থা রাখলে মেডিটেশনের মাধ্যমে যে কোনো মনছবি বাস্তবায়িত হতে পারে।

তার জীবনে অনেক ঘটনা রয়েছে যেখানে তিনি মনছবিকে কাজে লাগিয়ে সাফল্য লাভ করেছেন। ২০০০ সালে ব্যবসায়িক কাজে কানাডা যাবার জন্য ভিসার আবেদন করেন এবং কোনো কাগজপত্র ছাড়াই তিনি ভিসা পেয়ে যান। কানাডার ভিসা হয়ে যাবার পর উৎসাহিত হয়ে তিনি আমেরিকার ভিসার জন্যও আবেদন করেন। তা-ও খুব সহজে হয়ে যায়। উল্লেখ্য তিনি সেভাবেই মনছবি করেছিলেন।

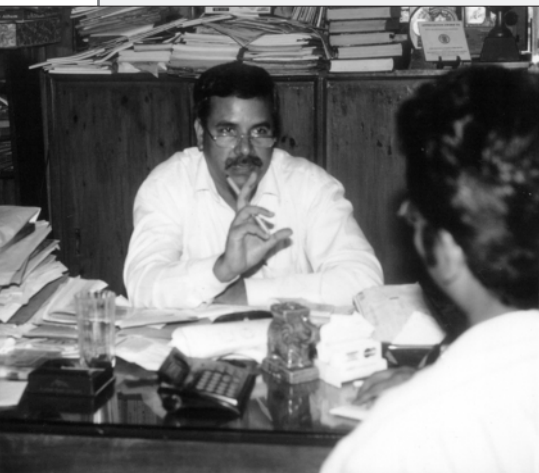
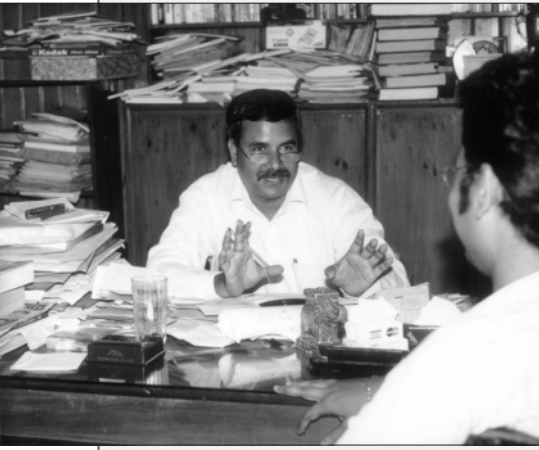
অন্য একটি ঘটনায় Daewoo কোম্পানীর একটি বড় ধরনের কাজ তিনি পান মনছবি করে। এ কাজ পাবার জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত ব্যয়বহুল মডেল জমা দেয়। কিন্তু কাজী রওনাক শুধুমাত্র সাদা কাগজে লে-আউট ডিজাইন জমা দিয়ে কাজটি পেয়ে যান।

শত ব্যস্ততার মাঝেও কাজী রওনাক নিয়মিত মেডিটেশন করেন। নানামুখী কর্মকাণ্ডের অবিশ্রান্ত ধারায় মেডিটেশন বরাবরই তার সার্বক্ষণিক সঙ্গী ছিল। বলেন, ‘সৃজনশীলতার উৎকর্ষ সাধন ও বিকাশে আমার জীবনে মেডিটেশনের ভূমিকা অপরিসীম।’ তিনি আরো বলেন, জীবনে সাফল্যের জন্য প্রয়োজন ‘কোয়ান্টাম আত্ম বিশ্বাস’। নিজে যেমন তিনি জীবনের পথ পরিক্রমায় মেডিটেশন থেকে উপকৃত হচ্ছেন তেমনি অন্য অনেককে মেডিটেশনে উদ্বুদ্ধ করে চলেছেন প্রতিনিয়ত।

মেডিটেশনের সাথে সাথে তিনি নিজেকে সৃষ্টির সেবায় নিয়োজিত রেখেছেন। I and we নামের একটি এনজিও প্রতিষ্ঠানের তিনি কর্ণধার— যেখান থেকে এ পর্যন্ত হাজার খানেক তরুণ-তরুণীকে আত্মকর্ম সংস্থানের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও দীর্ঘদিন ধরে তিনি রোটারী ইন্টারন্যাশনাল-এর সাথে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। এর বাইরে তিনি বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংস্থার সাথে জড়িত। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিটিভি’র ১ম থ্রেন্ডের শিল্পী উলকা হোসেনের স্বামী এবং ২ সন্তানের জনক। তিনি জন্মেছেন একটি সংগীত পরিবারে এবং ছোট বেলা থেকেই তিনি সেতার বাজাতেন। ক্রিকেট খেলেছেন প্রথম বিভাগ লীগে ১৯৭২ সালে।

একাধারে এতগুলো গুণের অধিকারী প্রচণ্ড ব্যস্ত মানুষটি অত্যন্ত নিরহংকারী বিনয়ী ও মার্জিত। কোয়ান্টাম চেতনার লালনে নিবেদিতপ্রাণ। হাজারো ব্যস্ততার মাঝে এবার ফাউন্ডেশনের রক্তদান কার্যক্রম উন্নয়ন তহবিলের জন্য কাজ করেছেন। ব্যক্তিগত ভাবে ডোনেশন সংগ্রহ করেছেন। সততা ও সেবাকেই জীবনের মূল মন্ত্র বলে বিশ্বাস করেন কাজী রওনাক। তার এই বিশ্বাসের মূল্য তিনি পেয়েছেন জীবন ব্যাপী সাফল্যের ফলস্বরূপে অবগাহন করে। সাফল্য যেন এক সহজ স্বতঃস্ফূর্ততায় তার পদচুম্বন করেছে বারংবার।

প্রতিবেদক : মোহাম্মদ রায়হান



শ্রদ্ধেয় গুরুজী

আসসালামু আলাইকুম। আপনি নিশ্চয়ই ভালো আছেন। জানতে পারলাম কালকে থেকে মাস্টার্স ওয়ার্কশপ শুরু হবে। আমার মন সেখানেই পড়ে থাকবে। আজ আমার জন্মদিন। আঝা খুব সুন্দর একটা চিঠি লিখেছেন। আমার এখন সেমিস্টার-এর শেষ পর্যায়। কাজের অনেক চাপ। আমার জন্য দোয়া করবেন। মা-জীকে আমার জন্য দোয়া করতে বলবেন। মা-জীকে আমার সালাম জানাবেন।

আপনার মেয়ে বনানী
(বনানী তানজিমা রহমান)
আমেরিকা

৩০ এপ্রিল, মঙ্গলবার, ২০০৩

.....

আসসালামু আলাইকুম। আশা করি, আল্লাহর রহমতে আপনি ভালো আছেন। আমি মাস্টার্স ওয়ার্কশপের কথা শুনেছি। আমার খুবই খারাপ লেগেছে এটি মিস করে। সেই কবে আপনার সাথে কথা বলেছি! আমি বিশ্বাস করি যে, আমি সঠিক পথেই এগুচ্ছি। গত বৃহস্পতিবার আমি ক্যালিফোর্নিয়াতে একজন ‘থিংক ট্যাংক’-এর কাছে ইন্টারভিউ দিয়েছি। আশা করছি এতে সফলকাম হবে। আমি এখানে কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চাই আবার অন্যদিকে আপনাদের

প্রবাস থেকে গুরুজীকে লেখা চিঠি

সবাইকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে। অথচ আমার হাতে এক মাসেরও কম সময়। আমার খুব ক্লান্ত লাগে। অথচ কাজ করতে হবে প্রচুর। দীর্ঘদিন আপনার সাথে কথা বলা হয় না বলেই এমন লাগছে আমার। আমি খুব চেষ্টা করি কোয়ান্টাম চেতনার সাথে সব সময় একাত্ম থাকতে। দোয়া করবেন যেন আমার ধৈর্য্য বজায় থাকে। আমি বিশ্বাস করি আমি সঠিক পথে এগুচ্ছি। তবু আপনার কাছ থেকে পুনরায় নিশ্চিত হতে চাই।

মা-জীকে এবং কোয়ান্টাম-এর অন্যান্য সবাইকে আমার সালাম জানাবেন।

আপনার মেয়ে বনানী
(বনানী তানজিমা রহমান)
আমেরিকা
৫ মে, রবিবার, ২০০৩

শ্রদ্ধেয় গুরুজী

প্রথমে আমার আদাব নিবেন। আশা করি সর্বশক্তিমানের কৃপায় আপনি এবং মা-জী ভালো আছেন। আগামী ১০ এবং ১৫ মার্চ আমার পরীক্ষা। আপনার আশীর্বাদ কামনা করি।

ইউরোপীয়ানদের সাথে আমাদের জীবনধারা, মূল্যবোধ, চলাফেরায় প্রায় আকাশ-পাতাল তফাত। আমি এদের সাথে কিছুতেই পুরোপুরি মিশতে চাই না। কারণ ‘রুটস’-এর উদাহরণ টেনে আপনি বলেছিলেন, যে নিজের পরিচয় এবং মূল্যবোধ ভুলতে না চায়, পৃথিবীর কোনো শক্তি তাকে তা ভোলাতে পারে না। আমিও আমার শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাই না। তাই প্রতিদিন মেডিটেশন করছি আর ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইট ব্রাউজ করছি। আমি আপনার খুব ভালো একজন শিষ্য হতে চাই। জীবনে অনেক বড় হতে চাই, শুধু পরীক্ষায় নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে সফল হতে চাই। আপনি আমার জন্যে আশীর্বাদ করবেন যেন আমি সকল সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠে সফল হতে পারি। পরিশেষে আপনার এবং মা-জীর সার্বিক কল্যাণ প্রার্থনা করে বিদায় নিচ্ছি।

তন্ময় দেবনাথ
সুইডেন
৪ মার্চ ২০০৩

এক কর্মময় জীবনের সমাপ্তি- চলে গেলেন অধ্যাপক আজগর আলী

‘হে প্রভু, তুমি আমাকে কখনো পল্লু অবস্থায় ফেলে রেখে না, মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি যেন দৈহিকভাবে সক্ষম থেকে কাজ করে যেতে পারি, সে তৌফিক দান করো আমায়।



গত ২২ মে, ২০০৩ ঢাকার বারডেম হাসপাতালে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার দশদিন আগেও যিনি স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করেছেন, রীতিমতো পড়াশোনা করেছেন, সেই প্রয়াত অধ্যাপক আজগর আলীর ডায়েরী থেকে নেয়া এই উদ্ধৃতিটুকু। আশিতম জন্মবার্ষিকীর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েও এই মনোবল, এই কর্মক্ষমতাই প্রমাণ করে তার প্রার্থনার সার্থকতা।

এক দীর্ঘ কর্মময় জীবন ছিলো অধ্যাপক আজগর আলীর। ১৯২৩ সালে জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ি থানার তারাকান্দি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। গ্রামের স্কুল থেকে মেট্রিকুলেশনের পর ১৯৪৩ সালে তিনি চলে যান কোলকাতায়, ভর্তি হন

বিখ্যাত রিপন কলেজে। এখান থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশের পর কোলকাতা সিটি কলেজে একাউন্টিং-এ অনার্সে ভর্তি হন। এসময় তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে, কারণ নিজের লেখাপড়ার খরচ যোগানোর পাশাপাশি বাড়িতেও টাকা পাঠাতে হতো তাকে।

এর মধ্যেই ১৯৪৬-৪৭ সালে শুরু হলো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সেখানকার সংখ্যালঘু মুসলিমদের এই চরম নিরাপত্তাহীনতার মুখে কোলকাতা ইসলামিয়া কলেজ হোস্টেলে বহুসংখ্যক মুসলিম ছাত্রের খাওয়া ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যে একজন ছিলেন তিনি।

এই দাঙ্গার কারণে তিনি চলে আসেন ঢাকায় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.কম নাইট শিফটে ভর্তি হন। খণ্ডকালীন চাকরিজীবী ছাত্রদের সুবিধার্থে এই নাইট শিফট চালুর ব্যাপারেও প্রধান ভূমিকা ছিলো তার।

পেশাগত জীবনে অধ্যাপক আলী প্রথমে শিক্ষকতাকে বেছে নেন। ১৯৪৮-৬০ পর্যন্ত সোহরাওয়ার্দী কলেজ, তৎকালীন কয়েদে আয়ম কলেজ এবং জগন্নাথ কলেজে অধ্যাপনা করেন। এরপর তিনি তৎকালীন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা, জুটমিল করপোরেশন, বিশ্বব্যাংক প্রভৃতিতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯২ সালে চোখের কিছু সমস্যার কারণে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অবসর নিলেও মৃত্যুর দশদিন আগ পর্যন্তও তিনি ব্যস্ত ছিলেন তার পড়াশোনা লেখালেখি নিয়ে।

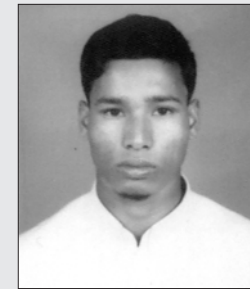
জ্ঞানচর্চার প্রতি তার এই অদম্য আগ্রহের কারণেই সম্ভবোধ বয়সেও তিনি অংশ নেন কোয়ান্টাম মেডিটেশন কোর্সের ৯২ ব্যাচে। পরবর্তীতে উচ্চতর কোর্সও সম্পন্ন করেন।

নিয়মিত মেডিটেশন করতেন। মৃত্যুর পর তার ব্যক্তিগত ডায়েরী খুলে দেখা গেলো তাতে গুছিয়ে লেখা রয়েছে কোর্সের বিভিন্ন বিষয়। মাঝে মাঝেই বলতেন- আরও আগে কোর্স করলে আরও ভালোভাবে এ থেকে উপকৃত হতে পারতেন।

তার শেষ ইচ্ছা ছিলো মেয়েদের শিক্ষার জন্যে একটি মাদ্রাসা স্থাপন, যাতে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষারও সুযোগ থাকবে। এ লক্ষ্যে প্রাথমিক কাজও সম্পন্ন করেছিলেন তিনি। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেছেন ৬ ছেলে ও ৫ মেয়ে, যারা সবাই স্ব স্ব মেধা ও যোগ্যতায় আজ প্রতিষ্ঠিত। পরম করুণাময়ের কাছে আমরা তার রুহের মাগফেরাত কামনা করি।

প্রতিবেদক : রাবেয়া নাজনীন

বাতেন স্মরণে দোয়া



শিশুকাননের কর্মী
মরহুম জিয়াউর
রহমান বাতেন-
এর রুহের
মাগফেরাত
কামনা করে গত
১৮ এপ্রিল
২০০৩, শুক্রবার
লামায় দোয়া
মাহফিল অনুষ্ঠিত
হয়। দোয়া

মাহফিল পরিচালনা করেন মওলানা ছায়ীদুল হক। পাহাড়ি-বাঙালি নির্বিশেষে কয়েকশ নারী-পুরুষ ও শিশু এতে অংশগ্রহণ করে।

প্রতিবেদক : আলী আহসান

বাকি জীবন হবে সুস্থ সুন্দর মোহাম্মদ আলী নান্টু

গত ত্রিশ বছর ধরে এলার্জি, সাইনাস, মাথাব্যথা ছিল আমার নিত্যসঙ্গী। দিনের মধ্যে সারাক্ষণই মনে হতো কতক্ষণে কাজ কর্ম শেষ করে এই ধুলোবালি ছেড়ে বাড়ি ফিরবো।

এরই মধ্যে দুর্দিন এলো চলচ্চিত্রে। যে কাজে আমি অভ্যস্ত, তা-ই ছাড়তে হলো বাধ্য হয়ে। হতাশা পেয়ে বসলো। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছি। অসুস্থতা, হতাশা এসবকে কাটিয়ে বাকি জীবন সুস্থ, সুন্দরভাবে বেঁচে থাকবো- এ বিশ্বাস এসেছে আমার।

[চলচ্চিত্র পরিচালক মোহাম্মদ আলী নান্টু ১২৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট ।]

আমি দৃঢ় বিশ্বাসী কে.এম. হাবীবুর রহমান

এ কোর্সটি করার সিদ্ধান্ত আমি নিজেই নিয়েছিলাম। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেবার পর থেকে অনেক বাধা আমাকে পেরোতে হয়েছে। আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল ছিলাম। শেষ পর্যন্ত কোর্স করতে পেরেছি। কোর্সের দিক-নির্দেশনা অনুসরণ করলে যে সফল বাস্তবতা পাওয়া সম্ভব, তার প্রমাণ আমি পেয়েছি এ কোর্স করার মধ্য দিয়ে। আমার বিশ্বাসে আর কোনো ফাঁক নেই।

[কে.এম. হাবীবুর রহমান রংপুর কারমাইকেল কলেজের ছাত্র । ১২৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট ।]

নিজেকে অনন্য মানুষ বলে ভাবছি জুয়েরিয়া জুঁই

ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় একটি ঘটনা আমাকে মানসিকভাবে খুবই বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল। তাই আমি এ বছর পরীক্ষাও দিতে পারি নি। নেতিচিন্তা সারাক্ষণই মাথায় ঘুরপাক খেতো। নিজেকে খুব ছোট মনে হতো। কিন্তু এখন আমি নিজেকে একজন অনন্য মানুষ বলে ভাবছি। আমি হয়তো আরও ভুল করতে পারতাম। কিন্তু গুরুজীর কাছে আমি কৃতজ্ঞ যে, তাঁর শেখানো জ্ঞান আমাকে এখন নতুন করে পড়তে সাহায্য করবে।

[শিক্ষার্থী জুয়েরিয়া জুঁই ১২৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট ।]

মেডিটেশনের অনন্য অনুভূতি এস.এম. ইউসুফ আলী

বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের বন্ধুদের দেখতাম তারা ফিলিংস নেয়ার জন্যে গাঁজা টানতো, নেশা করতো। কিন্তু এই কোর্সে এসে আমার মনে হলো, কেউ যদি ফিলিংস নিতে চায়, তাহলে সে মেডিটেশন কোর্স করতে পারে। কারণ এ এক চমৎকার অনুভূতি। এ হলো জীবনের দৃষ্টিভঙ্গিকে বদলানোর অনুভূতি। মনকে নিজের মতো করে সংজ্ঞায়িত করার অনুভূতি। মনকে কীভাবে কম্পিউটারের মতো কাজে লাগাতে পারি, তা আমরা শিখেছি এ কোর্সে। আর যে অপারেটিং সিস্টেম দিয়ে এটিকে চালাবো, তা হলো মনছবি। যা চাই, তাকে সবচেয়ে সহজে এবং সংক্ষিপ্ত সময়ে পাওয়ার জন্যেই এই মনছবি।

তাই আধুনিক হাইটেক টেনশনের ছাপিয়ে প্রশান্তির সাগরে অবগাহনের এক অনন্য অনুভূতি মেডিটেশন।

[এস.এম. ইউসুফ আলী কম্পিউটার প্রফেশনাল । ১২৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট ।]

সংশয় কেটে গেছে ইশরাত জাহান

ধ্যানের মাধ্যমে মনের গভীর স্তরে নিজের জন্যে বা অন্যের জন্যে কোনো কিছু কামনা করলে তা যে কত ফলপ্রসূ হয় তার স্বীকৃতি এ কোর্সে পেলেও বাস্তব প্রমাণ আমি আগেই পেয়েছি।

১৯৯৬ সালে আমার এক বান্ধবী আমাকে এ প্রক্রিয়াটি শিখিয়ে দিয়েছিলেন। আমি তা কাজে লাগালাম। তার তিন বছর পর ১৯৯৯ সালে যখন আমার বাবা প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন মারাত্মক হৃদরোগের কারণে- ডাক্তাররা তার বাঁচার আশা ছেড়ে দিলেন। এমনকি আমরা তাকে তওবা পড়িয়ে তার মৃত্যুর জন্যে মোটামুটি তৈরী হয়েছিলাম। শেষ চেষ্টা হিসেবে ডাক্তাররা একটি অপারেশনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিলেন। সে সময় মনের গভীর স্তর থেকে আমি তার জন্যে প্রার্থনা করলাম। কামনা করলাম তার সুস্থতা। অপারেশনের পর ডাক্তারদের বিস্মিত করে দিয়ে তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠলেন এবং পরবর্তী আট মাস সুস্থ শরীরে বেঁচে ছিলেন।

এরকম আরও কয়েকটি ঘটনা ঘটেছিলো আমার জীবনে। সে সময় আমি ফলপ্রসূ হলেও সংশয়ী ছিলাম। আসলেই কিছু হয়েছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন ছিলো। কিন্তু কোর্সে এসে আমার সংশয় কেটে গেছে। আমি বুঝতে পারছি যে, এটিও একটি স্বীকৃত এবং কার্যকরী পন্থা।

[ইশরাত জাহান গৃহিণী । ১৩৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট ।]

ওষুধ আর খাই নি আহমেদুর রশীদ চৌধুরী

জীবনের এক প্রবল সমস্যা মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছি এ কোর্সে এসে। ২০০২-এর শুরুতে আমি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লাম। তারপর থেকে আজ কার্ডিওলজিস্ট, কাল গ্যাস্ট্রোলজিস্ট তো পরশু সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে দৌড়াচ্ছি।

আমাকে নিয়ে আমার স্ত্রী এবং পরিবারের সদস্যরা ভীষণ উদ্ভিগ্ন। আমার রাড প্রেশার হাই, গ্যাসের সমস্যা। দিন নেই, রাত নেই, সারাক্ষণ শুধু অস্থির হয়ে থাকি। মুঠো ভরে ওষুধ খাচ্ছি। কিন্তু কোনো লাভ হচ্ছে না। ব্যবসারও প্রায় বারোটা বেজে গেল।

এমনি বিপর্যয়ের মধ্যে এ কোর্সে এলাম। পকেট ভর্তি ওষুধ নিয়ে এসেছিলাম। ভাবছিলাম দশ ঘণ্টা বসে থাকব কীভাবে?

কিন্তু সময় কাটতে লাগলো দ্রুত। গুরুজীর বক্তব্যে আমার সমস্যার সমাধান পেলাম। আর কোর্সের চারদিন একটি ওষুধও খাই নি। অথচ আমি খুব ভালো আছি। গত ছ’মাসের শারীরিক-মানসিক যন্ত্রণা থেকে আমি মুক্ত এবং আর্থিক ক্ষতি সামলে ওঠার মনোবলও ফিরে পেয়েছি।

[আহমেদুর রশীদ চৌধুরী ব্যবসায়ী ও লিটল ম্যাগাজিন ‘শুদ্ধস্বরের’ সম্পাদক । ১২৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট ।]

সব সময় প্রো-অ্যাকটিভ থাকতে পারি

রেজা মোহাম্মদ শাহরিয়ার

প্রথমে মেডিটেশন আমাকে সেরকমভাবে নাড়া দিতে পারে নি। কোর্স শেষ করি নি, বাসায় চর্চা করতাম না। বছর খানেক পরে কিছুদিনের জন্যে আগ্রহ ফিরে পেলেও তা স্থায়ী হয় নি। এ সময় কিছু বদঅভ্যাস আমার মধ্যে গড়ে ওঠে। ধূমপান আগেও করতাম। এবার বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্য গ্রহণ করা শুরু করলাম। তিন বছর কিভাবে কেটে গেল টেরই পাই নি। লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়ি। শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ি। ঘরে-বাইরে নানান অশান্তি। মাত্রাতিরিক্ত রাগ, প্রতিশোধস্পৃহা, সন্দেহপ্রবণতা দেখা দেয়। নিজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ি। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে অনেকেই আমার প্রতি বিরূপ হতে থাকে।

প্রচণ্ড হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় ১২৪ ব্যাচে আমি কোর্স রিপিট করি। এবার খুব গুরুত্ব দিয়ে কোর্স করি এবং নিজে নিজেও চর্চা করতে থাকি। প্রথমে আমি নিজেকে ধূমপানসহ সব ধরনের মাদকদ্রব্য থেকে মুক্ত করি। এরপর একে একে শারীরিক ও মানসিক দৃঢ়তা ফিরে পাই, নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে আসে, লেখাপড়ায় নতুন করে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। নিজের প্রতি ও অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ফিরে আসে। রাগ, প্রতিশোধস্পৃহা, সন্দেহপ্রবণতা দূর হয়। এখন আমি সব সময় প্রো-অ্যাকটিভ থাকতে পারি।

[রেজা মোহাম্মদ শাহরিয়ার ৬৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট ।]

ভালো লেগেছে সৃষ্টির সেবা কার্যক্রম নওশের আলী ভূঁইয়া

কোয়ান্টাম পরিবারের সাথে যুক্ত হয়ে সবচেয়ে ভালো লেগেছে এর সৃষ্টির সেবা কার্যক্রম। ১৯৯৮ সালে কোর্স করি। সেবছর দেশে হলো শতাব্দীর সব চাইতে দীর্ঘস্থায়ী বন্যা। তখন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন বন্যা ত্রাণের উদ্যোগ নেয়। পানি বিসৃদ্ধকরণ ট্যাবলেট ও খাবার স্যালাইন সরবরাহের পদক্ষেপ নেয়া হয়। অন্যান্য গ্রাজুয়েট-মাস্টারদের সাথে আমিও ফাউন্ডেশন অফিসে খাবার স্যালাইন তৈরী প্রকল্পে অংশ নেই। এছাড়া ত্রাণ কাজে সাধ্যমতো সহযোগিতা করেছি।

গুরুজী বলেন, কোয়ান্টাম পরিবার একটা গাছের মতো। গাছের পাতা কিছু ঝরে যায়, আবার নতুন পাতা গজায়। কিন্তু ডালগুলো বেড়ে ওঠে। আমি কোয়ান্টামের সাথে ডাল হিসেবে থাকতে চাই, পাতা হয়ে ঝরে যেতে চাই না।

[নওশের আলী ভূঁইয়া ৭৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট ।]

সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি মনোযোগ

মো. বোরহান উদ্দীন

কোর্স করে আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি মনোযোগ। পেশাগত জীবনে এবং ব্যক্তি জীবনে আমি প্রচণ্ড অস্থিরতায় ভুগতাম। কোনো কাজ করতে বসলে পাঁচ/দশ মিনিটেই আমার মনোযোগ কেটে যেত। এমনকি অস্থিরতার এক পর্যায়ে হাঁটাইটি করে নিজেকে কিছুটা শান্ত করতে হতো। এভাবে একেকটা কাজ করতে অনেক সময় লাগতো। এখন আমার মন অনেক শান্ত এবং একাগ্রভাবে কাজ করতে পারছি।

[মো. বোরহান উদ্দীন সাব এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, এলজিইডি । ১৩৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট ।]

কৌতূহল, অতঃপর ফাতেমা সুলতানা মালা

কোর্স করার ব্যাপারে কৌতূহলী ছিলাম। কিন্তু কোর্স করবো শুনে আমার পরিচিতদের কৌতূহল এবং দ্বিধা ছিলো আমার চেয়েও বেশি। কর্মস্থলে আমার ‘বস’ অর্থাৎ স্বয়ং সম্পাদক সাহেবই

ছিলেন সবচাইতে সংশয়ী। নানা রকম প্রশ্ন করছিলেন। আবার কোর্সের দু’দিন পর যখন অফিসে গেলাম, তখন সহকর্মীরা দল বেঁধে আসতে লাগলো। মেডিটেশন করে আমার আকার-আকৃতিতে কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি-না তা দেখতে। কিন্তু আমার সাফল্য হলো, এদের সবার দ্বিধাকে আমি দূর করতে পেরেছি তাদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়ে। কয়েকজনকে কোর্স করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছি। আর সাফল্য ঘোলোকলায় পূর্ণ হলো যখন আমার বস আমাকে বললেন, ‘তোমার কোর্সের কাগজপত্র এক সময় আমাকে পড়তে দিও’। অর্থাৎ তিনিও উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।

[ফাতেমা সুলতানা মালা দৈনিক আজকের কাগজের সহকারী সম্পাদক ও ফ্রি ল্যান্স সাংবাদিক। ১৩৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট ।]

রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছি ডা. হাবীবুর রহমান

ডাক্তারদের ব্যাপারে একটা সাধারণ অভিযোগ হলো, তারা রোগীর কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন না। কখনো কখনো খারাপ ব্যবহার করেন। বাস্তব কারণে মাঝে মাঝে হয়তো এমন হয়।

কিন্তু কোর্সে এসে যখন শুনলাম, ‘রেগে গেলেন, হেরে গেলেন’, আমি ভীষণভাবে উপলব্ধি করলাম কথাটার সত্যতা। এরপর আমার চেম্বারেও লিখে রাখলাম কথাটা। এখন আমি এবং আমার রোগী- দুজনেই খুব চমৎকারভাবে রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি। ইতিবাচক চিন্তা ও কোর্সলব্ধ জ্ঞান দিয়ে আমি আমার সব সমস্যারই সমাধান করতে পারবো বলে বিশ্বাস করি।

[ডা. হাবীবুর রহমান গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক । ১৩৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট ।]

কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্তি

মো. আজম খান

অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নিয়ে কোর্সে এলেও আলোচনা শুনে সব কেটে গেছে। আমার মনে হয় ডিগ্রি পাশ করে আমি যতটা জ্ঞান অর্জন করেছি, এ কোর্স করে আমি তার চেয়েও বেশি জানতে পেরেছি। বিশেষ করে আমার অনেক কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস ছিলো যা এ কোর্সে এসে দূরীভূত হয়েছে।

[মো. আজম খান একজন ছাত্র। চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত ১৩৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট ।]

আমি অবশ্যই পারবো মাহমুদা খাতুন (তামান্না)

কোর্সের দু’দিন পর ছিল আমার বায়োলজি প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা। শীট তৈরীতে এত ব্যস্ত ছিলাম যে, মৌখিক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে পারি নি। পরীক্ষার সময় কোয়ান্টা ভঙ্গি করে ম্যাডামের কাছে গেলাম এবং তিনি একটি মাত্র প্রশ্ন করেই আমাকে ছেড়ে দিলেন।

ছোট এই ঘটনাটিই আমার মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস এনেছে যে, আমি অবশ্যই পারবো।

[মাহমুদা খাতুন (তামান্না) এইচএসসি’র ছাত্রী। ১৩৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট ।]

আমি ভালো আছি আলেয়া হক

মাত্র দশদিন আগে আমার স্টিকটমী সহ তিনটি অপারেশন হয়েছে। এর মধ্যেই এক প্রতিবেশীর কাছে শুনে এই কোর্সে আসার সিদ্ধান্ত নিলাম। পরিবারের সবাই বাধা দিলেও আমার বিশ্বাস ছিলো যে, এখানে এলে আমি খুব তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাবো। কোর্স করে বুঝতে পারলাম আমার মধ্যকার পরিবর্তন। মনে হচ্ছে যেন পুরো সুস্থ আমি। পায়ে প্রচণ্ড ব্যথার কারণে হাঁটতে না পারার যে অসুবিধা ছিলো, তা-ও একদম ভালো হয়ে গেছে। ভালো থাকার এক আনন্দময় অনুভূতি হচ্ছে আমার।

[গৃহিণী আলেয়া হক ১৩৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট ।]

জীবনে অন্তত একজনকে এ কোর্স করাবো

দূরদানা রহমান সিমিন

আমাদের পরিবার কোয়ান্টাম পরিবার। পরিবারের সবার গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আমাকে অবাক করতো। ভাবতাম একটা মানুষের মধ্যে এমন কী গুণ আছে যে, তাকে এতটা ভক্তি শ্রদ্ধা করতে হবে। কোর্স করেই এর জবাব পেলাম। যিনি গভীর জ্ঞানের অধিকারী তিনিই আসলে এতটা ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র। ৪০ ঘটায় ১০ মিনিটের জন্যও বিরক্তি লাগে নি। বরং প্রতিদিন বহুগুণ সজীবতা নিয়ে বাসায় ফিরেছি। এখানকার এত সুন্দর সিস্টেমে আমি মুগ্ধ।

[শিক্ষার্থী দূরদানা রহমান সিমিন ১৫৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট ।]

পরিবারের সবার জন্যে শ্যামল চন্দ্র সরকার

গত চারদিনের কোর্সে গুরুজী আমাদেরকে যা শিখিয়েছেন তাতে আমি আমার জীবনের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি। আমি মনে করি, জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ার জন্যে এ ধরনের কোর্সে পরিবারের প্রত্যেক সদস্যরই অংশ নেয়া উচিত।

[জাতিসংঘ বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচিতে সিনিয়র স্টাফ এসিস্ট্যান্ট শ্যামল চন্দ্র সরকার ১৩৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট ।]

ধর্মানুসারীদের জন্য সহায়ক মো. আবদু মিয়া

কোয়ান্টাম মেথড নিয়ে শংকা ছিল যে, ধর্মের সাথে এর কোনো বিরোধ আছে কি-না? শেষ পর্যন্ত চলে এলাম এবং বুঝলাম বিরোধ তো নেইই, বরং শুধু ইসলাম নয় তা প্রতিটি ধর্মের অনুসারীদের জন্যই সহায়ক। এই সার্বজনীন প্রক্রিয়াটি দলমত নির্বিশেষে সবারই গ্রহণ করা উচিত।

আমি দীর্ঘদিন থেকে হার্টের সমস্যায় ভুগছিলাম। গত চারদিনে বুঝতে পারলাম, ভালো থাকা যায়, সুস্থ হওয়া যায় শুধুমাত্র দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করেই।

[সুনামগঞ্জ সরকারী কলেজের প্রফেসর মো. আবদু মিয়া ১৫৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট ।]

ব্যাকপেইন থেকে নিরাময় তামান্না পারভিন মিমি

আমার ছিলো এক বিশাল নেতিচিন্তার রাজ্য। নানারকম অশুভ চিন্তায় সারাক্ষণ মন খারাপ হয়ে থাকতো। ফলে হতাশা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব,আত্মবিশ্বাসহীনতা আর দুঃখবোধের বিষণ্ণতায় আমি এতটাই ডুবে ছিলাম যে, এ থেকে মুক্তি মিলবে কিছুতেই আর তা ভাবার সাহস পাই নি।

কিন্তু অবিশ্বাস্যভাবে নেতিচিন্তার কু-প্রভাব থেকে নিজেকে বের করে আনতে পেরেছি। এক্ষেত্রে আমাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে অটোসাজেশন। নিয়মিত মেডিটেশনের ফলে শত বাধা-বিপত্তি, দুঃখ-কষ্টের মাঝেও পরম প্রশান্তি অনুভব করছি। শারীরিক ভাবেও স্বস্তি বোধ করছি। নিয়মিত হিলিং মেডিটেশনের মাধ্যমে আট বছরের ব্যাকপেইন থেকে মুক্তি পেয়েছি।

[তামান্না পারভীন মিমি ১২৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট ।]

কোয়ান্টাম বুলেটিন - ৫

১. প্রশ্ন : একই কাজের জন্যে বা সমস্যার জন্যে মেডিটেশন প্রয়োগ করা হলে এবং সেই কাজের জন্যে ধর্মীয় কোনো তদবির বা দোয়া করলে অসুবিধা আছে কি?

উত্তর : কোনো অসুবিধা নেই। বরং মেডিটেশন ভেতলে গিয়ে যদি প্রার্থনা করেন তবে সেটা অনেক বেশি একাগ্রচিত্তে হবে। কারণ প্রার্থনার জন্যে যে একাগ্রতা প্রয়োজন সেটা আপনি মেডিটেশনের মাধ্যমে অর্জন করেছেন। আর মেডিটেশনের শক্তি ও ধর্মীয় শক্তি পরস্পর পরিপূরক। কারণ দুটিই পজিটিভ শক্তি। কাজেই এদের মধ্যে বিরোধের কোনো সম্ভাবনা নেই।

২. প্রশ্ন : কপালের লিখন যায় না খণ্ডন। আমি যদি কোটিপতি হতে চাই আর আমার ভাগ্যে আছে অন্যকিছু। তাহলে কি আমার কোটিপতি হওয়া সম্ভব?

উত্তর : প্রশ্নকর্তাকে জিজ্ঞেস করতে পারি যে, আপনার ভাগ্যে কি আছে তা আপনি কিভাবে নিশ্চিত হলেন? একমাত্র আহাম্মক ছাড়া কেউ একথা বলে না যে, কপালের লিখন যায় না খণ্ডন। কারণ আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীন কোরআন শরীফে স্পষ্ট করে বলেছেন যে, আমি সেই জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করি না যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের জন্যে চেষ্টা না করে। তার মানে কি? চেষ্টা করলে যদি পরিবর্তন হয় এটা ভাগ্য থাকলে কোথায়?

৩. প্রশ্ন : চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং আশু লক্ষ্য এদুটোর মধ্যে কোনটা আগে কোনটা পরে?

উত্তর : প্রথমে সবসময় চূড়ান্ত লক্ষ্য দেখবেন কারণ আপনি যেটাকে চূড়ান্ত লক্ষ্যের পথে আশু লক্ষ্য বলে মনে করছেন সেটা তা না-ও হতে পারে। আপনার সচেতন মন হয়তো বলেছে যে, এই কাজ করলে আমি ঐ ধাপে উঠতে পারবো। কিন্তু তা না-ও হতে পারে। বরং চূড়ান্ত লক্ষ্যের মনছবি দেখলে আপনার অবচেতন মনই বলে দেবে যে, ঐ স্তরে যাওয়ার জন্যে আপনাকে কি কি করতে হবে।

৪. প্রশ্ন : মনছবি কি শুধু বৈষয়িক উন্নতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? মনছবি কি পারস্পরিক সম্পর্ক গভীর করার জন্যে করা যায়?

উত্তর : অবশ্যই। কারও সাথে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করা, কারও সাথে ভুল বোঝাবুঝি দূর করা, সন্তানকে ভুল পথ থেকে সরিয়ে আনা, সবকিছুর জন্যেই মনছবি করা যেতে পারে। অথবা সন্তানের সঙ্গে বা বাবা-মার সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন করা, শিক্ষকের সাথে সম্পর্ক ভালো করা ইত্যাদির জন্যেও মনছবি করা যেতে পারে।

৫. প্রশ্ন : কিভাবে মনছবিকে সাজালে আমি অল্প সময়েই একজন সফল ব্যবসায়ীতে রূপান্তরিত হতে পারি? প্রতিদিন কতবার মনছবি দেখবো?

উত্তর : যে ব্যবসা করতে চান, সে ব্যবসায়ের সবচেয়ে সফল ব্যক্তিকে খুঁজে বের করুন। তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে সে অনুযায়ী কল্পনা করুন। ভাবুন যে, আপনি সফল হয়েছেন। তাহলেই আপনি সফল হবেন। যতবার মেডিটেশন করবেন এবং যতবার মনে পড়বে ততবার আপনি মনছবি করবেন।

৬. প্রশ্ন : আমার এক নিকটাত্মীয়ের কারণে আমার বাবা একটি দুর্ঘটনায় মারা যান। সেই আত্মীয় এখনও আমাদের উপর বিরূপ ভাব পোষণ করেন। আমি কি এর প্রতিশোধ নেবো, না তার সঙ্গে সম্ভাব বজায় রাখবো? আমি তার প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা ও ক্ষোভ পোষণ করি। মন্তব্য করবেন কি? খুব উপকৃত হবো।

আপনার প্রশ্ন

উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

উত্তর : প্রথমত, যদি দুর্ঘটনায় মারা গিয়ে থাকেন, তবে তো কোনো আত্মীয়ের কারণে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে না। দুর্ঘটনা তো সবসময় দুর্ঘটনা। অতএব আপনি যদি মনে করেন আপনার বাবা দুর্ঘটনায় মারা গেছেন তবে এজন্য আত্মীয় দায়ী নয়, দায়ী দুর্ঘটনা। আর যদি মনে করেন যে, এটা কোনো চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রের ফল- সেটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু কারও কারণেই কেউ দুর্ঘটনায় মারা যেতে পারে না। দুর্ঘটনা এমনিই ঘটে থাকে। আর সেক্ষেত্রে প্রতিশোধ নেয়ার কি আছে? তবে আপনি যদি মনে করেন তিনি এখনও আপনার প্রতি বিরূপ ভাব পোষণ করছেন- আপনি তার প্রতি সুন্দর ভাব পোষণ করুন। তার বিরূপ ভাব কেটেও যেতে পারে।

আর দ্বিতীয়ত, কারও প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা ও ক্ষোভ পোষণ করে নিজের কোনো লাভ নেই। তাতে নিজের ক্ষতিই হয়। সেজন্য ঘৃণা ও ক্ষোভ বাদ দিন। আর তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করাটা যদি আপনি বিপজ্জনক মনে করেন, সম্পর্ক রাখবেন না। কিন্তু তার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করবেন না। আর যদি মনে করেন যে, তিনি আপনার বাবার মৃত্যুর জন্যে দায়ী তবে সে প্রতিশোধের ভার প্রকৃতির উপর ছেড়ে দিন, কারণ প্রকৃতি সবচেয়ে নির্মম প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

৭. প্রশ্ন : মেডিটেশনে আধ্যাত্মিকতা চলে আসছে। আমি বস্তগত সাফল্য প্রত্যাশা করছি। কিভাবে সমন্বয় করবো?

উত্তর : বস্তগত সাফল্য কামনা করুন। বস্তগত সাফল্যের সাথে আধ্যাত্মিকতার কোনো দ্বন্দ্ব নেই। কারণ যিনি বস্তগত সাফল্যের ক্ষেত্রে তৃপ্ত নন, তিনি আধ্যাত্মিকতায়ও সফল হতে পারেন না। অতএব বস্তগত সাফল্য যে কোনো সাফল্যের জন্যে প্রয়োজন।

৮. প্রশ্ন : মেডিটেশন করার পর নিজেকে এখন অনেক সম্পূর্ণ মনে হয়। ভালো মানুষ বলে মনে হয়। কিন্তু মাঝে মাঝে আবার কুচিন্তা মাথার ভেতর নাড়াচাড়া দিয়ে ওঠে। তখন কি করবো?

উত্তর : তখন তওবা করবেন। আর মনে রাখবেন আপনি মানুষ। মাঝে মাঝে যদি কুচিন্তা, দুশ্চিন্তা বা

খারাপ চিন্তা না আসে তাহলে আপনি মানুষ হতেন না। আর স্রষ্টা তো তওবার পথ রেখেছেন। অতএব সম্পূর্ণ মানুষ হওয়ার পরও পৃথিবীতে আসলে কেউ পারফেক্ট মানুষ নয়। তার ভুল হবে, দোষ হবে। বুদ্ধিমানরা কখনো একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করে না। আর আহাম্মকরা একই ভুল বার বার করে। অতএব যখনই ভুল করছেন, তওবা করবেন। নিজের কাছে অনুতপ্ত হবেন, অনুশোচনা করবেন, তারপর ভুলে যাবেন। এটাকে সিন্দাবাদের ভূতের মতো বয়ে বেড়াবেন না।

৯. প্রশ্ন : একজন ডায়াবেটিকের রোগী যদি মেডিটেশন করে, তবে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ইনসুলিন ট্যাবলেট বা ইনজেকশন নেয়া বন্ধ করবে কি-না বা ব্যায়াম করা বন্ধ করবে কিনা?

উত্তর : মেডিটেশন শুরু করার পর ধীরে ধীরে ওষুধের মাত্রাটা কমিয়ে দিন এবং ১৫ দিন পরে তা বন্ধ করে দিন।

১০. প্রশ্ন : চুষক পানির উপকারিতা কি?

উত্তর : পানীয় হিসেবে চুষক পানিকে পানির রাজা বলা যেতে পারে। গ্যাস্ট্রিক, আলসার এবং পেটের সমস্ত রকম পীড়ায় চুষক পানি অত্যন্ত উপকারী। দ্বিতীয়ত, এটা দেহের ফ্লাশিং সিস্টেমকে অত্যন্ত সুন্দর রাখে। এতে দেহের ভেতর বর্জ্য পদার্থ জমে থাকতে পারে না এবং চুষক পানি যদি নিয়মিত পান করা যায় তাহলে শরীরের মধ্যে কোনো ধরনের পাথর জমার সম্ভাবনা থাকে না।

১১. প্রশ্ন : প্রত্যয়ন দ্বারা আমার কোটিং সেন্টারের ছাত্র বাড়ানো কি সম্ভব?

উত্তর : কোটিং সেন্টার করেছেন তো ছাত্র বাড়ানোর জন্যেই। নিজেকে একজন ভালো শিক্ষক হিসেবে বিশ্বাস করুন, প্রত্যয়ন করুন। তখন আর আপনাকে ছাত্রের পেছনে দৌড়াতে হবে না, ছাত্রই আপনার পেছনে ঘুরবে। কারণ ছাত্ররা তো ভালো শিক্ষককেই খুঁজে বেড়ায়। তাই কোটিং সেন্টারের ভালো শিক্ষক হওয়ার পরে আর কোনো যোগ্যতা লাগে কি ছাত্র বাড়ানোর জন্যে? অতএব আপনার প্রত্যয়ন হবে যে, আমি একজন ভালো শিক্ষক।

১২. প্রশ্ন : বাস্তব পরিবেশ নেগেটিভ। কোনো প্রকার পরিবর্তনের কোনো পথ নেই। তবে সেইসব পরিস্থিতি কীভাবে অতিক্রম করবো?

উত্তর : আসলে এটা একটা ভুল ধারণা যে, পরিবর্তনের কোনো পথ নেই। পৃথিবীতে কোনো কিছু, কোনো পরিস্থিতিই স্থায়ী নয়, দুঃখও স্থায়ী নয়। সমস্যাও স্থায়ী নয়। সমস্যা স্থায়ী হয় কখন? যখন সমস্যাকে সংকট মনে করেন। কনফুসিয়াস খুব চমৎকারভাবে বলেছেন, যাকে আপনি সমস্যা মনে করছেন, সেটাকে যদি বিশ্লেষণ করেন তবে তার মধ্যে থেকেই সমাধানের বীজ বেঁটিয়ে আসবে।

অতএব বুদ্ধিমানরা কখনো বাস্তব পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয় না, তারা বাস্তবতা তৈরি করে। পৃথিবীতে প্রতিটি সফল মানুষ বাস্তবতা তৈরি করেছে। কাজেই পরিবর্তনের কোনো পথ নেই, এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। আপনি বড়জোর এটা বলতে পারেন যে, আমি এ মুহূর্তে ইতিবাচক পরিবর্তনের কোনো লক্ষণ দেখছি না। আর এখন থেকে সবসময় মনে করবেন- যে কোনো অবস্থাকে পরিবর্তন করা যায়। পরিবর্তনটা ভালোর দিকে যাবে না মন্দের দিকে যাবে সেটা নির্ভর করবে আপনার উপর। আপনি ইচ্ছে করলে ভালোর দিকে পরিবর্তন করতে পারেন আর ইচ্ছে না করলে খারাপের দিকে পরিবর্তন হতে পারে।

আপনার প্রশ্ন পাঠান

কোয়ান্টাম বুলেটিনের পাঠকদের জন্যে আনন্দের সংবাদ এই যে, মেডিটেশন সম্পৃক্ত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্যে শুরু হয়েছে প্রশ্নোত্তর বিভাগ।

দ্রুত আপনার প্রশ্ন পাঠান এই ঠিকানা : প্রশ্নোত্তর বিভাগ, কোয়ান্টাম বুলেটিন, ১১৯/পি শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭।

এছাড়া বুলেটিন সম্পর্কে আপনার পরামর্শ ও মতামতও পাঠাতে পারেন।

যোগ ব্যায়াম সংক্রান্ত মত বিনিময় অনুষ্ঠানে মা-জী কোয়ান্টাম ব্যায়াম যোগ ব্যায়ামেরই সহজতম রূপ

যোগ ব্যায়াম হচ্ছে এমন এক ধরনের ব্যায়াম চর্চা যার প্রতিটি আসন একইসাথে দেহের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক- একাধিক অঙ্গের উপকার সাধন করে। আর কোয়ান্টাম ব্যায়াম এই যোগব্যায়ামেরই সহজতম রূপ, যা দীর্ঘ এক যুগের ব্যক্তিগত চর্চা ও প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফসল। গত ৩১ মে ২০০৩ ঢাকার কাকরাইলস্থ কোয়ান্টাম মেডিটেশন হলে কোয়ান্টাম ব্যায়াম কোর্সে বিভিন্ন সময় অংশগ্রহণকারী মহিলাদের সাথে এক মতবিনিময় অনুষ্ঠানে একথা বলেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক মা-জী নাহার আল বোখারী।

বিকেল ৪টায় প্রোগ্রাম শুরু হয় এবং চলে সন্ধ্যা ৬:৩০ পর্যন্ত। এতে অংশ নেন প্রায় ৮০ জন মহিলা, যারা বিভিন্ন সময় কোয়ান্টাম ব্যায়াম কোর্স করেছেন বা করছেন। মূলত ব্যায়াম সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা ও প্রশ্নের উত্তর প্রদান এবং মতবিনিময়ের উদ্দেশ্যে প্রথমবারের মতো এ ধরনের কোনো অনুষ্ঠান আয়োজিত হলো। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক।

অনুষ্ঠান শুরু হয় শিখিলায়ন মেডিটেশনের মধ্য দিয়ে। মেডিটেশন পরিচালনা করেন শ্রদ্ধেয়া মা-জী। এরপর আপ্যায়ন এবং বিরতির আগে ও পরে ১ ঘণ্টাব্যাপী তিনি ব্যায়াম ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন লিখিত প্রশ্নের জবাব দেন। এসব প্রশ্নোত্তরের

মাধ্যমে অনেকে ভুল ধারণা থেকে মুক্ত হয়েছেন। পেয়েছেন বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান। তাছাড়া বিভিন্ন যোগাসনের উপকার সম্বন্ধেও জেনেছেন তারা এ আলোচনা থেকে।

সবশেষে প্রধান অতিথির বক্তব্যে গুরুজী বলেন, আমাদের দেশের মহিলাদের স্বাস্থ্যসমস্যার ৯০ ভাগই ঘটে থাকে মানসিক কারণে যা আসলে উদ্ভূত হয়েছে তাদের পরনির্ভরশীল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। অসুস্থতার অজুহাতে অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে তারা আরও বেশি অসুস্থ হয়। গুরুজী বলেন, এ থেকে মুক্তির জন্য ভাবতে হবে, আমি মেয়ে বা মহিলা নই, আমি মানুষ, আমার স্বকীয়তা নিয়েই স্বনির্ভর হয়ে আমাকে বাঁচতে হবে। তাহলেই আর অসুস্থতা কাবু করতে পারবে না।

গুরুজী বলেন, ব্যায়ামের কিছু আসন টেনশন কমিয়ে শারীরিক শক্তিকে ভীষণভাবে বাড়িয়ে দেয়, যেমন শিখিলায়ন, শবাসন, গোমুখাসন, পদ্মাসন ইত্যাদি। সেই সাথে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের জন্যে বাড়তে হবে আত্মার ঔজ্জ্বল্য যা রাগ ক্ষোভ হিংসামুক্ত এক সুন্দর মন তৈরির মাধ্যমে সম্ভব।

এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা বলছিলেন মাস্টার্সের ছাত্রী বীথি যিনি সম্প্রতি ব্যায়ামের কোর্সে ভর্তি হয়েছেন। তিনি বলেন, খুব ভালো লাগছে, ব্যতিক্রমী এ অনুষ্ঠানে এসে অনেক কিছু জানতে পারলাম। সানজীদা আফরীন ক্লাস নাইনে পড়ছে। ক্লাস সিক্সে পড়ার সময় ব্যায়ামের কোর্স করার পর কিছুটা অনিয়মিত হয়ে পড়েছিলো। এ অনুষ্ঠানে এসে সে আবার নতুন করে চর্চা শুরু করার ব্যাপারে আগ্রহী হয়েছে। চারুকলার ছাত্রী ফারহানা ইয়াসমীন নিপুও বলছিলেন, কোয়ান্টামের আর সব প্রোগ্রামের মতো ব্যায়ামের কোর্সটিকেও খুব ফলপ্রসূ মনে হয়েছে যার প্রমাণ হচ্ছে শুধু তরুণ-তরুণীরাই নন,

এ কোর্সে এসে উপকৃত হচ্ছেন অনেক মধ্যবয়সী এবং প্রবীণরা- কোয়ান্টাম ব্যায়াম যাদের দৈহিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ইন্টেরিয়র ডিজাইনিং-এর ছাত্রী সাবরিনা জেসমিন তিথির উপলব্ধি এরকম, আমরা মেয়েরা অহেতুক অন্যের উপর নির্ভর করতে চাই বলেই এত সমস্যা। অথচ এই মানসিকতাকে বেড়ে ফেলে যদি স্বনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারি তাহলেই আর কোনো সমস্যা থাকে না।

প্রতিবেদক : রাবেয়া নাজনীন

বিপুল উপস্থিতিতে মুখরিত শাখা সেলগুলো

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন শাখা ও সেল এখন কাজ করছে পূর্ণ গতিতে। বিপুল সংখ্যক কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট, মাস্টার ও অতিথিদের অংশগ্রহণে মুখরিত হয়ে উঠছে শাখা সেলগুলোর প্রতি শুক্রবার সকালের নিয়মিত প্রোগ্রাম- যৌথ মেডিটেশন ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রম মিলিয়ে এক/দেড় ঘণ্টার সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান। প্রায় প্রতিটি শাখাতেই এখন গভবছরের চেয়ে উপস্থিতির হার ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ বেশি। যৌথ মেডিটেশন ছাড়াও এই সাপ্তাহিক কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে নিয়মিত ও বিশেষ বিষয়ভিত্তিক আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, ফাউন্ডেশন সংবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে জানার সুযোগ। এছাড়া নিয়মিত বিরতিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ব্রাদ ক্যাম্প ও শাখার দায়িত্বশীল ওয়ার্কশপ। এসব কার্যক্রমের কারণে এখন মিরপুর, মতিঝিল, সবুজবাগ, হাতিরপুল, লালবাগ, গোগুরিয়া, ওয়ারী, কুড়িল, উত্তরা ইত্যাদি শাখা ও সেলগুলোতে অংশগ্রহণকারীদের আগ্রহ লক্ষ্য করার মতো।

প্রতিবেদক : রাবেয়া নাজনীন

আমার বাচ্চা একদম খাচ্ছে না এ ধারণা ত্যাগ করুন

অধিকাংশ বাবা-মার অভিযোগ যে, তাদের বাচ্চারা একদমই খায় না। কিন্তু খাওয়ার পূর্বশর্ত হিসেবে কতগুলো বিষয় খুবই জরুরী। প্রথমত বাচ্চার ক্ষুধা লাগতে হবে। অথচ ক্ষুধা পাবার আগেই যদি বাচ্চাকে খাবার নিয়ে পীড়াপীড়ি করা হয় তবে তার খাবারের প্রতি অনীহা জন্মাবে।

অনেক সময় অভিভাবক অন্ধ স্নেহের বশবর্তী হয়ে বাচ্চা সুস্থ থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাওয়াতে চান; এক্ষেত্রে সমস্যাটা বাচ্চার নয় বরং তার বাবা-মার। আর যে কোনো মানুষের মতো শিশুরও ক্ষুধা নির্ভর করে তার শরীরের চাহিদা অনুপাতে। আর চাহিদা ঠিক হয় তার শরীরের গড়ন অনুযায়ী। এই না খাওয়ার অভিযোগটা বেশি আসে যাদের খাওয়ানোর সামর্থ্য রয়েছে তাদের কাছ থেকে। যাদের অভাব রয়েছে তারা কিন্তু এ ধরনের অভিযোগ করে না।

আধুনিক শহুরে পরিবেশ বাচ্চাদের খাবারের অনীহার ব্যাপারে অনেকটা দায়ী। যেহেতু শহরে খেলার মাঠের অভাব রয়েছে তাই বাচ্চারা বাধ্য হয়েই সারাক্ষণ টিভির সামনে বসে থাকে। অতিরিক্ত টিভি দেখার ফলে তার মন একমুখী হয়ে যায়, শারীরিক পরিশ্রম কমে যায় এবং তার মধ্যে নেশা বা আসক্তি তৈরি হয়। এসব কারণে তার ক্ষুধা নষ্ট হতে পারে।

পারিবারিক পরিবেশটা এক্ষেত্রে খুবই

গুরুত্বপূর্ণ। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি সমঝোতা না থাকে, বাসার লোকজনের আচরণ যদি বৈরী ভাবাপন্ন হয় তাহলে সে সব শিশুর কোমল মনের উপর প্রভাব ফেলে এবং খাবার রুচিতেও নেগেটিভ বা নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

মা-বাবার জন্য টিপস :

খাওয়া নিয়ে পীড়াপীড়ি করবেন না। খিদে কি জিনিস সেটা তাকে বুঝতে দিন।

ঘন ঘন খাওয়ানোর চেষ্টা করবেন না। দুই খাবারের মাঝখানে কমপক্ষে দুই থেকে তিন ঘণ্টার বিরতি দিন।

পরিবারের সবার সঙ্গে বসিয়ে শিশুকে খেতে দিন।

জাকফুড (ফাস্টফুড জাতীয়) খাবার থেকে শিশুকে দূরে রাখুন।

শিশুর প্রস্রাব-পায়খানা ও প্রোথ চার্ট অনুযায়ী তার ওজন ঠিক থাকলে, সে হাসিখুশি ও প্রাণবন্ত থাকলে তার খাওয়া নিয়ে আর দুশ্চিন্তা করবেন না।

শিশুর জন্য টিনজাত খাবার এড়িয়ে চলুন, এগুলো শিশুকে মোটাসোটা করে, কিন্তু পর্যাণ্ড পুষ্টি দিতে পারে না।

টেলিভিশন দেখিয়ে বা অন্য কোনো কিছুতে তার মনোযোগ নিয়ে খাওয়ানোর চেষ্টা করবেন না। এতে খাওয়ার প্রতি তার স্বাভাবিক মনোযোগ থাকবে না।

বাচ্চার খাওয়া নিয়ে বাব-মার যে উদ্বেগ, তা অনেকখানিই অমূলক। শিশুর খাবার ব্যাপারে যথাসময়ে বাবা-মার যথাযথ সচেতনতাই শিশুকে খাবারে আগ্রহী করে তুলবে। (সংকলিত)

কেন্দ্রীয় কার্যক্রম

কোয়ান্টায়ন বা মৌন সাধনা : আত্মোপলব্ধি ও ধ্যানের গভীরতা বৃদ্ধির জন্যে শান্তিনগরস্থ কেন্দ্রীয় সেমিনার কক্ষে প্রতি শুক্র, শনি ও মঙ্গলবার সকাল ৯.৩০ থেকে ৫.৩০ পর্যন্ত কোয়ান্টায়ন বা মৌন সাধনা অনুষ্ঠিত হয়।

কোয়ান্টাম ব্যায়াম : দৈহিক আত্মিক ও মানসিক উন্নয়নের জন্যে কেন্দ্রীয় দফতরে কোয়ান্টাম ব্যায়ামের ক্লাস হয় প্রতি রবি ও বুধবার বিকেল ৪.৩০ থেকে ৫.৩০।

কোর্স ফি : গ্রাজুয়েট ৫০০ টাকা ও নন গ্রাজুয়েট ১০০০ টাকা।

যৌথ মেডিটেশন : একক মেডিটেশনের চেয়ে যৌথ মেডিটেশন অনেক বেশি ফলপ্রসূ। ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় সেমিনার কক্ষে প্রতি সোমবার সকাল ১১.৩০, বিকেল ৫টা ও সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে সাপ্তাহিক যৌথ মেডিটেশন হয়।

সাইকি কোর্স ও হিলিং মেডিটেশন : অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা শাণিত করার জন্যে কেন্দ্রীয় ধ্যানঘরে প্রতি বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা থেকে ৬টা পর্যন্ত সাইকি কোর্স অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ৩ মাসে সপ্তাহে ১ দিন করে মোট ১২টি ক্লাসের এই কোর্সের ফি : সাধারণ ১০০০ টাকা, শিক্ষার্থী ৫০০ টাকা।

শাখা-সেলের কার্যক্রম : সারা দেশের বিভিন্ন শাখা-সেলে প্রতি শুক্রবার সকাল ৯.৩০ মিনিটে যৌথ মেডিটেশন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রাচ্যের ধ্যান : পাশ্চাত্যের নতুন উপলব্ধি

মেডিটেশন হচ্ছে জীবন যাপনের বিজ্ঞান। এ বিশ্বাস গত তিন দশক ধরে ধারণ ও লালন করছে কোয়ান্টাম। পাশ্চাত্যের সমাজে ও মিডিয়ায় এখন তারই সুরে বাজছে মেডিটেশনের জয়ধ্বনি।

কোলাহলমুক্ত একটি ঘর। আধো আলো, আধো অন্ধকার। চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। আপনি এখন বাইরের জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ডুব দেবেন নিজের ভেতরে। লম্বা দম নিয়ে দমের ওপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে পৌঁছে যাবেন ধ্যানের স্তরে। আপনার প্রয়োজন অনুসারে ইতিবাচক কথার বারবার পুনরাবৃত্তি করে আপনি এখন দিনের কাজ শুরু করবেন। এভাবে মেডিটেশন বা আত্মউন্নয়নমূলক ধ্যানের ব্যাপারটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দিন দিন জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। বর্তমানে সেখানে এক কোটি মানুষ নিয়মিত মেডিটেশন করছেন যা নব্বই দশকের দ্বিগুণ। মেডিটেশন এখন তাদের স্মার্টনেসের একটি অংশ। মেডিটেশনে অবিশ্বাসীরা পরিণত হচ্ছেন সংখ্যালঘুতে। ডাক্তাররা এখন মেডিটেশনকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। কারণ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ইদানীং প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে মেডিটেশন কাজ করে। আমেরিকার অধিকাংশ ডাক্তারই এখন রোগ প্রতিরোধ, রোগের প্রকোপ কমিয়ে আনা বা রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্যে মেডিটেশনকে সহায়ক ভাবছেন। বিশেষ করে দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা উপশম, হৃদরোগ নিয়ন্ত্রণ, উচ্চরক্তচাপ কমিয়ে আনা, চর্মরোগ, ক্যান্সার কিংবা বন্ধ্যাত্ম মোকাবেলায় মেডিটেশনের সাহায্য নিচ্ছেন।

হতাশা, অমনোযোগ, অস্থিরতা, অস্বাভাবিক আচরণ এসব মানসিক সমস্যা নিয়ে অনেক রোগী ডাক্তারের কাছে আসেন। বিশেষজ্ঞরা তাদের সুস্থতার জন্যে এখন মেডিটেশনকেই সফল ওষুধ হিসেবে মনে করছেন।

তিব্বতীয় ধর্মগুরু দালাইলামা এবং একদল স্নায়ু বিজ্ঞানীর কথোপকথন নিয়ে 'ডিসট্রাকটিভ ইমোশনস' নামক বইতে ডানিয়েল গোলম্যান বলেন, গত ত্রিশ বছরে মেডিটেশন নিয়ে গবেষণায় এখন এটা স্বীকৃত যে, টেনশন বা স্ট্রেস উপশমে মেডিটেশন একটি প্রতিষেধক। নতুন গবেষণায় আধুনিক ইমেজিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারছেন মেডিটেশন মনকে নিয়ন্ত্রণ এবং মস্তিষ্কের কর্ম কাঠামো পরিবর্তন করতে পারে (Can train the

mind and reshape the brain)।

অধিকাংশ আমেরিকান দীর্ঘায়ু লাভ করতে এখন মেডিটেশনের দিকে ঝুঁকছেন। গবেষক ডা. ডীন অরনিশের মতে মেডিটেশন, যোগ ব্যায়াম এবং পরিমিত আহার সম্মিলিতভাবে দীর্ঘায়ুতে সহায়ক। হৃদ রোগ নিরাময়ে অরনিশের প্রক্রিয়া সর্বজন বিদিত। সম্প্রতি



আমেরিকার ইউরোলজিক্যাল সমিতির সম্মেলনে তিনি তাঁর সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল ঘোষণা করেন, মেডিটেশন প্রস্টেট ক্যান্সার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। মেডিটেশন এখন বিশ্বজুড়ে স্বাস্থ্য সেবার অন্যতম স্বীকৃত পদ্ধতি।

গভীর ধ্যানাবস্থায় শরীরের মতো মস্তিষ্কেও সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটে। গত শতাব্দীর ৬০ থেকে ৭০

দশকের মধ্যে এ নিয়ে প্রথম বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে, মেডিটেশন চর্চাকারীরা খুব সহজেই নির্দিষ্ট একটা কিছুতে মনকে কেন্দ্রীভূত করতে পারেন।

মেডিটেশন চর্চা বাড়ার সাথে সাথে এখন এর প্রক্রিয়াগুলো অনেক সহজ হয়ে গেছে। ধ্যানী হওয়ার জন্যে এখন কাউকে জঙ্গলে বা পাহাড়ের গুহায় শূশ্রুধারী গুরুর কাছে যেতে হয় না। বরং মার্কিন সমাজে এটি একটি নিত্য দিনের ব্যাপার। স্কুল, হাসপাতাল, করপোরেট অফিস, সরকারি কার্যালয়গুলোতে মেডিটেশন হচ্ছে। জেলখানা, বিমান বন্দরে রয়েছে মেডিটেশনের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা।

আইওয়া অঙ্গরাজ্যের মহাশ্বষি ইউনিভার্সিটির অধীনস্থ কলেজ এবং স্কুলগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীরা দিনে দু'বার মেডিটেশন করছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে খেলোয়াড়দের জন্যে মেডিটেশন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

আমেরিকায় এখন জনপ্রিয় মেডিটেশন প্রক্রিয়াগুলো হচ্ছে জেন, বিপাসন, টি এম ও প্রাচ্যের অন্যান্য ধ্যান পদ্ধতি।

মূলধারার জনগণের পাশাপাশি মেডিটেশনকারীদের দলে বিখ্যাতরাও নাম লিখিয়েছেন। এদের মধ্যে আছেন ফোর্ড মটরসের প্রধান ধনকুবের বিল ফোর্ড, সাবেক মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট আল গোর দম্পতি, হিলারী ক্লিনটন, শোবিজ তারকা গোল্ডি হন, শানিয়া টোয়েন, হিদার গ্রাহাম, রিচার্ড গিয়ার প্রমুখ। এদের প্রত্যেকেই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে মেডিটেশনের সফল ব্যবহার করছেন।

পৃথিবীতে কবে থেকে মেডিটেশন বা ধ্যান শুরু হয় তার সঠিক সময়কাল এখনো অজানা। তবে মেডিটেশনের সূতিকাগার হচ্ছে প্রাচ্য। প্রাচ্যের সাধকরা ধ্যানের যে শক্তিকে নিজের ও অন্যের

কল্যাণে ব্যবহার করেছেন

একবিংশ শতাব্দীতে এসে তাকে পাশ্চাত্য নতুন উদ্যমে বরণ করছে। শারীরিক, মানসিক, আত্মিক প্রশান্তির জন্যে প্রতি দিনের ব্যস্ততার মাঝেও কিছু সময় ব্যয় করেছে মেডিটেশনের পেছনে। কয়েক বছর আগেও যা ছিলো আধ্যাত্মিকতার রহস্যে আবৃত, তা-ই এখন পরিণত হয়েছে 'দি সাইন্স অব মেডিটেশন'-এ।

[টাইম ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ কাহিনী 'দি সাইন্স অব মেডিটেশন'-এর ভাব সংক্ষেপ : রোকেয়া হক] □

কোয়ান্টাম বুলেটিন : সেপ্টেম্বর ২০০৩। সম্পাদক : কাজী মাহতাব উদ্দিন আহমদ ॥ নাহার আল বোখারী, পরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ১১৯/পি শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥

Phone : 9341441, 8319377, 0171-671858 E-Mail : info@quanfey.org Web Site : www.quantumbd.org

সেপ্টেম্বর মাসে ৯৮৭ ব্যাগ রক্ত সরবরাহ

গত সেপ্টেম্বর মাসে কোয়ান্টাম ল্যাব সর্বমোট ৯৮৭ ইউনিট রক্ত সরবরাহ করেছে। এ যাবত কালে যা সর্বাধিক। এর মধ্যে হোল ব্লাড ৬৬৯ ইউনিট, রেড সেল কনসেন্ট্রেট (আরসিসি) ২৪৫ ইউনিট, ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা ৩৩ ইউনিট, প্লাটিলেট কনসেন্ট্রেট ২৬ ইউনিট, ক্রায়ো প্রিসিপিটেট ৮ ইউনিট এবং প্লাটিলেট রিচ প্লাজমা ৬ ইউনিট।

উল্লেখ্য যে, গত জুলাই মাসে ল্যাবে সেল সেপারেটর সেক্টিফিকেশন মেশিন, -৮৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রার ডিপ ফ্রিজ, এলাইজা মেশিন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযুক্ত হওয়ার পর রক্ত উপাদান বিয়ুক্তির পরীক্ষামূলক কাজ শুরু হয়।

সফল পরীক্ষা শেষে আগস্টের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে রোগীদের চাহিদা অনুযায়ী রক্তের সকল উপাদান সরবরাহ শুরু হয়। ফলে এখন প্রতিদিন রক্ত উপাদানের জন্যে রোগীদের ভীড় বাড়ছে।

প্রতিবেদক : রোকেয়া হক

ভলান্টারী সেফ ব্লাড প্রোগ্রাম এপ্রিসিয়েশন কোর্স

আগামী ৫ ডিসেম্বর শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ঢাকার কোয়ান্টাম মেডিটেশন হলে প্রথম বারের মতো ভলান্টারী সেফ ব্লাড প্রোগ্রাম এপ্রিসিয়েশন কোর্স অনুষ্ঠিত হবে। গ্রাজুয়েটরা এ কোর্সে অংশগ্রহণের জন্যে নাম নিবন্ধন করতে পারেন।

অক্টোবর-নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসের কর্মসূচি :

ঢাকায় ১৬৯ ব্যাচের কোর্স :

১৭, ১৮, ১৯ ও ২০ অক্টোবর (শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

রাজশাহীতে গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ :

১৪ অক্টোবর (মঙ্গলবার)

রাজশাহীতে ১৭০ ব্যাচের পরিচিতি সভা :

১৫ অক্টোবর (বুধবার)

রাজশাহীতে ১৭০ ব্যাচের কোর্স :

২৪, ২৫, ২৬ ও ২৭ অক্টোবর (শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

ঢাকায় ১৭১ ব্যাচের পরিচিতি সভা :

১০ ডিসেম্বর (বুধবার)

ঢাকায় ১৭১ ব্যাচের কোর্স :

১৯, ২০, ২১ ও ২২ ডিসেম্বর

ঢাকায় গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ :

১২ ডিসেম্বর (শুক্রবার)

কোয়ান্টাম বুলেটিন



অক্টোবর ২০০৩

চট্টগ্রামে গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপে গুরুজী

পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক মমতা ও ভালবাসাই পারিবারিক শান্তির মূল



পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক মমতা ও ভালবাসাই পারিবারিক শান্তির মূল ভিত্তি। আর এক্ষেত্রে পরিবারের মা-বাবার প্রতি মমতা ও আনুগত্য হলো এক অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। কারণ যে কোনো সুসম্পর্কের মতো পারিবারিক সুসম্পর্কও আবর্তিত হয় একটি আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুকে ঘিরে, পরিবারে যা হলেন মা এবং বাবা।

গত ১৯ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন চট্টগ্রাম সেন্টারের আয়োজনে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শাহ আলম বীর উত্তম মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত “সুসম্পর্ক ও সুখী পরিবার” শীর্ষক ওয়ার্কশপে গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক একথা বলেন।

দিনব্যাপী এ ওয়ার্কশপে প্রায় পাঁচ শতাধিক গ্রাজুয়েটের উপস্থিতি ছিলো এ পর্যন্ত চট্টগ্রাম সেন্টারের ওয়ার্কশপে সর্বাধিক অংশগ্রহণ। তাদের অনেকেই প্রথমবারের মতো ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন।

পরিবার প্রথাকে গুরুত্ব দেয়ার ব্যাপারে প্রাচ্যের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে গুরুজী বলেন, পাশ্চাত্যের জৈবিক ও ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির নির্মম শিকার হলো পরিবার, যেখানে পরিবার প্রথা

ধ্বংস হওয়ার সাথে সাথেই পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বখাটে মাদকাসক্ত ও অপরাধীদের দৌরাভ্য। কারণ পরিবারের স্নেহ বঞ্চিত আদর্শচ্যুত সন্তানের পক্ষে যথাযথ ‘মানুষ’ হয়ে ওঠা খুব কঠিন।

গুরুজী বলেন, পরিবার গঠনের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করতে হলে এর চারটি উদ্দেশ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে। আর তাহলো, জৈবিক উদ্দেশ্য, বংশধারা রক্ষা, হৃদয়ের প্রয়োজন পূরণ এবং আত্মিক আধ্যাত্মিক অর্জন।

তিনি বলেন, নর-নারীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো যদি সামনে রাখা যায়, যদি অনায়াসে কিছু প্রত্যাশা করা থেকে বিরত থাকা যায় এবং ‘কি পেতে পারি’ তা নয় বরং ‘কি দিতে পারি’ এই চিন্তাটাকেই প্রাধান্য দেয়া যায় তাহলেই গড়ে উঠবে এমন পরিবার যা সবসময় সাফল্য ও প্রশান্তিকেই আকর্ষণ করবে।

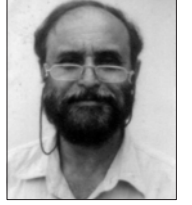
ওয়ার্কশপে প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও মেডিটেশন ছাড়াও দীর্ঘ প্রশ্নোত্তর পর্বে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা পেয়ে বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছেন এমন অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন অনেকেই।

প্রতিবেদক : রাবেয়া নাজনীন

আত্মবিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা

কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা

দীর্ঘ জীবনের
এই পথ
পরিক্রমায় বহু
মানুষের
সংস্পর্শে এলেও
এই কোর্সের
মাধ্যমে গুরুজীর
সান্নিধ্যে আসা



আমার জীবনের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কারণ তাঁর কাছ থেকে আমি শিখেছি কীভাবে আত্মবিশ্বাসের প্রক্রিয়াটি নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, প্রজ্ঞার অনুভূতিকে বাস্তবের মতো করে কীভাবে উপলব্ধি করা যায়।

একজন কবি হিসেবে বাংলাভাষার অন্যান্য সমকালীন কবি বা বিভূজনদের ভাবনার সাথে পরিচিত হবার সুযোগ ঘটেছে। আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, যে ‘অনন্য মানুষের’ ধারণা আমি এখানে এসে পেয়েছি তা তারাও কোনো না কোনো ভাবে বলেন, কিন্তু এই ‘অনন্য মানুষে’ পরিণত হওয়ার বাস্তব প্রক্রিয়াটি আর কেউ শেখান নি, যা এখানে পেলাম।

হোমিওপ্যাথি চর্চাতেও আমার যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে এবং এর জন্যে খানিকটা পরিচিতিও আছে। অনেক



মিসেস সাইদা হুদা

বহুর আগে যখন আমার স্ত্রী রোগী হিসেবে মাইগ্রেনের কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে আমার কাছে এসেছিলেন তখন চিকিৎসার মাধ্যমে তাকে আমি সুস্থ করতে পেরেছিলাম। কিন্তু আমাদের ওষুধ সেই উপশমকে স্থায়ী করতে পারে নি, আবারও তিনি মাইগ্রেনে আক্রান্ত হন। সেইসাথে ব্যাকপেইন ও সাইনাসের সমস্যা। অথচ কোর্সের এই চারদিন কোনোরকম ওষুধ ছাড়া, কলার গার্ড ছাড়াই তাকে ব্যথামুক্ত দেখে এখন আমার মনে হচ্ছে যেকোনো রোগকে বা সমস্যাকে শুধু সাময়িক উপশম নয় স্থায়ীভাবে সমাধান করার এক কার্যকরী উপায় হতে পারে মেডিটেশন।

[জাতিসত্তার কবি হিসেবে পরিচিত মুহম্মদ নূরুল হুদা বাংলা সাহিত্যে অসামান্য অবদানের জন্যে বাংলা একাডেমী পুরস্কার, আলাওল সাহিত্য পুরস্কার, যশোর সাহিত্য পরিষদ পুরস্কার, হুমায়ুন কাদির স্মৃতি পুরস্কার, কল্পবাজার সাহিত্য একাডেমী পুরস্কারসহ দেশ-বিদেশের বহু পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। বর্তমানে বাংলা একাডেমীর পরিচালকের দায়িত্বে আছেন। কোয়ান্টাম মেথডের ১৫৬ ব্যাচে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।]

মনছবি এবং নিরলস প্রচেষ্টাই সাফল্যের সোপান

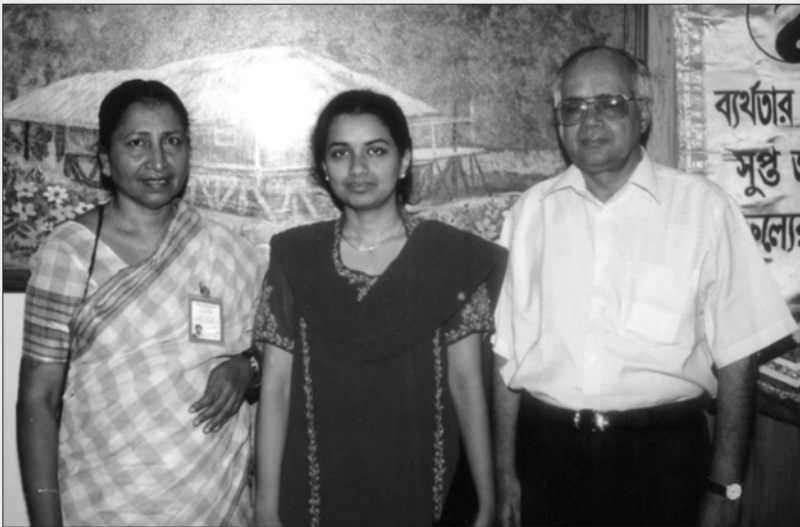
মালিহা মেহের মালেক

মনছবি স্থির করে তার জন্যে ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে গেলেই একসময় আসবে কাজ্জিত সাফল্য। ১৯৯৫ সালে অনুষ্ঠিত ৩০ ব্যাচের মেডিটেশন কোর্সে শেখা এই ধারণাটাই আজ অবধি আমাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়ে চলেছে। সে সময় আমি ছিলাম ক্লাস নাইনে পড়ুয়া ছোট্ট এক মেয়ে। তারপর ‘ও’ লেভেল শেষ করার বছরখানেকের মধ্যেই পাড়ি জমালাম আমেরিকায় উচ্চ শিক্ষার জন্যে। আজন্ম লালিত পরিবেশের গণ্ডি ছেড়ে বিদেশের সেই কঠিন দিনগুলোতে একা লড়াই করার সাহস যোগাতে সবসময়ই আমি মনে করতাম আমার লক্ষ্যকে, চিন্তা করতাম কীভাবে একটি ধাপের সাফল্য আমাকে এগিয়ে নেবে পরবর্তী ধাপে। আর তারপরই নেমে পড়তাম কঠোর পরিশ্রমে।

আমেরিকার বিখ্যাত স্মিথ কলেজে অর্থনীতি ও কম্পিউটার সায়েন্সে গ্রাজুয়েশন করার সময়কার দিনগুলোতে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে আমাকে তা বোধ হয় কিছুতেই সম্ভব হতো না যদি না আমি মেডিটেশন জানতাম। কারণ লেখাপড়ায় সময় দেয়ার পাশাপাশি চাকরি, ভলান্টারী ওয়ার্কস্, কলেজের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং নিজের রান্না, বাজার ইত্যাদি নানা ধরনের কাজ একসাথে করাটা ছিলো আমার জন্যে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। কিন্তু যখন মেডিটেশনে বসে ব্রেনকে প্রোগ্রাম দিলাম যে, তিন-চার ঘণ্টা ঘুমই আমার জন্যে যথেষ্ট এবং অল্প খেয়েও আমি চমৎকার কাজ করতে পারি, তখনই দেখলাম আর কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

মনছবি এবং এই কঠোর অধ্যবসায়ের ফলাফলও পেলাম পরম করুণাময়ের অনুগ্রহে। ২০০০ সালে CGPA ৩.৯০ নিয়ে গ্রাজুয়েশন করলাম। এর মধ্যে বিভিন্ন সময় কিছু এওয়ার্ডস পেয়েছি। যেমন, অর্থনীতিতে ভালো করার জন্যে সিডনী কোহেন প্রাইজ, সব বিষয়ে ভালো করার জন্যে ফাই বেটা কাপা, ল্যাটিন অনার্স ইত্যাদি সহ গ্রাজুয়েশনের পুরো চার বছরই ডিনস্ লিস্ট-এ আমার নাম ছিলো। আর সে বছরই নামকরা ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং কোম্পানী মরগান স্ট্যানলিতে ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং এনালিস্ট হিসেবে আমার ক্যারিয়ার শুরু করলাম। শুরু হলো জীবনের এক নতুন অধ্যায়।

আমি এই চাকরিটি নিয়েছিলাম আমার প্রি-এমবিএ ট্রেনিং পিরিয়ড



মা নার্গিস মালেক ও বাবা আবদুল মালেকের সঙ্গে মালিহা

হিসেবে। কারণ কমপক্ষে পাঁচ বছর কাজের অভিজ্ঞতা না থাকলে এমবিএ-তে ভর্তি হওয়া কঠিন। তবে কাজের চাপ এবং দক্ষতার চাহিদার বিচারে ব্যাংকিং ক্যারিয়ার আর সব পেশাকে ছাড়িয়ে গেছে। এখানে কাজের চাপ এত বেশি যে, যে দিন সবচেয়ে কম কাজ থাকে সেদিন বাড়ি ফিরতে পারি রাত ১০টা/১১টায়। আর বাকি দিনগুলোতে রাত ৩টা/৪টা পর্যন্ত কাজ করাটাই স্বাভাবিক। এমনও হয়েছে একটানা ৪ দিন কাজ করেছি, ঘুমাবার সময় পাই নি।



কিন্তু এত পরিশ্রমের পরও যখন মনছবি বাস্তবায়নে কিছুটা অনিশ্চয়তা দেখা দিলো তখন ভেঙ্গে পড়লাম। মনে হচ্ছিলো এত চেষ্টা করছি, কিন্তু ফলাফল পাচ্ছি না কেন?

আমার চেয়ে কম যোগ্য কারও যখন হয়ে যাচ্ছে আর আমি পাচ্ছি না অনেক বেশি যোগ্যতা থাকার পরও, তখন স্বাভাবিকভাবেই হতাশা সৃষ্টি হয়। আর যে বিষয়গুলোর জন্যে এমনটি হচ্ছে আমার তাতে কিছু করার নেইও। যেমন, প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের সাথে প্রতিযোগিতায় আমাকে তিনটি বাধা অতিক্রম করতে হচ্ছে, প্রথমত, আমি একজন মুসলিম, দ্বিতীয়ত, আমি একজন মহিলা এবং তৃতীয়ত, আমি একজন বিদেশী। এদেশে কোম্পানীগুলোর উঁচু পদে চাকরির ইন্টারভিউ খুব কঠিন হয়ে থাকে। তিন/চারটা রাউন্ডে ইন্টারভিউ হয় এবং প্রতিবারই পরবর্তী রাউন্ডে বাছাইকৃতের সংখ্যা কমে। প্রতিটি ক্ষেত্রে একেবারে শেষ রাউন্ডে আমি বাদ পড়তাম এবং তা-ও যোগ্যতার অভাবে নয়, বরং ঐ তিনটি বাধার কারণে। কখনো কখনো আমাকে বলাও হতো যে, দেখ তোমার Qualification Outstanding, কিন্তু তোমাকে আমরা নিতে পারবো না। কারণ

এই যখন অবস্থা, তখন আবার গুরুজীর পরামর্শ নিলাম। তিনি আমাকে বললেন, পরিশ্রম করে যেতে, অবিরাম চেষ্টা করে যেতে, আর তাহলে একদিন তার প্রতিদান মিলবেই। তখন আমিও বুঝলাম, চেষ্টা করে যেতে হবে আর চূড়ান্ত লক্ষ্যকে ঠিক রেখেও সে পথে ছোট-খাটো পরিবর্তন করা যায়। কারণ মনছবি বাস্তবায়নের পথে বাধা এলে তার সাথে সংঘর্ষে না জড়িয়ে এড়িয়ে যাওয়া আরও বেশি ফলপ্রসূ।

এরপর নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করলাম। সম্ভাব্য সব জায়গায় চেষ্টা করলাম এবং এ বিষয়ে যারা অভিজ্ঞ তাদের সাথে যোগাযোগ করলাম। অবশেষে ছুটিতে দেশে আসার কয়েকদিনের মধ্যেই বেশ কয়েকটি জায়গা থেকে সাড়া পেলাম। ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইন্টারভিউ দিয়ে তিনটি জায়গায় নির্বাচিতও হলাম, যার মধ্যে রয়েছে বিশ্বখ্যাত মিডিয়া কোম্পানী আমেরিকান অন-লাইন-টাইম ব্রাদার্সসহ ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং কোম্পানী মরগান স্ট্যানলির সানফ্রান্সিসকোর একটি অফার যা কাকতালীয়ভাবে হয়েছে। এখন এগুলোর মধ্যে থেকেই সুবিধাজনক একটিকে বেছে নেবো।

তাই মনছবি স্থির এবং নিরলস প্রচেষ্টা- এ দু'টি থাকলে যেকোনো বাধাকে মোকাবিলা করে জয়ী হওয়া সম্ভব, এ বিশ্বাসে নতুন করে উজ্জীবিত হয়েছি আমি এবং আগামী দিনগুলোতে এই বিশ্বাসই আমাকে যোগাবে এগিয়ে যাওয়ার সাহস ও শক্তি।

মালিহা মেহের মালেক আমেরিকার বিখ্যাত স্মিথ কলেজে সাফল্যের সাথে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করার পর বর্তমানে ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং অ্যানালিস্ট হিসেবে মরগ্যান স্ট্যানলি কোম্পানীতে কর্মরত আছেন। তিনি ৩০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।

সাহসী মাসুদের কথা

দু'টো পা-ই নেই তার। তবুও
নিজে প্রতীবন্ধী ভাবেন না মাসুদুর
রহমান। হাঁটাচলা করেন কৃত্রিম পা
লাগিয়ে। সাঁতারও কাটেন। সাঁতার
মাসুদুরকে দেশের বাইরেও চেনেন
অনেকে। চেনাই স্বাভাবিক। শারীরিক
প্রতীবন্ধী মাসুদুর যে সাঁতারে ইংলিশ
চ্যানেলও পাড়ি দিয়ে ফেলেছেন!

১৯৬৯ সালে কলকাতার
তপসিয়ার এক মুসলিম পরিবারে
মাসুদুর রহমানের জন্ম। চার ভাই, পাঁচ বোনের
মধ্যে মাসুদুর সবার বড়। বাবা মাহাবুবুর রহমান
বৈদ্য হাওড়ার সাঁতারগাছির কাছে একটা মসজিদে
ঈমামতি করতেন। বাবার কাছেই থাকতেন মাসুদুর।
পড়তেন বাকরা ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে।
মসজিদের কাছে বাকরা নয়া বাসস্ট্যান্ড। পাশে
রেললাইন। সকালে অনেক ছাত্রই মালগাড়িতে চেপে
স্কুলে যেত। চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র মাসুদুরেরও একদিন
শখ হলো মালগাড়িতে চেপে স্কুলে যাওয়ার। কিন্তু
বিধি বাম। মালগাড়িতে উঠতে গিয়ে পা পিছলে
পড়ে কাটা পড়ল মাসুদুরের দুটো পা। তারপর পা
সারানোর জন্য মাসুদুরকে দীর্ঘদিন পড়ে থাকতে
হয়েছে হাসপাতালে। এক সময় স্বপ্ন দেখতেন বড়



ছোটবেলায় পা
হারিয়েছেন।
তাই বলে
জীবনযুদ্ধে সাহস
হারাননি মাসুদুর
রহমান। সাঁতারে
পার হয়েছেন
ইংলিশ চ্যানেল।
স্বপ্ন দেখছেন
আরো বড় কিছু
করার।

হয়ে পেলের মতো ফুটবলার, গাভাস্কার বা হ্যাডলির
মতো ক্রিকেটার অথবা মোহাম্মদ আলীর মতো
বক্সার হবেন। সব স্বপ্ন ভেঙে গেল। তবুও
লক্ষ্যহীন, হতাশাগ্রস্ত জীবনকে মেনে নেন নি
মাসুদুর। পা না থাকলে হাঁটা যায় না। কিন্তু সাঁতার
তো কাটা যায়! অবশ্য পা ছাড়া সাঁতার কেটে যে
বিখ্যাতও হওয়া যায় তা হয়তো মাসুদুরকে না
দেখলে কেউ জানত না। প্রথমে কলকাতায় এবং
তারপর পুনের সামরিক হাসপাতালে ১১ মাস
চিকিৎসা নিয়ে কলকাতা ফিরেই ক্যালকাটা স্পোর্টস
অ্যাসোসিয়েশনে যোগ দেন মাসুদুর। বাকিটা
ইতিহাস। পশ্চত্বে সঙ্গী করেই মাসুদুর নেমে পড়েন
সাঁতারে। তখন ১৯৮৯ সাল। ১৪ কি.মি. সাঁতারের

এক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে কলকাতার
আহিরিটোলা ইয়ুথ সুইমিং ক্লাব। ২ ঘণ্টা ১২ মিনিটে
১৪ কি.মি. সাঁতারে পঞ্চম হন মাসুদুর। এরপর
থেকে দূরপাল্লার সাঁতারে প্রায় নিয়মিতই ছিলেন
তিনি। ১৯৯৩ সালে সুইমিং ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া
আয়োজন করে ৮১ কি.মি. দূরত্বের এক
প্রতিযোগিতার। ৮১ কি.মি. সাঁতারাতে মাসুদুরের
লেগেছিল ১২ ঘণ্টা ৩৮ মিনিট। এভাবে চলতে থাকে
মাসুদুরের এগিয়ে চলা। একটা কথা, মাসুদুর কিছু
কখনো প্রতিবন্ধীদের প্রতিযোগিতায় অংশ নেন নি।
সব জায়গায় সুস্থ, সবল মানুষরাই তার প্রতিপক্ষ।
মাসুদুরের জীবনে সেই শুভক্ষণটি আসে ১৯৯৭
সালের ২৮ জুলাই। সেদিন ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম
করে মাসুদুর চমকে দেন বিশ্ববাসীকে। মাসুদুর
রহমানের জীবনে আর একটি বড় ঘটনা ঘটে ২০০১
সালের ২৫ সেপ্টেম্বর যেদিন পাড়ি দেন জিব্রাল্টার
প্রণালী।

মাসুদুর রহমানের ভবিষ্যৎ স্বপ্ন, ভারত-শ্রীলঙ্কা
পক প্রণালী অতিক্রম করা। ২২ কি.মি. পথ।
আসছে ডিসেম্বরেই পক প্রণালী জয় করতে যাচ্ছেন
মাসুদুর। তার সঙ্গে থাকছেন জল কন্যা বুলা রায়।
পক প্রণালী অতিক্রম করলেই কি নিজেই সার্থক
মনে করবেন মাসুদুর? মোটেই না। প্রথম আলোকে
নতুন একটা লক্ষ্যের কথাও জানিয়েছেন মাসুদুর।
“২০০৪ সালের মধ্যে আরো ১০টি চ্যানেল পাড়ি
দিতে চাই। ভারতের প্রখ্যাত সাঁতার মিহির সেন
এক বছরে ৬টি ও তামিলনাড়ুর কুত্রালিশরন এক
বছরে ৭টি চ্যানেল পাড়ি দিয়েছিলেন, ১০টি চ্যানেল
পাড়ি দিয়ে আমি সেই কীর্তিগুলোকে ম্লান করে দিতে
চাই।”
—অমর সাহা [প্রথম আলোর সৌজন্যে]

মেডিটেশন চর্চা : সফল ও সুখী পরিবারের আনন্দ অধ্যাপিকা মেরিনা জাহান

কোয়ান্টাম শততম কোর্স পূর্তি স্মারকটি এক
সহকর্মীর কাছ থেকে উপহার পেয়ে প্রথমে নিজে
পড়লাম এবং তারপর রেখে দিলাম ঘরের এমন এক
জায়গায় যেখান থেকে সবাই নিয়ে পড়তে পারে।
এভাবে আস্তে আস্তে প্রথমে মেয়ে তারপার ছেলে
এবং শেষ পর্যন্ত স্বামীও রাজী হয়ে গেলেন কোর্স
করতে এবং ১৫৮ ব্যাচে অংশ নিলাম আমরা পুরো
পরিবার। কোর্স করার আনন্দের পাশাপাশি চারদিন
ধরে বাবা-মা-ছেলে-মেয়ে মিলে এতটা সময়
একসাথে থাকার আনন্দও আমরা উপভোগ করেছি
পুরোমাত্রায়। এটা সত্যিই এক দুর্লভ সুযোগ।

পরিবারের সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে কোর্সে অংশ
নেয়ায় একটা বাড়তি সুযোগ এসেছে আমাদের
জন্মে। কোর্স করার সময় এবং তারপরও আমরা এ
বিষয়ে একে অন্যের সঙ্গে প্রচুর অভিজ্ঞতা বিনিময়
করেছি এবং কারও কোনো সমস্যা হলেও সাথে
সাথে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে পেরেছি।
মেডিটেশন করার সুফলও পাচ্ছি একেকজন
একেকভাবে।

যেমন, আমার মেয়ে বেনা পারশা জাহান এ বছর
উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। পরীক্ষার মধ্যেও
নিয়মিত মেডিটেশন করেছে এবং ভালো পরীক্ষা

দেয়ার জন্য সর্বাঙ্গিকরণে চেষ্টা
করেছে। ক্লাস নাইনে পড়িয়া
ছেলেটির অগ্রগতিও লক্ষণীয়।
কোর্সের পর সে তার রাগ এবং
অস্থিরতা নেই দেখে বিস্মিত
হয়েছিলো। আমার স্বামীও শত
ব্যস্ততার মধ্যেও মেডিটেশন
করেন এবং নিয়মিত চর্চা
অব্যাহত রাখার ব্যাপারে
আশাবাদী।

আর আমার পরিবর্তন নিজের
চেয়ে আমার মায়ের চোখে যেন
বেশি ধরা পড়েছে। আমার মা
দেশের একজন বিশিষ্ট কবি
জাহানারা আরজু সেদিন
বলছিলেন, তোমার মধ্যে একটা
পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। তুমি এখন আর হতাশার
কথা বল না, সমস্যার মুখে তোমাকে এখন অনেক
আত্মবিশ্বাসী মনে হয়। তাকে তখন মেডিটেশনের
কথা বললাম, কোর্সের নানা শিক্ষার কথা বললাম,
শুনে তিনি ভীষণ অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

আসলেও কোয়ান্টাম মেথড কোর্সটি যেন
আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে আমার সেই কল্পনার
জগত, সুন্দরের জগত, যা ছোটবেলা থেকেই আমি
লালন করতাম। মাঝের কিছু সময়ের বাস্তবতার
চাপে পড়ে যাকে প্রায় হারিয়েই ফেলছিলাম। সেই
সাথে যোগ হয়েছে ছোটখাটো কিছু প্রাণ্ডিযোগের
অভিজ্ঞতা। যেমন, সেদিন আমার ছেলে ওর
মোবাইল সেটটা একটা পার্কের বেঞ্চে ভুল করে
ফেলে এলো। যখন মনে পড়লো, কোয়ান্টা ভঙ্গি
করে গিয়ে দেখলো সেখানে নেই। কিছুক্ষণ পর অন্য



মোবাইল থেকে এ নাশ্বারে ফোন করে জানা গেলো
এক ভদ্রলোকের ছোট ছেলে সেটি পেয়েছে এবং
তিনি সেটি নিয়ে অপেক্ষা করছেন ফেরত দেবার
জন্যে। এখনকার সময়ে এরকম ঘটনা কিছুটা
অলৌকিকই বলা যায়।

তাই আমি মনে করি, নিয়মিত চর্চা চালিয়ে
গেলে আমরা আরও সাফল্য পেতে থাকবো এবং
একটি সফল ও সুখী পরিবার হিসেবে যে আনন্দ
আমরা ইতোমধ্যেই পাচ্ছি তা আরও বাড়বে।

[অধ্যাপিকা মেরিনা জাহান বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা
কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান এবং দেশের বিশিষ্ট কবি
জাহানারা আরজু ও প্রখ্যাত বিচারপতি নুরুল ইসলামের কন্যা।
তার স্বামী অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল সৈয়দ বদরুজ্জামান।
১৫৮ ব্যাচের কোর্সে তারা অংশ নিয়েছিলেন কন্যা সৈয়দা বেনা
পারশা জাহান এবং পুত্র সৈয়দ মহিউজ্জামানকে নিয়ে।]

প্রত্যয়ন অনুষ্ঠানে গ্রাজুয়েটদের অনুভূতি

ধূমপান ত্যাগ করবো

আনোয়ার আলী

আমার এক সহকর্মী প্রতিদিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ভাসিটিতে ক্লাস নেন। বিকেল থেকে অনেক রাত পর্যন্ত অফিসে কাজ করেন। সারাদিন পরিশ্রমের পর বাসায় ফিরে পরদিন ক্লাসের প্রস্তুতির জন্যে রাত ২টা /৩টা পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। তার কাজের এ মাত্রা দেখে আমি অবাক। তিনি এত প্রাণশক্তি কোথায় পান? একদিন জানলাম তিনি মেডিটেশন করেন।

আমার সমস্যা হলো আমি বেশ অলস প্রকৃতির। কাজে মন বসাতে পারি না। চিন্তাগুলো শুধু অতীতে চলে যায়। মনটাকে কন্ট্রোল করতে পারি না। আরেকটি বড় সমস্যা হলো ধূমপান। ধূমপান ত্যাগে গুরুজী যে পদ্ধতি শিখিয়েছেন তা সত্যিই খুব কার্যকর। আমার বিশ্বাস কোর্সের সামগ্রিক শিক্ষার মাধ্যমে ধূমপানসহ আমার যাবতীয় সমস্যাগুলো অতিক্রম করতে পারবো।

[আনোয়ার আলী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। ১৫৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

শিখিলায়ন : দ্রুত নিরাময়

ডা. লতিফা খাতুন

শিখিলায়ন মানুষের মনে চমৎকার প্রশান্তি এনে দেয়। উন্নত বিশ্বে মেডিটেশনের চর্চা এখন ব্যাপক। সেখানে রোগীদের মেডিকেল ট্রিটমেন্টের পাশাপাশি মেডিটেশন করানো হয়। ফলে তারা দ্রুত নিরাময় লাভ করে। আমার নিজেরও কোমর ও হাঁটুতে সমস্যা ছিলো। গতকাল খুব দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নামলাম। আমার হঠাৎ মনে পড়ল যে, পায়ে ব্যথা ছিলো। আমি সত্যি বিস্মিত।

[ডা. লতিফা খাতুন, ফিজিসিয়ান, ১৬২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

এখন ভালো আছি সুস্থ আছি পাপিয়া চৌধুরী পম্পা

দীর্ঘদিনের পুরনো মাইগ্রেনের যন্ত্রণা নিয়ে এসেছিলাম। আর্শচ্যেের ব্যাপার হলো, গত চারদিন কোনো রকম ওষুধ ছাড়া আমি ভালো আছি, সুস্থ আছি। এটা যে কত বড় প্রাপ্তি তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কারো বোঝার সাধ্য নেই।

[পাপিয়া চৌধুরী পম্পা, শিক্ষিকা, ১৫৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছে

ডা. রাশেদা সামাদ

আমি যখন চেম্বারে যাই আমার পরিবারের দায়িত্বের কথা মনে পড়ে। পরিবারে বেশি সময় কাটালে মনে হয় তাহলে আমার পড়াশোনা করার কি দরকার ছিলো? এভাবে জীবনের বিভিন্ন দিকগুলো সমন্বয় করতে পারছিলাম না।

গত পরিচিতি সভায় আমি এবং আমার স্বামী এসেছিলাম। লক্ষ্য করলাম আমার নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো। এছাড়া আমাদের দু’জনেরই রেগে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে।

এখন আমার সমস্যাগুলো আস্তে আস্তে দূর করতে পারছি। জীবনের লক্ষ্যটিকে ঠিকমতো সমন্বয় করতে পেরেছি। ১ম দিন বাসায় ফিরে দেখি আমার ছেলে পড়াশোনা ফেলে ভিডিও গেম খেলছে। আমি সাথে সাথে গামা লেভেলে। তখন কোয়ান্টা ভঙ্গির কথা মনে পড়লো। আমি না রেগে তার সাথে প্রো-অ্যাকটিভ আচরণ করলাম, সে লজ্জিত হলো। দেরীতে হলেও আমার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের সুযোগ পেয়েছি।

[ডা. রাশেদা সামাদ, শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ, ১৫৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

ব্রেনের ব্যবহার শিখেছি

মু. কামাল উদ্দীন পারভেজ

এ কোর্সটি পুরোপুরি বিজ্ঞান ভিত্তিক। আমাদের সমস্যাগুলোর সমাধানের উপায় আসলে আমাদের মধ্যেই রয়েছে। আমরা যদি সমন্বিত উপায়ে এবং ব্রেনকে বেশি পরিমাণে কাজে লাগাতে পারি, ডিএনএ-র প্রোগ্রামকে পুনর্বিন্যাস করতে পারি তবে আমাদের সমস্যাগুলোর সমাধান আমরাই করতে পারি।

[মু. কামাল উদ্দীন পারভেজ, মাইক্রোবায়োলজির ছাত্র চ.বি. । ১৬২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

চমৎকার সময়ানুবর্তিতা

মো. মোতাহার হোসেন

পেশাগত কারণে বহু দেশে এবং বহু জাতির সাথে আমার সময় কেটেছে। তাদের সময়ানুবর্তিতা দেখে খুব ভালো লাগতো। অথচ আমাদের দেশে এটির খুবই অভাব। ব্যতিক্রম শুধু এই কোয়ান্টাম। আমি মুগ্ধ। কোয়ান্টামের এই সময়ানুবর্তিতা শিক্ষণীয় এবং দৃষ্টান্তমূলক।

[চাকরিজীবী মো. মোতাহার হোসেন ১৬৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



সুস্থ বোধ করলাম

প্রফুল্ল কুমার দেবনাথ

আট বছর ধরে আমি হৃদরোগ ও ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়েছি। একজনের কাছে ২০/৩০ বারও গিয়েছি এবং প্রতিবারই বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়েছি। তেমন কোনো উপকার পাই নি। চিকিৎসার জন্য মাদ্রাজ গিয়েছিলাম। সেখানেও একই অবস্থা। এভাবে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়েছে। অবশেষে ছেলের পরামর্শে এখানে কোর্স করতে আসি। এই চার দিন আমি বেশ সুস্থ বোধ করি। বুকে কোনো ব্যথা-বেদনা অনুভব করি নি।

[প্রফুল্ল কুমার দেবনাথ, পল্লী চিকিৎসক, ১৬৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

জীবন যাপনের বিজ্ঞান শিখেছি

লুৎফুর রহমান ভুঞা

কর্মজীবন থেকে আমি অবসরপ্রাপ্ত। এলপিআর শেষ হওয়ার পর থেকে নানাবিধ শারীরিক, মানসিক রোগগ্রস্ত। হাঁটুতে, দাঁতে, পেটে সমস্যা, পা সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। কোর্স শুরুর আগে অসুস্থতার কারণে ভেবেছিলাম ক্লাসের পুরো দিন থাকবো না। গত চারদিনে আমার কোনোরকম শারীরিক সমস্যা হয় নি। গত রাতে হঠাৎ মাথা ব্যথার লক্ষণ দেখে ব্রেনে কমান্ড দিলাম ‘নো হেডেক’। একটু পরেই ব্যথা নেই। আমি সারপ্রাইজড। আসলে আমাদের শারীরিক সিস্টেমের মধ্যে যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে, মেডিটেশন এবং গুরুজীর আলোচনার মাধ্যমে তা জাগ্রত হয়েছে।

[অবসরপ্রাপ্ত উপসচিব লুৎফুর রহমান ভুঞা, ১৬২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

বার্ধক্যভীতি কেটেছে

মো. জামাল উদ্দিন

আমি সব সময় ভবিষ্যত নিয়ে দুশ্চিন্তা করতাম। সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিলো বার্ধক্য ভীতি। যখন বৃদ্ধ হয়ে যাবো তখন আমার কি হবে এ নিয়ে দুশ্চিন্তা। এছাড়া সিদ্ধান্তহীনতায়ও ভুগতাম।

এখন আমার বার্ধক্য ভীতি কেটেছে। স্থিরতা এসেছে। ফলে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার মানসিক উপযোগিতা তৈরি হয়েছে।

[মো. জামাল উদ্দিন, শিক্ষার্থী, ১৫৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



টেনশন দূর হলো

ডা. মো. খুরশীদ আলম খান

প্রশাসনিক দায়িত্বে থাকলে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতে হয়। কিন্তু এ দায়িত্বের কারণে আমার টেনশন ছিলো বেশি এবং স্বভাবতই রাগও। এখানে এসে আমি উপলব্ধি করলাম

টেনশন এবং রাগ করা চলবে না। আমি ৭৫ ভাগ টেনশন ও রাগ কমিয়ে ফেললাম। এছাড়াও রোগীর সার্বিক সুস্থতা এবং সঠিক মাত্রায় ওষুধ প্রয়োগের মাধ্যমে সুস্থ করে তোলা এবং আত্মিক উন্নতির জন্যে আমি এ কোর্সে আসি।

কোর্সের পুরো শিক্ষা গুরুজীর কথামত নিয়মিত চর্চার মাধ্যমে আমরা পরিপূর্ণ লাভবান হতে পারবো। এটাই আমার বিশ্বাস।

[ডা. মো. খুরশীদ আলম খান, বাংলাদেশ হোমিও প্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রিন্সিপাল, ১৬৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

অনুভূতিময় পারিবারিক মেডিটেশন

সালমা আক্তার

প্রজ্ঞার মেডিটেশনটি ছিলো আমার কাছে অদ্ভুত সুন্দর অনুভূতি-ময়। পারিবারিক মেডিটেশনটিও খুব ভালো লেগেছে। মেডিটেটিভ লেভেলে মনের গভীর অবস্থায় পরিবারের সদস্যদের সাথে একাত্ম হওয়ার যে ফিলিংস তা আর কখনো আমি পাই নি।

গুরুজীর কাছে যে সুন্দর আলোকিত জীবনের শিক্ষা পেয়েছি তাতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। মেধার বিকাশ ঘটিয়ে একজন আদর্শ গৃহিণী এবং আদর্শ ও দক্ষ শিক্ষক হওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।

[সালমা আক্তার, বেগম বদরুন্নেসা মহিলা কলেজে শিক্ষকতা করছেন, ১৬৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

প্রশান্ত হয়েছি

চন্দনা রানী ভৌমিক

আমার পায়ে বেশ কিছু দিন থেকে খুব ব্যথা হচ্ছিল। ডাক্তারের পরামর্শে মেডিটেশন শিখতে চলে এলাম। এসেছিলাম পায়ের ব্যথা সারাতে। আর এখন ব্যথার সাথে মানসিক যন্ত্রণা, টেনশন দূর হওয়ায় নিজেকে ভীষণ হালকা লাগছে, প্রশান্তি অনুভব করছি।

[চন্দনা রানী ভৌমিক, শিক্ষার্থী, ১৫৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



কোয়ান্টাম পরিবারে নতুন অতিথি : সাফল্যায়ন

গত ৮, ১০, ১১ ও ১২ জুন এবং ১৩, ১৬, ১৭ ও ২০ জুলাই ২০০৩ শিক্ষার্থীদের জন্যে বিশেষ সাফল্যায়নের যথাক্রমে ১ম ও ২য় ব্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। কাক্সিকত সাফল্যের জন্যে বিশেষ প্রার্থনার উদ্দেশ্যে এ সাফল্যায়নে অংশ নেন নানা বয়সের শিক্ষার্থীরা।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের নতুন কার্যক্রম এই সাফল্যায়ন প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা করে মোট চার দিনে সমাপ্ত হয়। গুরুজীর নির্দেশে এ সাফল্যায়ন সাধারণ কোয়ান্টায়ন থেকে কিছুটা ভিন্ন আঙ্গিকে সাজানো হয়। সারাদিন মৌনতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীগণ তাদের সাফল্যের মনছবি অবলোকনের পাশাপাশি গুরুজীর অনুমোদিত কার্যক্রম অনুযায়ী পরম করুণাময়ের কাছে দোয়া, পরিবারের সাথে সুন্দর সম্পর্কের মনছবি অবলোকন, ভবিষ্যতে নিজের জ্ঞান ও সাফল্যের মাধ্যমে সমাজের উন্নয়নে নিজের অবদান অবলোকন ইত্যাদির মাধ্যমে সাফল্যায়ন সম্পন্ন করেন।

সাফল্যায়নের ১ম ব্যাচে অংশগ্রহণকারী এস.এস.সি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ ৪.৮৮ প্রাপ্ত সফল ছাত্রী ইশরাত তারানুম সূর্য বলেন, পরীক্ষার আগে এমনকি পরেও আমার মনে একটা আশঙ্কা ছিলো। কিন্তু সাফল্যায়ন করার পর আমার আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছি। এখানে মনে হয়েছে আমরা আল্লাহকে খুব কাছ থেকে

ডেকেছি। মেডিটেশনে উপলব্ধি করেছি আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করছেন। পরীক্ষায় আশানুরূপ সাফল্য লাভে সাফল্যায়নের অবদান অনেকটাই। সাফল্যায়নে নীরব মুহূর্তে সাফল্যের মনছবি ও একগ্র কামনা সাফল্যের পথে বড় ভূমিকা রেখেছে। সমাজের কী উপকারে আসবো তা নিয়ে ভাবতে গিয়ে দেখলাম আমাদের পড়াশোনা চালানোর পাশাপাশি মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করা উচিত। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সাথে যুক্ত থাকলে এ কাজ আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে করতে পারবো। ইশরাত তারানুম সূর্য ৭৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।

একই পরীক্ষায় জিপিএ ৪.৩৮ প্রাপ্ত ১০৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট ইফতেখার আলম মিশুক বলেন, আমার রেজাল্টের পেছনে সাঁফল্যায়নের একটা বড় ভূমিকা আছে বলে মনে করছি। প্রস্তুতি অনুসারেই মানুষের প্রাপ্তি। তাই আমার মনে হয়, সাফল্যায়নে রেজাল্ট অবলোকন বা ভিজুয়ালাইজ করাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পরীক্ষার হিসেবে যা আশা করেছি ফলাফলও সেরকম পেয়েছি।

সাহিয়া শারমিন মৌরী জিপিএ ৪.৩১ পেয়েছেন। তিনি বলেন, “পরীক্ষার আগে টেস্ট পরীক্ষার সময় বেশ অসুস্থ ছিলাম। ফলে টেস্ট পরীক্ষা খারাপ হয় এবং প্রস্তুতিও ভালো ছিলো না। মেধায়নে পড়াগুলোকে গুছিয়ে নিয়েছিলাম। পরীক্ষায় দেখেছি সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সাফল্যায়নে



ইফতেখার আলম মিশুক



সাহিয়া শারমিন মৌরী

মনছবিই আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। প্রস্তুতির তুলনায় আশানুরূপ সাফল্য পেয়েছি। সাহিয়া শারমিন মৌরী ৮৫ ব্যাচে কোর্স করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র সৈয়দ মাসুদ রেজার মতে, পড়াশোনার সাফল্যের জন্যে মনছবির নতুন মাত্রা খুঁজে পেয়েছি। মনের গভীরে জমে থাকা দীর্ঘ দিনের রাগ-ক্ষোভ দূর হয়ে গেছে। সাফল্যের ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে উঠেছি। তিনি ৮৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।

১১৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট জনাব এম.এস. আজিজ সাফল্যায়নে ভিন্ন অনুভূতির কথা বলেন– এ সাফল্যায়নে চার দিনে যেন আমি সারা জীবনের মাস্টারপ্ল্যান করতে পেরেছি। পরিবারের সকলের মমতার প্রতিদানে আমি কী করছি এবং কী করতে হবে সে উপলব্ধি আমাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। এ ছাড়াও শিক্ষার্থী মেডিটেশনের ক্যাসেটের কথাগুলো নতুনভাবে উপলব্ধি করেছি। এ কথাগুলো আমার জীবনে অন্য রকম প্রভাব ফেলবে বলে আশা করছি।

বন্ধু-বান্ধবীদের সাথে বিভিন্ন সময়ে যে খারাপ সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তাদেরকে ক্ষমা করতে পেরে মন হালকা লাগছে। এছাড়াও এ সাফল্যায়ন আমার আত্মবিশ্বাস অনেকাংশে বৃদ্ধি করেছে। সাফল্যায়ন করার ফলে স্রষ্টার কাছে যে গভীরভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করতে পেরেছি, তা সাধারণ জীবনে কখনো অনুভব করি নি– বলেন ১১১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট আসমা-উল-হুসনা।

এ সাফল্যায়নে শিক্ষার্থী মেডিটেশন সাইড-এ এর মাধ্যমে দিনের আরম্ভ এবং শিক্ষার্থী মেডিটেশন সাইড-বি এর মাধ্যমে দিনের সমাপ্তি হয়। প্রতিদিন নির্দিষ্ট কার্যক্রম অনুযায়ী শিক্ষার্থীগণ তাদের দিন অতিবাহিত করেন।

প্রতিবেদক : শাহেদ হাসনাইন রাবিত

দু’জন কৃতী ছাত্রী

বিশেষভাবে সহায়তা করেছে কোয়ান্টাম মেডিটেশন। তাইতো অন্তরা চক্রবর্তীর অভিব্যক্তি, ৯৭ ব্যাচে মেডিটেশন কোর্স করার পরই আমি প্রথম গুরুজীর তত্ত্বাবধানে মনছবি দেখতে ও প্রত্যয়ন করতে শিখি যা আমার আত্মবিশ্বাস বাড়াতে এবং পড়াশোনায় মনোযোগী হতে খুবই সহায়ক হয়েছে। একই সুর ধ্বনিত হয়েছে ১০০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট অপরাজিতা রায়ের কর্ণে, মেডিটেশন করায় আমার পরীক্ষাভীতি ও টেনশন দূর হয়েছে। মনোবল বেড়েছে বহুগুণ।

তারা উভয়েই নিয়মিত মনছবি অবলোকন করতেন– জিপিএ ৫ অর্জন করেছেন।



অপরাজিতা রায়

শিক্ষকের নির্দেশ মেনে চলা, পরীক্ষা দেয়া ও পাঠ্য বইটি ভালোভাবে পড়ার মাধ্যমে আমরা কাক্সিকত সাফল্য অর্জন করতে পেরেছি। পরিশেষে তারা তাদের সফলতার জন্যে তাদের পরিবার, শিক্ষকবৃন্দ, সর্বোপরি পরম শ্রদ্ধেয় গুরুজী ও পরম করুণাময়ের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

প্রতিবেদক : ফেরদৌসী সুলতানা



সৈয়দ মাসুদ রেজা

কোয়ান্টাম বুলেটিন - ৪

কোয়ান্টাম বুলেটিন - ৫

প্রশ্ন : আমার জীবনে যা লক্ষ্য ছিল এখনো তা-ই আছে। শুধু উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্যে যত বই আছে, ভালো মানুষ হওয়ার জন্যে সেরকম কিছু নেই। মা-বাবাও এ ব্যাপারে শিক্ষা দেন নি। তাহলে মানুষ হওয়ার লক্ষ্যে কি করতে হবে?

উত্তর : ‘মানুষ’ হওয়ার জন্যে যদি কোনো জ্ঞান না-ও থাকে শুধু নীরবে একটি প্রশ্ন মনকে জিজ্ঞেস করবেন কোনো কাজ করার আগে, আর তাহলে, ‘যে কাজটি করছি তা নিজের জন্যে, অন্যের জন্যে কতটা কল্যাণকর? স্রষ্টা সরাসরি আপনাকে জবাব দেবেন। এর সাথে সাথে জ্ঞানার্জন করবেন, ভালো মানুষদের সঙ্গে মিশবেন। ভালো মানুষ হওয়ার জন্যে আন্তরিক ইচ্ছাটাই যথেষ্ট। তাহলেই আপনি মানুষ হওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারবেন।

প্রশ্ন : লেখাপড়া শেষ করে গাড়ি-বাড়ির স্বপ্ন দেখতাম। মেডিটেশন করেছিও এজন্যে। তাহলে এখন কি গাড়ি-বাড়ি চাইবো না?

উত্তর : লেখাপড়া শেষ করে আপনি যখন মানুষের জন্যে কাজ করবেন, মানুষকে সর্বোত্তম সেবা দেবেন, অর্থ আপনার আসবেই। গাড়ি-বাড়ি এমন কিছু নয় যে এটাকে চাইতে হবে। আপনি যদি দক্ষতা সৃষ্টি করেন তাহলে গাড়ি-বাড়ি আপনার পেছনেই ঘুরবে। তাই মনছবি হবে দক্ষতা-মেধাকে সর্বোত্তম কাজে লাগানোর। বাকি জিনিসগুলো এমনিতেই আসবে। কিনলেও গাড়িতে চড়বেন, না কিনলেও গাড়িতে চড়বেন।

আপনি নিজের মেধার বিকাশ ঘটান, দক্ষতা সৃষ্টি করুন। মেধাকে সেবায় রূপান্তরিত করুন, আপনার কোনো অভাব থাকবে না।

যারা মেডিটেশন করেন, মেধাকে কাজে লাগান, তাদের কোনো অভাব নেই। যারা ধ্যানের পথে আসেন, স্রষ্টার সাথে সংযুক্তির পথে আসেন তারা কখনো দরিদ্র থাকেন না। আমাদের অলি-বুজুর্গ, মুনি-ঋষীদের কোনো অভাব ছিলো না। নবীজী (সা.), মহামতি বুদ্ধ- তাঁরা কেউ দরিদ্র ছিলেন না। আবার বিলাসিতাও তাঁদেরকে স্পর্শ করে নি। মেডিটেশন আমাদেরকে দাতা করবে, দরিদ্র করবে না।

প্রশ্ন : যদি বাসায় মেডিটেশনের ব্যাপারে বিরূপ পরিস্থিতি বিরাজ করে এবং তারা এটাকে বিদআত বলে, তাহলে কীভাবে মোকাবেলা করবো?

উত্তর : আপনি মেডিটেশন করুন, ভালো মানুষ হোন। যখন আপনাকে ভালো হতে দেখবে তখন তারাও উদ্বুদ্ধ হবে। এমন ছেলেও ছিলো যাকে মেডিটেশন করার জন্যে দৈহিক নির্যাতন করা হয়েছে। কিন্তু ছেলের মধ্যে পরিবর্তন দেখে বাসার পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক। কাজেই যে যা-ই বলুক আপনি পজিটিভ থাকবেন।

প্রশ্ন : টিভি সিরিয়াল দেখা আমাদের জন্যে সময়ের অপচয়। তাহলে বিনোদনের জন্যে কি টিভির প্রয়োজন নেই? যদি থাকে তাহলে কতটুকু তা কীভাবে বুঝবো?

উত্তর : বিনোদনের জন্যে টিভি সিরিয়াল- এ ধারণা ভুল। একমাত্র হাসির সিরিয়াল ছাড়া বেশিরভাগই চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র, ভায়োলেস এবং সাসপেন্সে ভরা, যা নার্ভাস সিস্টেমকে আরও উত্তেজিত করে দেয়। এগুলো দেখে কখনো বিনোদন হয় না বরং মায়বিক উত্তেজনা বাড়ে। কাজের ফাঁকে বাকি সময়টুকু পরিবারের সাথে মেতে থাকুন।

অবিদ্যা প্রসঙ্গে আপনার প্রশ্ন উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

কাজকে যদি ভালবাসেন তাহলে আলাদাভাবে বিনোদনের প্রয়োজন হবে না। কাজই তখন হবে বিনোদনের উৎস। আসলে বিনোদনের যে প্রচলিত ধারণা রয়েছে আমাদের তা পাশ্চাত্য থেকে এসেছে। সারাদিন সবাই নিজের স্বার্থে কাজ করে অতঃপর ক্লান্ত হয়ে তথাকথিত বিনোদনে গা এলিয়ে দেয়। অথচ একজন মানুষ যদি স্রষ্টার সম্বন্ধিত লক্ষ্যে নিজের ও অন্যের কল্যাণের জন্যে কাজ করে তাহলে তার ক্লান্তি থাকে না। তাই কাজকে ভালবাসলে কাজের ক্লান্তিকে যেমন এড়ানো যায় তেমনি টিভি বিনোদনের নামে প্রকারান্তরে আরও ক্লান্ত হওয়ার প্রক্রিয়াতেও যেতে হয় না।

প্রশ্ন : কাউকে দেখে যদি ভালো লাগে, ভুলতে না পারি তাহলে নিজেকে কীভাবে সামলাবো? ভালবাসা যদি রোগের পর্যায়ে চলে যায়, তখন তার নিরাময়ের উপায় কি?

উত্তর : যেকোনো কিছুকে দেখে ভালো লাগতে পারে। ফুলকে বা কোনো মানুষকে দেখে ভালো লাগতে পারে। ভালো লাগলেই ভুলে যেতে হবে- এ ধারণা ভুল। এটাকে সুন্দর সুখকর স্মৃতি হিসেবে রেখে দিন। জোর করে ভোলার চেষ্টা করবেন না। ভালো কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লে এটা এমনিতেই চলে যাবে। সমস্যা হয় যখন আপনি আসক্ত হয়ে যান।

প্রশ্ন : মিডিয়ার মাধ্যমে অবিদ্যার হাত থেকে তরুণ-তরুণীদের বাঁচানোর জন্যে কী পদক্ষেপ নিতে পারি? আমরা মা-বাবারা অসহায় বোধ করছি। আপনি কিছু দিক-নির্দেশনা দিলে ভালো হয়।

উত্তর : তরুণ-তরুণীরা আমাদেরই ছেলে-মেয়ে, আমাদেরই ভাই-বোন। এদেরকে মমতা দিয়ে যেভাবে প্রভাবিত করা যায়, অন্য কোনো ভাবে তা পারা যায় না। যখন ছেলে মেয়ের সঙ্গে বাব-মার দূরত্ব সৃষ্টি হয়, সম্পর্ক ক্ষীণ হয় তখনই তারা বাইরের অবিদ্যা দ্বারা প্রভাবিত হয়। এজন্যে সবসময় সন্তানের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করবেন।

আমাদের মা-বাবাদের সময়কার কথাকে ভুলে গিয়ে এখনকার বাস্তবতাকে মেনে নিতে হবে। এখন সন্তানের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশতে হবে, তাকে সময় দিতে হবে এবং তাকে তার ভাষায় বোঝাতে হবে। কারণ সে যে ভুল করছে তাতো এখন বুঝতে পারছে না। আর যখন বুঝবে তখন শোধরানোর সময় থাকবে না। তাই তাকে আন্তে আন্তে সংস্কে সম্পৃক্ত করতে হবে। ভালো কাজে তাকে ব্যস্ত রাখতে হবে, কারণ কোনো কাজ না থাকলেই সে খারাপের দিকে ঝুঁকবে।

আমরা তাদের কাছ থেকে যে আচরণ আশা করি অনেক সময় তা নিজেরাই তাদের সঙ্গে করি না। যেমন, তাদের কাছ থেকে সালাম চাই, কিন্তু

নিজেরা আগে সালাম দিই না। অথচ, নবীজী (সা.) ছোট-বড় সবাইকেই আগে সালাম দিতেন। আসলে আমরা শাসনের নামে হয় অত্যাচার করি, নয়তো আদরের নামে আত্মদ দিই। আদর এবং শাসন এ দু’টোর মধ্যে সমন্বয় করি না।

প্রশ্ন : বন্ধুদের বাজে আড্ডা থেকে বিরত থাকবো কেমন করে?

উত্তর : ‘বন্ধু’ এমন একটি শব্দ যা আমাদের সমাজে নিগূহীত হয়েছে সবচেয়ে বেশি। একজনের সাথে কথা হলে, দেখা হলেই সে বন্ধু নয়। বন্ধু সে-ই যে আপনার জন্যে প্রাণ দিতে পারে। অথচ যদি প্রাণ দেয়ার প্রশ্ন ওঠে তাহলে এখনকার ‘বন্ধুরা’ আপনাকেই সামনে দাঁড় করিয়ে দেবে।

আসলে যে কাউকে ‘বন্ধু’ মনে করাটাও অবিদ্যা। বন্ধু সে-ই হতে পারে যার সাথে আপনার চিন্তা-চেতনা, আদর্শের মিল আছে। স্কুলের বা মহল্লার সহপাঠী হলেই তাকে বন্ধু মনে করার কোনো কারণ নেই। বন্ধুত্ব সবসময় চেতনা বা আদর্শের ভিত্তিতে হওয়া উচিত। সংস্কে সদস্যরাই আপনার বন্ধু। বয়স যা-ই হোক, আপনার বন্ধুত্ব হবে সংস্কে।

প্রশ্ন : পাশ্চাত্যের দেশগুলো অবিদ্যা দ্বারা আক্রান্ত। কিন্তু মেধার বিকাশের ক্ষেত্রে বা বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য এগিয়ে আছে। অথচ সেক্ষেত্রে আমাদের দেশে সুযোগ নেই বললেই চলে। তাহলে পাশ্চাত্যে গিয়ে আমাদের জ্ঞান সাধনার চেষ্টা কি অবিদ্যা প্রসূত?

উত্তর : বিদ্যা এবং প্রযুক্তি- এ দু’টো আলাদা বিষয়। প্রযুক্তি আপনি ভালো কাজে ব্যবহার করবেন না খারাপ কাজে ব্যবহার করবেন সেটা নির্ভর করবে আপনার বিদ্যা বা অবিদ্যার উপরে। অবিদ্যা দ্বারা প্রভাবিত হলে খারাপ কাজে এবং বিদ্যা দ্বারা প্রভাবিত হলে ভালো কাজে ব্যবহার করবেন।

অতএব প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা করার জন্যে পাশ্চাত্যে যেতে হলে আমেরিকা, ইংল্যান্ড বা চীন, জাপান- যেখানে হোক, যাবেন। কারণ জ্ঞানে ও প্রযুক্তিতে আপনাকে দক্ষ হতে হবে। তা না হলে আপনার সত্যতা শক্তিশালী হবে না।

কিন্তু আসলে আমরা ক’জন এ কাজে বিদেশে যাচ্ছি? যেসব তরুণ-তরুণী পড়াশোনার নামে বিদেশে যায় তাদের অধিকাংশই পড়াশোনা করে না। ইংলিশ মিডিয়ামে ‘এ’ লেভেল শেষ করে যারা বিদেশে যায়, তাদের ৯০% ভাগই আর পড়াশোনা করে না। কারণ ১৮/১৯ বছরের একজন তরুণ-তরুণী সহজেই পাশ্চাত্যের অপসংস্কৃতিতে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। তাই পোস্ট গ্রাজুয়েশনের জন্যে বিদেশে যেতে পারেন, কারণ ততদিনে আপনার বোধ-বুদ্ধি এমন পর্যায়ে যাবে যে, ঐ পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে।

প্রশ্ন : যে মা-বাবা সন্তানের প্রাতিষ্ঠানিক খরচ অনায়াসে বহন করেন, কিন্তু সন্তান যখন হক্কুল ইবাদের জন্যে টাকা চায় তখন তারা এড়িয়ে যান- সেক্ষেত্রে সন্তানের কি করণীয়?

উত্তর : মা-বাবার টাকায় সন্তানের হক্কুল ইবাদ করার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ অন্যের টাকায় হক্কুল ইবাদ হয় না। তবে মা-বাবাকে হক্কুল ইবাদ করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আর ভালো কাজে মাকে উদ্বুদ্ধ করা খুব সহজ। টাকা চাইলাম, মা-বাবা দিলেন না, আর অবিদ্যা হয়ে গেলো এটা ঠিক নয়।

ফাউন্ডেশন সংবাদ

ঢাকায় কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআন

ধ্যানের স্তরে কোরআন তেলওয়াত ও তরজমা শ্রবণের মাধ্যমে কোরআন খতমের জন্যে এবছরও পবিত্র রমজান মাসে অনুষ্ঠিত হচ্ছে কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআন। প্রথম ব্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ৩১ অক্টোবর থেকে ৬ নভেম্বর এবং দ্বিতীয় ব্যাচ ৭ নভেম্বর থেকে ১৩ নভেম্বর। দু'টি ব্যাচই হবে কাকরাইলস্থ কোয়ান্টাম মেডিটেশন হলে। আখেরী দোয়ার অনুষ্ঠানটি হবে ১৪ নভেম্বর, শুক্রবার সূর্যম কোর্ট বার এসোসিয়েশন মিলনায়তনে।

অংশগ্রহণ ফি ছাত্র-ছাত্রী ৩০০/-, সাধারণ ৫০০/-, দোয়া অনুষ্ঠানের জন্যে ছাত্র-ছাত্রী ১৫০/-, সাধারণ ২০০/-।

মা-জীর রাজশাহী সফর

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন-এর মহাপরিচালক মা-জী নাহার আল বোখারী গত ৩০ সেপ্টেম্বর দু'দিনের সফরে রাজশাহী গমন করেন। মঙ্গলবারের হিলিং, মাস্টার মেডিটেশন এবং পাঠচক্র পরিচালনা করার পর এদিন তিনি রাত দশটা পর্যন্ত গ্রাজুয়েটদের ব্যক্তিগত সাক্ষাত প্রদান করেন। পরদিন ১ অক্টোবর মা-জীর পরিচালনায় সকাল ১০টা থেকে দু'ঘণ্টাব্যাপী মহিলাদের একটি বিশেষ ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৭৩ জন মহিলা অংশ নেন। বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় মহিলাদের নিয়ে ব্যায়ামের ওয়ার্কশপ। এতে ৪০ জন মহিলা অংশ নেন। এরপর তিনি রাজশাহী সেন্টারের দায়িত্বশীলদের সঙ্গে বৈঠক করেন। রাজশাহী সফরকালে শতাধিক গ্রাজুয়েট মা-জীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাত করেন। দীর্ঘ দিন পর তার রাজশাহী সফর গ্রাজুয়েটদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহের সঞ্চার করে।



বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমে সিলেট সেন্টারের পরিচালক মো. সীতাব আলী ও সহযোগীবৃন্দ

চীন ও হংকং- এ ব্লাড ক্যাম্প

কোয়ান্টামের স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের প্রভাব এখন দেশের বাইরেও পড়ছে। কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট সিরাজুল ইসলাম মৃধার নেতৃত্বে গত ৯ জুলাই চীনের সেনজিন-এ এবং ৩০ জুলাই হংকং-এ রেড ক্রসের কেন্দ্রীয় অফিসে দুটো রক্তদান ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। চীনের ক্যাম্পে ৭ জন রক্ত দেন যা স্থানীয় পত্রিকা ও টিভিতে প্রচারিত হয়। হংকং-এর ক্যাম্পে রক্ত দেন ৫ জন।

পরিচালক সমন্বয় সুরাইয়া রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

ব্যক্তিগত সফরে
মাসাধিককাল
বিদেশে অবস্থানের
পর গত ৬ অক্টোবর
দেশে ফিরেছেন
কোয়ান্টাম
ফাউন্ডেশনের
পরিচালক সমন্বয়
মিসেস সুরাইয়া
রহমান।



তার অনুপস্থিতিতে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমে সংশ্লিষ্টদের পূর্ণ সহযোগিতার জন্যে তিনি সকলকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

খুলনায় গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ

গত ২৯ অক্টোবর ফাউন্ডেশনের খুলনা শাখার উদ্যোগে নগরীর হোটেল ক্যাসেল সালামে এক দিনব্যাপী গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। “প্রাচুর্য ও সুস্বাস্থ্যের জন্যে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব” শীর্ষক এই ওয়ার্কশপ পরিচালনা করেন গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক। এতে অংশ নেন যশোর ও খুলনার ৭০ জন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট। প্রায় আড়াই বছর পর গুরুজীর খুলনা আগমনে গ্রাজুয়েটদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। ওয়ার্কশপ শেষে রাত ১০টা পর্যন্ত চলে গ্রাজুয়েট সাক্ষাত এবং সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের সঙ্গে বৈঠক।

সিলেট সেন্টারে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম

গত ৬ সেপ্টেম্বর কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন সিলেট সেন্টারের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ অভিযান হয়। শহরতলির লাখাউড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, লাখাউড়া মসজিদ ও মাদ্রাসায় এবং আলী বাহার টি গার্ডেন ঈদগাহ ও মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে মোট ২১৭টি চারা রোপণ করা হয়।



চীনের সেনজিনে রেডক্রস কর্মকর্তাদের সঙ্গে ক্যাম্পের উদ্যোক্তারা

১৬৭ ব্যাচের নবীন বরণ অনুষ্ঠান

গত ২৪ সেপ্টেম্বর কাকরাইলস্থ কোয়ান্টাম মেডিটেশন হলে অনুষ্ঠিত হয় ১৬৭ ব্যাচের নবীন গ্রাজুয়েট বরণ। শতাধিক নবীন গ্রাজুয়েট ও অতিথি এতে উপস্থিত ছিলেন।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন কার্যক্রমের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের সাথে পরিচিতি, আপ্যায়ন পর্ব, নবীন গ্রাজুয়েটদের উপলব্ধি, মা-জী ও গুরুজীর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এবং সবশেষে আখেরী মেডিটেশনের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয় এ নবীন বরণ।

প্রো-কোয়ান্টিয়ার কার্যক্রম শুরু

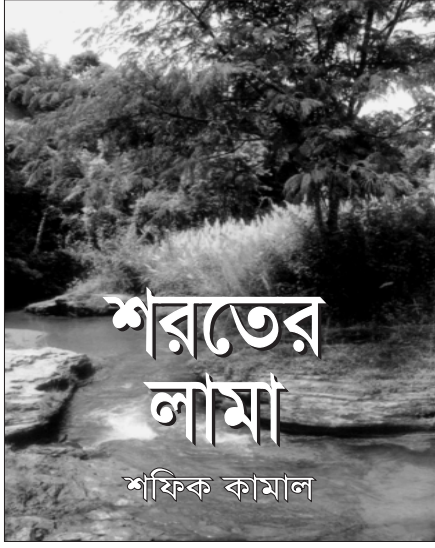
গত ৩ সেপ্টেম্বর বিকেল ৩টায় শান্তিনগরস্থ কেন্দ্রীয় অফিসে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রো-কোয়ান্টিয়ার কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক। কোয়ান্টিয়ার বা অনন্য মানুষ হওয়ার সাধনায় নিজেকে সম্পৃক্ত করার প্রক্রিয়াই হলো এই প্রো-কোয়ান্টিয়ার কার্যক্রম, যাতে অগ্রগতি হবে ধাপে ধাপে। ঢাকার বিভিন্ন শাখার শতাধিক স্বেচ্ছাসেবী গ্রাজুয়েট-মাস্টার এতে উপস্থিত ছিলেন। দাতা হওয়ার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে প্রথম এসাইনমেন্ট হিসেবে সবাইকে নিজ নিজ পরিবারে কি কি দেয়া যায়, বিশেষত ভালো ব্যবহার কীভাবে করা যায় এবং সে প্রেক্ষিতে নিজের অবস্থান কি ইত্যাদি প্রসঙ্গে আত্মপর্যালোচনা লিখিত আকারে নিয়ে আসতে বলা হয় পরবর্তী দিনের জন্যে।

চট্টগ্রাম সেন্টারের গ্রাজুয়েট পুনর্মিলনী

আগামী ১৭ অক্টোবর শুক্রবার বিকেল ৩টায় পাহাড়তলী চক্ষু হাসপাতাল মিলনায়তনে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন চট্টগ্রাম সেন্টারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এক গ্রাজুয়েট পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান। ১৯৯৩, ১৯৯৪ এবং ১৯৯৫ সালে অনুষ্ঠিত কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের বিভিন্ন ব্যাচে অংশগ্রহণকারী সতীর্থ গ্রাজুয়েটদের পারস্পরিক যোগাযোগ এবং ফাউন্ডেশনের সাথে সংযোগকে বেগবান করার উদ্দেশ্যেই এ আয়োজন। সংশ্লিষ্টদের নাম নিবন্ধনের জন্যে আমন্ত্রণ জানানো যাচ্ছে।

চট্টগ্রামে কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআন

চট্টগ্রাম সেন্টারের কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআন অনুষ্ঠিত হবে ১ নভেম্বর থেকে ৭ নভেম্বর। আখেরী মোনাজাত ও ইফতার মাহফিল হবে ৭ নভেম্বর শুক্রবার, সমাপনী দিনে।



বর্ষা শেষ। চারদিকে এখন শরতের স্নিগ্ধ আভা। আর সে ছোঁয়া লেগেছে লামাতেও; তবে তা যেন একটু বেশি। শহরের ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ পরিবেশে যদি ক্রান্ত হয়ে যান তবে আপনি বেড়িয়ে আসতে পারেন লামা থেকে। উপভোগ করতে পারেন শরতের অনাবিল সৌন্দর্য।

রাস্তা যদিও একটু এবড়ো-খেবড়ো, তবে যারা অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমী ও দুঃসাহসী তাদের কাছে এটা রীতিমত রোমাঞ্চকর। পথে দেখতে পাবেন চমৎকার প্রাকৃতিক পরিবেশ। দেখতে পাবেন একই ঘরের সামনের অংশ দোকান আর পেছনের অংশ বাসস্থান হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে; দেখতে পাবেন একই সাথে দোকানে পণ্য বিক্রি হচ্ছে আবার সেই দোকানেই ডাক বিভাগের কার্যক্রম চলছে; যেসব এতদিন পড়েছেন সেবার ওয়েস্টার্ন গল্পগুলোতে।

কোয়ান্টাম মেডিটেশন রিসর্টে পৌঁছে গেটে সিকিউরিটিকে অনুমতিপত্র দেখানোর পর আপনি এগিয়ে যান বাংলোর দিকে। শিশুকাননের শিশুরা যদি আপনাকে দেখে ফেলে তাহলে চারদিক থেকে শুনতে পাবেন, “আসসালামু আলাইকুম।” সালাম দেওয়ার হিড়িক পড়ে যাবে। যেন এটাও কোনো মজার খেলা! এত “আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক” শোনার পর আপনি প্রাকৃতিক নিয়মেই প্রশান্তিতে অবগাহন করবেন। ভ্রমণের ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে। বাচ্চাদেরকে জিজ্ঞেস করুন “কেমন

আছে তোমরা?” আনন্দের সাথে তারা উত্তর দেবে— “বে.....শ ভালো।” সামনে এগিয়ে যান।

আলোকায়ন সেতু পার হওয়ার সময় আলোকায়ন থেকে দেখতে পাবেন ভূ-গর্ভস্থ পানি স্বয়ংক্রিয়ভাবে শাওয়ার দিয়ে বেরণেছে কোনো ধরনের মেশিন ছাড়াই। সৃষ্টি করেছে চমৎকার ফোয়ারা, স্রষ্টার অসীম করুণার নিদর্শন। এরপর হাওয়া মঞ্চ ডানে রেখে এগিয়ে যান বাংলোর দিকে। বাংলায় আপনি পাবেন উষ্ণ আতিথেয়তা। বাংলোর পাশেই দেখতে পাবেন চমৎকার বেশ কয়েকটি হরিণকে। হালকা নাস্তা খেয়ে বিশ্রাম নিন। তারপর চলে যান ‘আবে কুদরত’-এ। বর্নার পানিতে প্রাণভরে গোসল করুন। এই বর্নার পানির একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে— এর পানি দিয়ে গোসল করলে মুহূর্তেই শরীর-মন চাঙ্গা ও সজীব হয়ে যায়। দুপুরের পর চলে যান ‘তখতে তাজান্নি’-তে। তিন তলা বিশিষ্ট এই মঞ্চ দাঁড়িয়ে দিগন্তের পাহাড় দেখতে পাবেন— যেখানে নীল আকাশ আর সবুজ গাছপালায় ছাওয়া পাহাড় একসাথে মিশে গেছে। হয়তো দু’এক খণ্ড মেঘ পাহাড়ের গায়ে ঝুলে রয়েছে। আপনি মেঝের ভেলায় চড়ে দিগন্তের দূর নীলিমায় ঘুরে আসতে পারেন, একদম ফ্রি। তারপর চলে যান ‘জাবলে শামস’-এ। জাবলে শামসে গিয়ে ৮/১০ ফিট উঁচু সারি সারি গাছগুলোকে দূর থেকে চা বাগান মনে করবেন না। ওগুলো আসলে রং গাছ। তার সাথে আছে প্রাকৃতিকভাবেই আত্মজন্মা অসংখ্য আমলকি গাছ। ছোট ছোট আমলকি গাছগুলোতে প্রচুর পাকা আমলকি রয়েছে। এদের স্বাদও বেশ চমৎকার। ক্ষমা মঞ্চ ও করুণা মঞ্চ বসে মেডিটেশন করুন। ঝির ঝির বাতাসে উপভোগ করুন মেডিটেশনের গভীরতা।

মাগরিবের নামাজের আগে বাংলায় বসে দেখতে পাবেন তিতরগুলো রাত্রি যাপনের জন্য উড়ে উড়ে আম গাছে উঠছে। নামাজের পর নাস্তা খেতে খেতে গল্প করুন রিসর্টের কো-অর্ডিনেটর আনোয়ার আল হক-এর সঙ্গে। জানতে পারবেন লামা সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য।

রাত একটু গভীর হলে বাংলা থেকে এবার চলে আসুন ‘হাওয়া মঞ্চ’-এ। এখানে রাতের মেঘমুক্ত আকাশের দিকে তাকালে দেখা যাবে তারা’রা সব মেলা বসিয়েছে। নৈশ প্রকৃতির এই আবহে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আপনি নত হয়ে যাবেন স্রষ্টার উদ্দেশ্যে। নিজেকে মনে হবে মুক্ত, স্বাধীন। স্বর্গীয় প্রশান্তিতে ভরে উঠবে আপনার মন। মাঝরাতে আপনার ঘুম ভেঙ্গে যেতে পারে অজানা কোনো পশুর ডাকে। ভয় পাবেন না। বর্নার ওপাশের পাহাড় থেকে হরিণের ডাক ভেসে আসছে। আরও আছে তক্ষক। হঠাৎ হঠাৎ বেশ গভীর গলায় ডেকে ওঠে।

সকালবেলা দেখবেন বাংলোর সামনে কিছু ঘুঘু পাখি ঘুরে বেড়ায়। এদের সাথে কথা বলতে বলতে ধ্যান ঘরের দিকে এগিয়ে যান। সেখানে শিশির ভেজা পথে পড়ে রয়েছে অসংখ্য শিউলি ফুল। শিউলি ছাড়া শরতকে যেন ঠিক মানায় না। শিউলির মিষ্টি গন্ধ গায়ে মেখে আর আমলকি বাগানে পড়ে থাকা আমলকি কুড়াতে



লামা মেডিটেশন রিসর্টের একটি কটেজ

কুড়াতে আপনি চলে যাবেন পৃথিবীর অন্তরালে আরেক পৃথিবীতে। মনে হবে জীবন আসলে সত্যিই অর্থপূর্ণ। জীবন আসলে বড় কিছু করার জন্যে।

বর্না ধরে এগিয়ে যান আবে শেফায়। সেখানে ফুটে আছে শরতের সৌন্দর্য কাশ ফুল। সেখান থেকে গোসল করে ধ্যান ঘরে গিয়ে মেডিটেশন করুন। ধ্যান ঘরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া বর্নার শব্দ মনোযোগ দিয়ে শুনুন। এই বর্নার কলকল ধ্বনির তন্ময়তা এত বেশি যে, আপনি মুহূর্তে পৌঁছে যাবেন ধ্যানের স্তরে।

আপনি যদি অ্যাডভেঞ্চার প্রেমী হন, তাহলে আপনার জন্য আছে ‘চিচিং ফাঁক’। এক অন্ধকারাচ্ছন্ন টানেল। কোথাও আছে প্রপাত; কোথাও সুড়ঙ্গ; কোথাও গাছের লম্বা লম্বা মোটা ঝুরি যা ধরে টারজান ছবির মতো ঝুলে চলে যাওয়া যায় এক স্থান থেকে আরেক স্থানে; আছে প্রাকৃতিক বাস্কার; যা অনেক অ্যাডভেঞ্চার ছবির দৃশ্যকেও হার মানায়।

সবশেষে ঘুরে দেখুন শিশুকানন। পাহাড়ের এই দুর্গম পরিবেশে এইসব বাচ্চাদের আধুনিক সুযোগ সুবিধা, মানসম্পন্ন লেখাপড়ার ব্যবস্থা আর মার্জিত আচরণ শুধু মুগ্ধই করবে না, বিস্মিতও করবে। মেধাবী এইসব শিশুরা শুধু লেখাপড়াই নয়, নাচগান ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে দারুণ পারদর্শী। বঞ্চিত এইসব শিশুদের মুখে হাসি ফুটেছে আপনারই দেয়া অর্থে। শিশুদের এই হাসি দেখে আপনার হৃদয়ও প্রশান্তিতে ভরে উঠবে।

ফিরে আসার সময় এইসব কোমলমতি বাচ্চারা আপনাকে হাত নেড়ে নেড়ে বলবে খোদা হাফেজ, খোদা হাফেজ। এই প্রশান্তির কি কোনো তুলনা আছে? আসলে লামায় না গেলে প্রশান্তি ও আনন্দের এই অনুভূতি অনুভব করা কঠিন।

[লেখক লামা মেডিটেশন রিসর্টের কর্মী]



শিশুকাননের নুর হল (জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম হল)



সকাল সাড়ে আটটায় ঢুকলেই দেখতে পাবেন শিশুদের অ্যাসেম্বলি

হাজার ব্যাগ রক্ত সরবরাহ অক্টোবরে লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম

পরম করণাময়ের অনুগ্রহে গত অক্টোবর মাসে কোয়ান্টাম ল্যাব হাজার ব্যাগ রক্ত সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করেছে। মোট সরবরাহের পরিমাণ ১০৫৪ ইউনিট। এর মধ্যে হোল ব্লাড ৬৬৭ ইউনিট, আরসিসি ২৭৩ ইউনিট, প্লাটিলেট কনসেন্ট্রেট ৬৬ ইউনিট, ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা ২৯ ইউনিট, প্লাটিলেট রিচ প্লাজমা ১৩ ইউনিট এবং ক্রায়োপ্রিসিপিটেট ৬ ইউনিট।

উল্লেখ্য কোয়ান্টাম ল্যাব গত আগস্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে রোগীদের চাহিদা অনুযায়ী রক্তের সকল উপাদান সরবরাহ শুরু করে। ফলে এখন প্রতিদিন রক্ত উপাদানের জন্যে রোগীদের ভীড় বাড়ছে।

প্রতিবেদক : শাহেদ হাসনাইন রাবিত

গুরুজী ও মা-জীর সাথে ঈদ মোলাকাত

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে শ্রদ্ধেয় গুরুজীর সাথে ঈদ মোলাকাত অনুষ্ঠিত হবে গুরুজীর চামেলীবাগস্থ আবাসস্থলে। ঈদের দিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত গুরুজী ও মা-জী সকলের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন। গ্রাজুয়েট ও শুভাকাঙ্ক্ষী নির্বিশেষে কোয়ান্টাম পরিবারের সবাই আমন্ত্রিত।

ভলান্টারী সেফ ব্লাড প্রোগ্রাম এপ্রিসিয়েশন কোর্স

আগামী ৫ ডিসেম্বর শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ঢাকার কোয়ান্টাম মেডিটেশন হলে প্রথম বারের মত ভলান্টারী সেফ ব্লাড প্রোগ্রাম এপ্রিসিয়েশন কোর্স অনুষ্ঠিত হবে। গ্রাজুয়েটরা এ কোর্সে অংশগ্রহণের জন্যে নাম নিবন্ধন করতে পারেন।

ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসের কর্মসূচি

ঢাকায় ১৭১ ব্যাচের পরিচিতি সভা :
১০ ডিসেম্বর, ২০০৩ (বুধবার)
ঢাকায় গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ :
১২ ডিসেম্বর, ২০০৩ (শুক্রবার)
ঢাকায় ১৭১ ব্যাচের কোর্স :
১৯, ২০, ২১ ও ২২ ডিসেম্বর, ২০০৩ (শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)
সিলেট গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ :
২৯ ডিসেম্বর, ২০০৩ (সোমবার)
সিলেটে ১৭২ ব্যাচের পরিচিতি সভা :
৩০ ডিসেম্বর, ২০০৩ (মঙ্গলবার)
চট্টগ্রামে গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ :
২ জানুয়ারী, ২০০৪ (শুক্রবার)
চট্টগ্রামে ১৭৪ ব্যাচের পরিচিতি সভা :
৩ জানুয়ারী, ২০০৪ (শনিবার)
ঢাকায় ১৭৩ ব্যাচের পরিচিতি সভা :
৭ জানুয়ারী, ২০০৪ (বুধবার)



কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআন কোরআন চর্চায় নতুন মাত্রা



খতমে কোরআনে অংশগ্রহণকারী মহিলাদের একাংশ

ধ্যানের স্তরে কোরআন তেলওয়াত ও তরজমা শোনা ও অনুধাবন করার মাধ্যমে রমজান মাসে পবিত্র কোরআন খতম করার প্রক্রিয়া এখন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট ছাড়াও ধর্মপ্রাণ মানুষ এই পদ্ধতিতে কোরআন চর্চা করে উপলব্ধির এক নতুন স্তরে নিজেদের উন্নীত করছেন। আগে যা ছিলো সাধারণ শ্রোতাদের কাছে দুর্বোধ্য শব্দের শ্রবণ ও পঠন, তা-ই তরজমা যুক্ত হয়ে এখন হয়ে উঠেছে এক অর্থবহ দিক নির্দেশনা। কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআন এক দিক থেকে যেমন নতুন উপলব্ধির দরজা উন্মোচন করে, অন্যদিকে তা অংশগ্রহণকারীকে বিশাল সওয়াবের অধিকারী করে।

যৌথ কোয়ান্টায়ন কালে ৪৫ ঘণ্টার কোরআন ধ্যান কমপক্ষে ১০৮ কোটি ৫ লক্ষ ৫০ হাজার বছর নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম। কারণ নবীজী বলেছেন এক ঘণ্টার ধ্যান সত্তর বছরের নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম। আর রমজান মাসে যে কোনো ইবাদতের সওয়াব হয় কম পক্ষে ৭০ গুণ। আর জামায়াতে বা যৌথভাবে কোনো ইবাদত করলে তার সওয়াব

বাড়ে ৭০ গুণ। কোরআন শিক্ষা যেহেতু ফরজ তাই ফরজ কাজের সওয়াব নফলের ৭০ গুণ। তাই হিসেব করলে দাঁড়ায় (৪৫ ঘণ্টা X ৭০) বছর X ৭০ X ৭০ X ৭০ = ১০৮,০৮,৫০,০০০ বছর।

বাসায় এইভাবে কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআনের আয়োজন করলেও সওয়াব হবে কমপক্ষে ১ কোটি ৫৪ লক্ষ ৩৫ হাজার বছরের ইবাদতের চেয়ে বেশি।

কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআনে অংশগ্রহণের আগ্রহ বাড়ার ফলে এ বছর ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী সহ বিভিন্ন স্থানে একক ও যৌথভাবে এই কোয়ান্টায়ন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

ঢাকায় প্রথম ব্যাচ কোয়ান্টায়ন অনুষ্ঠিত হয় ৩১ অক্টোবর থেকে ৬ নভেম্বর। ৪৫ ঘণ্টার এই কোয়ান্টায়নে গ্রাজুয়েট, ননগ্রাজুয়েট অতিথিসহ মোট ১৩১ জন অংশ নেন।

দ্বিতীয় ব্যাচের খতমে কোরআন শুরু হয় ৭ নভেম্বর। এতেও ১৪০ জন অংশ নিয়েছেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা ছিল বেশি।

প্রতিবেদক : রোকেয়া হক

নিজেকে নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া শিখেছি মনিরা সুলতানা

পেশাগত
জীবনে
দায়িত্বশীল
পদে নিয়োজিত
থাকার কারণে
প্রো-অ্যাকটিভ
হওয়াটা আমার
জন্যে খুবই



গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেই ছোটবেলা থেকেই আমার সমস্যা হলো অল্পতে রেগে যাওয়া এবং আবেগপ্রবণ হয়ে পড়া।

স্বাভাবিকভাবেই এর ফলে অন্যদের সাথে সম্পর্কের টানাপোড়েন ঘটতো আর আমিও অনেকদিন ধরে অনুশোচনায় ভুগতাম। বিশেষ করে অফিসে সহকর্মী বা বসের সাথে মেজাজ দেখানোর ফল কি, তা সহজেই অনুমেয়। কারণ তারা আমার ঐ আচরণকে মনে রেখেই আমার সঙ্গে সম্পর্কের দূরত্ব তৈরি করতেন।

নিজেকে শোধরানোর জন্যে আমি অনেক চেষ্টা করেছি। আত্মউন্নয়ন বিষয়ে প্রচুর পড়াশোনা করেছি, বইয়ের ভালো কথাগুলো দাগিয়ে রেখেছি। বহুবার প্রতিজ্ঞা করেছি আগামীকাল থেকে আমি আর এরকম করবো না। কিন্তু ঘটনার মুহূর্তে আর নিজেকে সামলাতে পারতাম না। রাগ-ক্ষোভে ফেটে পড়তাম।

আমার মনে হতো, আত্মউন্নয়ন বিষয়ক তথ্যের আমার কোনো অভাব নেই। কিন্তু তারপরও কেন আমি পারি না। গ্যাপটা কোথায়?

মেডিটেশন কোর্সে এসে বুঝলাম গ্যাপটা আসলে প্রক্রিয়ার মধ্যে। তাত্ত্বিক জ্ঞান এবং তথ্য কোনো কাজে আসবে না, আচরণে কোনো পরিবর্তন ঘটবে না যদি না একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেই তথ্যগুলো বাস্তবে কাজে লাগানোর মতো করে আয়ত্ত করা যায়। আর কোয়ান্টাম মেডিটেশন কোর্স হলো সেই প্রক্রিয়া।

পেশাগত জীবনে আমার কাজের ক্ষেত্র হলো শিশু অধিকার রক্ষা। সে অভিজ্ঞতা থেকে আমার মনে হয়েছে শিশুদের মানসিক এবং মানবীয় গুণাবলি বিকাশের জন্যে এবং সূনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে মেডিটেশন খুবই কার্যকর একটি প্রক্রিয়া হতে পারে। কারণ যে কোনো শিক্ষা গ্রহণ করার মতো শারীরিক-মানসিক উপযুক্ততা অর্জন মেডিটেশনের মাধ্যমেই সম্ভব।

আমি আমার কাজের ক্ষেত্রেও এটি প্রয়োগ করার চেষ্টা করবো।

[মনিরা সুলতানা সেভ দ্যা চিলড্রেন-এর ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর, ১৫৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

মো. জহিরুল ইসলাম ॥

ধ্যান তাকে দিয়েছে প্রশান্তি দিয়েছে নব জীবনের প্রেরণা



১৯৭৭ সালে সুদূর লক্ষ্মীপুর থেকে একজন তরুণ এইচ.এস.সি পাশ করে জীবিকার সন্ধানে ঢাকা আসেন। চাকরি নেন একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে। চাকরির পাশাপাশি তেজগাঁও কলেজে নাইট শিফটে ভর্তি হন বি.কম ক্লাসে। এভাবে একটি সংগ্রামমুখর জীবন শুরু করেন আজকের সফল মানুষ কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট মো. জহিরুল ইসলাম। জীবনের নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে আজ তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী, ফটোগ্রাফী ও স্টুডিও সামগ্রীর জগতে অনন্য নাম 'ট্রেড কর্পোরেশন'-এর স্বত্বাধিকারী। বর্তমানে এফ.বি.সি.সি.আই-এর জেনারেল বডি মেম্বর। তিনি ২০০০-২০০২ সালে বাংলাদেশ ফটোগ্রাফিক এসোসিয়েশন-এর সেক্রেটারী জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ডিগ্রী পাশ করার পর জহিরুল ইসলাম চাকরি ছেড়ে দিয়ে চট্টগ্রামে চলে যান। শুরু করেন নিজস্ব ব্যবসা 'সিএন্ডএফ' এজেন্সী। এরপর ঢাকা এসে ব্যবসায়ের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু করেন। প্রতিষ্ঠা করেন স্টুডিও কাঁচামাল বিক্রয় প্রতিষ্ঠান 'ট্রেড কর্পোরেশন'। ক্রমান্বয়ে তিনি ক্যামেরা, কালার এনলারজার, অটো প্রসেসর, ল্যামিনেটিং মেশিন ইত্যাদি ইকুইপমেন্ট সংযোজন করে তার পণ্য তালিকাকে সমৃদ্ধ করেন। এই পণ্যগুলো বাংলাদেশে বাজারজাত করার জন্যে জাপান, কোরিয়া, চায়না, জার্মানী সহ বিভিন্ন দেশের বিখ্যাত কয়েকটি কোম্পানীর এজেন্সী লাভ করেন।

মানুষের জীবন অনেকটা পাহাড়ী পথের মতো। সর্বত্র সমতল নয়। ১৯৯৭ সালে বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে জহিরুল ইসলামের ব্যবসায় ব্যাপক ধ্বস নেমে আসে। অর্থনৈতিক অবনতিতে দিশেহারা হয়ে পড়েন। শারীরিক ও মানসিকভাবে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েন। তিনি এ থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজতে থাকেন।

এ সময় তিনি ৫৭ ব্যাচে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশগ্রহণ করেন এবং 'প্রশান্তি, সুস্বাস্থ্য ও সাফল্যের জন্যে মেডিটেশন'-এই বাণী দ্বারা গভীরভাবে আলোড়িত হন। তিনি বলেন, কোর্স করার পর আমি সাফল্যের জন্যে মনোনিবেশ করতে শুরু করি এবং আমার এ বিশ্বাস জন্মে যে, বাস্তব সাফল্য এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। সত্যি সত্যিই কয়েক মাসের মধ্যেই আমি বাস্তবে পরিবর্তন অনুভব করি এবং এক সময়ে সব ঠিক হয়ে যায়।

কিন্তু বেশি দিন সব ঠিক থাকে নি। আকস্মিকভাবে ১৯৯৯ সালে তার জ্বর মৃত্যু হয় মাত্র ৩০ বছর বয়সে। ২ সন্তানের জননী স্ত্রীর অকাল মৃত্যুতে তিনি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। শোকে পাথর হয়ে যান। এ সময় তিনি ১৯ দিন পর্যন্ত ঘুমাতে পারেন নি, তার নার্ভাস ব্রেক ডাউন হয়ে স্মৃতি শক্তি

লোপ পায়। ব্যবসা-বাণিজ্য সব বন্ধ।

এ অবস্থায় তিনি গুরুজীর সাথে দেখা করেন এবং তার বিশেষ পরামর্শে দিনে ২ বার মেডিটেশন শুরু করেন। গুরুজীর সাথে সাক্ষাতের দিনই তিনি প্রথমবারের মতো রাতে ৪ ঘণ্টা ঘুমাতে পারেন। এর পর থেকে গুরুজীর সান্নিধ্য পেয়ে তিনি আবার কাজে মনোযোগ দেন এবং জীবনে স্বাভাবিকতা ফিরে আসতে থাকে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, একজন সংস্কৃত দিক-নির্দেশনা একজন মৃতপ্রায় ব্যক্তিকেও নব জীবনের পথ দেখাতে পারে।

পরবর্তীতে জহিরুল ইসলাম কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সৃষ্টির সেবামূলক কার্যক্রমে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। লামার শিষ্টকাননে সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়াও নিজ গ্রামে একটি এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেছেন প্রয়াত স্ত্রী হাসিনা পারভীন-এর স্মরণে।

২০০১ সালে তিনি তার ব্যবসা আরো সম্প্রসারণ করেন এবং একটি কালার ল্যাব 'কালার বাজার' প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে তার বিভিন্ন অফিসে নিয়োজিত কর্মচারী-কর্মকর্তার সংখ্যা প্রায় ৬০ জন। প্রতি বছর ২ বার তার অফিসে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প-এর আয়োজন করেন। ফাউন্ডেশনের রক্ত কার্যক্রমের তিনি কো-অর্ডিনেটর।

জহিরুল ইসলাম মনোবিষয় মেডিটেশন করতে সবসময় খুব আনন্দ পান। তার জীবনের সাফল্যও এ ব্যাপারটিকে প্রত্যয়িত করে। গত বছর থেকে তিনি মনোবিষয় দেখতে শুরু করেন একটি ডিজিটাল কালার ল্যাব প্রতিষ্ঠার। যেখানে ছবিকে গ্রাহকের ইচ্ছানুযায়ী ম্যানিপুলেট করা যায়। তিনি খবর পান জাপানের Noritsu কোম্পানী বাংলাদেশে তাদের প্রথম মেশিনটি আকর্ষণীয় ডিসকাউন্টে বিক্রি করবে। কিন্তু এর মধ্যে তিনি সহ মোট চার জন এটি কেনার জন্যে প্রার্থী হন। অবশেষে কোম্পানীর একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে আসেন যাচাই করার জন্যে যে, কার কাছে তারা প্রথম মেশিনটি বিক্রি করবেন। একে একে সবাইকে তারা ইন্টারভিউ করেন। অবশেষে জয় হলো 'মনোবিষয়'। প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা সাশ্রয় করে তিনি মেশিনটি কিনতে সক্ষম হন।

সম্প্রতি তিনি ধানমণ্ডিতে একটি তৈরি বাড়ি কেনেন। তিনি মনোবিষয় দেখতেন ওখানে একটি বাড়ি কিনবেন ১০ কাঠার উপর। কিন্তু ধানমণ্ডির সব প্লট গড়ে উঠেছে ২০ কাঠার উপর। তারপরও তিনি মনোবিষয় দেখতে থাকেন। অবশেষে একটি বাড়ি পাওয়া গেল। ২০ কাঠার উপর নির্মিত ২টি বাড়ির একটি বিক্রি হচ্ছে। তিন তলা বাড়িটি মোটামুটি লেটেস্ট মডেল। জহিরুল ইসলাম পছন্দ করলেন এবং স্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন এমন একটি তৈরি বাড়ি কিনতে পেরে। তার অনেক দিনের স্বপ্ন তিনি নিজ বাড়িতে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের একটি শাখা/সেল খুলবেন, এবার তার পথ সুগম হলো। আগামী ১৯ ডিসেম্বর জহিরুল ইসলামের নতুন বাড়িতে পুনরুজ্জীবিত হতে যাচ্ছে ফাউন্ডেশনের ধানমণ্ডি শাখা।

এভাবে জহিরুল ইসলামের জীবনে একটি অনিবার্য অনুভব হিসেবে যুক্ত হয়েছে মেডিটেশন। ধ্যানের শক্তিতে আত্মস্থ হয়ে তিনি জীবনের বন্ধুরতা পাড়ি দিয়েছেন, প্রশান্তি পেয়েছেন, সাফল্য হয়েছে তার নিত্যসঙ্গী।

প্রতিবেদক : মোহাম্মদ রায়হান



স্ত্রী হোসনা ইয়াসমিন নূপুর, ছেলে রিয়াজত এবং মেয়ে রামিশাকে নিয়ে মেডিটেশনে মগ্ন জহিরুল ইসলাম

আমি যখন ক্লাস নাইনে পড়ি তখন একদিন দুপুর রোদে হেঁটে গিয়েছিলাম এক ফটোকপির দোকানে। বেশ খানিকটা পথ হাঁটার পর দোকানে পৌঁছে এমনিই মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, আহ বাঁচলাম! ঠিক তখনই দোকানদার কি ভেবে আমার হাতে ধরিয়ে দিলো দশ পয়সার একটি মুদ্রা। কয়েক মুহূর্ত শুরু হয়ে থাকার পর বুঝলাম ভিক্ষুক ভেবে দোকানদার আমাকে ঐ পয়সাটি দিতে চেয়েছিলো। আমিও আর কোনো কথা না বলে ফটোকপির দাম চুকিয়ে চলে এলাম। খুব ছোটবেলায় পোলিওর কারণে পঙ্গুত্ব বরণ করার পর এরকম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছি বহুবারই। কিন্তু কখনও ভেঙ্গে পড়ি নি। বরং ভেবেছি আমাকে যে হয় করছে তার দৃষ্টিভঙ্গিই ভুল, আমার তাতে কিছু করার নেই।

জীবনে এগিয়েছিও এই মনোবলকে সম্বল করে। স্কুল-কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে এখন আইসিএমএবিতে পড়ছি। নিজের পড়া, টিউশনী, বাজার-সওদা করা থেকে শুরু করে পরিবারের অভিভাবক হিসেবে যত রকম কাজ সবই আমাকে করতে হয়। করণাময়ের অনুগ্রহে এসব কাজের জন্যে আমাকে অন্য কারও উপর নির্ভর করতে হয় না।

তবে এ বছরের মে মাসে অনুষ্ঠিত কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশগ্রহণ আমার উপলব্ধিকে

ভালো আছি ভালো থাকবো মুহম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন

দারণভাবে প্রভাবিত করেছে। মেডিটেশনকে আমি গ্রহণ করেছি অত্যন্ত সিরিয়াসভাবে। কারণ কোর্স করার মাত্র সাত দিন পর থেকেই আমি সাফল্য পেতে শুরু করেছি। যে সমস্যার সমাধান আগে অসম্ভব বলে ভাবতাম তা-ই পেলাম খুব সহজভাবে।

আগের চেয়ে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী আমি। চারপাশের বাস্তবতা যেন আমার অনুকূলে কাজ করছে। যেমন, যখন আর্থিক সংকট নিয়ে ভাবছি তখন খুব সহজেই দুটো টিউশনী হয়ে গেল। আবার শারীরিক সামর্থ্য এবং পরিশ্রম করার ইচ্ছাশক্তিও এখন অনেক বেড়ে গেছে। এমনও হয়েছে একদিনে আমি ৮ কি.মি. হেঁটেছি, কিন্তু কোনো ক্লান্তি বোধ করি নি। অথচ আগে এর চেয়ে অনেক কম দূরত্ব হাঁটতে গেলোও



একটু পরপর বিশ্রাম নিতাম।

আমার জীবনের মনছবি হচ্ছে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করা। শুধুমাত্র শারীরিক প্রতিবন্ধী হবার কারণেই যেন কাউকে লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে না হয় সে লক্ষ্যে আমি কাজ করবো। প্রতিবন্ধীরাও দক্ষভাবে কাজ করতে পারে এমন সব কাজের সুযোগ সৃষ্টির জন্যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবো। যাতে প্রমাণ করতে পারি আমরা প্রতিবন্ধীরাও মানুষ। মেধার বিকাশ এবং

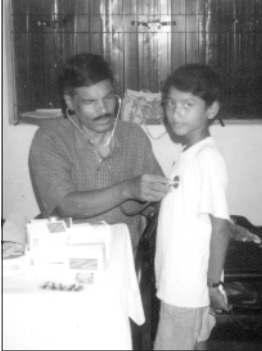
যোগ্যতা সৃষ্টির সুযোগ পেলে আমরাও পৃথিবীর জন্যে রাখতে পারি মূল্যবান অবদান।

মেডিটেশনের উপলব্ধি এবং কোয়ান্টামের শিক্ষা আমার এই মনছবি পূরণের পথে এক অমূল্য পাথেয় হিসেবে কাজ করবে।

[মুহম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন আইসিএমএবির ছাত্র, ১৬০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

ডা. রেজাউল ইসলাম

এক
লড়াকু
সেবকের
নাম



তার মটর
সাইকেলের হর্ণ
আর শোনা যাবে
না, ঘর্মান্ত হয়ে

ছুটতে ছুটতে এসে আর তিনি বসবেন না ফাউন্ডেশনের হিলিং মেডিটেশনে, সপ্তাহের রুটিন-মাসিক দিনগুলোতে তার জন্যে আলোআশা স্কুল আর মহিলা হাফেজিয়া মাদ্রাসার শিশুদের অপেক্ষার পালাও আর শেষ হবে না। কারণ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যে নতুন জগতে পা রেখেছেন তিনি সেখান থেকে এই পৃথিবীর জীবনে আর কেউ ফিরে আসে না।

গত ১৩ জুলাই ভোর ৪.৩০ মিনিটে ঢাকার পিজি হাসপাতালের ২০৮ নং কেবিনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের মধ্য দিয়ে ঘটলো ডা. রেজাউল ইসলাম নামের এক সংগ্রামী জীবনের ইতি (ইন্না.....রাজিউন)। ৪৮ বছরের জীবনের শেষ দশটি বছর তিনি অসীম সাহসে লড়াই করেছেন ঘাতক ব্যাধি ব্লাড ক্যান্সারের সঙ্গে। আর শেষ চারটি বছর শুধু নিজের শারীরিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধেই নয়, সেই সঙ্গে লড়েছেন আত্ম মানবতার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার সাধনায়ও। নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগুতে গিয়েও যে একজন মানুষ সেবায় নিজেকে এমনভাবে বিলিয়ে দিতে পারেন, তিনি রেখেছেন সেই অনন্য দৃষ্টান্ত।

১৯৫৫ সালের ২৬ জুলাই রাজশাহী জেলার বাঘা উপজেলার ছাত্তারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন রেজাউল ইসলাম। ছোটবেলা থেকেই ছিলেন পর

দুঃখকাতর এবং দাতা। অন্য কেউ করবে কি না তার অপেক্ষায় না থেকে তিনিই প্রথম ঝাঁপিয়ে পড়তেন বিপদে, সাহায্য করতেন সাধ্যমতো। তার এই পরার্থপরতা হয়তো সবসময় তার হিসেবী আয়ের সঙ্গে মিলতো না, স্ত্রী-সন্তানের অনেক চাওয়াই তিনি মেটাতে পারতেন না, কিন্তু ডা. রেজাউলের তাতে কোনো দ্রুপ ছিলো না। কারণ তিনি যে দিতেই ভালোবাসেন।

এমবিবিএস সম্পন্ন করে ডা. রেজাউল মেডিকেল অফিসার হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু করেন ১৯৮৩ সালে রাজশাহীর বাঘা উপজেলায়। দশ বছর সেখানে থাকার পর ১৯৯৪ সালে যোগ দেন রাজশাহী সিভিল সার্জন অফিসে। এর মধ্যেই মাত্র বছর খানেক আগে ১৯৯৩ সালে ধরা পড়ে তার শরীরে বাসা বেঁধেছে মরণব্যাদি ক্যান্সার। অনিশ্চয়তা আর হতাশার প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়েই নিজেকে সামলে নিলেন তিনি। স্ত্রী-সন্তান আর চারপাশের সাহায্য প্রার্থী মানুষের দিকে তাকিয়ে তিনি নতুন করে উঠে দাঁড়ালেন, পেলেন লড়াই করার সাহস।

এরও বছর পাঁচেক পরে ১৯৯৯ সালে রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৯৯তম ব্যাচে অংশ নেন তিনি। এই কোর্স খুলে দিলো ডা. রেজাউলের জীবনের এক নতুন দিক। বাঁচার মন্ত্রণা পেলেন তিনি নতুন করে। আর তাইতো মৃত্যুর মাস খানেক আগ পর্যন্তও নিজের চিকিৎসা তিনি নিজেই করেছেন, রাজশাহীতে বা ঢাকায় হাসপাতালে ভর্তি হতে চান নি।

এই আত্মবিশ্বাস এবং জীবনের আশা শুধু যে তার নিজের রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করতই সাহস যুগিয়েছে তা নয়, শারীরিক এ অবস্থাতেও রাজশাহীতে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সেবা প্রকল্প আলোআশা স্কুল এবং মহিলা হাফেজিয়া মাদ্রাসার ছোট ছোট শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছিলেন স্বেচ্ছায়। প্রতি সপ্তাহে নিয়মিতভাবে



স্ত্রী আকলিমা খাতুন এবং তিন পুত্রের সঙ্গে ডা. রেজাউল ইসলাম

তিনি সেখানে মেডিকেল চেকআপে যেতেন। তার তত্ত্বাবধানেই প্রথমবারের মতো এই শিশুরা শেখে স্বাস্থ্য রক্ষার প্রাথমিক নিয়মকানুন এবং কর্তৃপক্ষও বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তার পরামর্শ অনুযায়ী।

মেডিটেশন ছিলো ডা. রেজাউলের বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণার এক অতুলনীয় উৎস। জীবনের ব্যস্ততা, শারীরিক যন্ত্রণা ইত্যাদিকে উপেক্ষা করেও তিনি সুযোগ করে নিতেন মেডিটেশনে আত্ম নিমগ্ন হবার। পরবর্তীতে কোয়ান্টাম উচ্চতর কোর্সে অংশ নেন। কোয়ান্টাম চেতনায় পরিবারকেও উদ্বুদ্ধ করতে স্ত্রী এবং দু'ছেলেকে নিয়ে এসেছিলেন কোর্সে।

পেশা, পরিবার, ফাউন্ডেশন এসব নিয়েই এগুচ্ছিলো তার জীবন। হাসপাতালে ভর্তি হতে আসার আগের সপ্তাহেও তিনি ছুটে গেছেন অসহায় শিশুদের চিকিৎসায়। হাসপাতালে মুমূর্ষু অবস্থায়ও তিনি খোঁজ নিয়েছেন শিশুদের। সৃষ্টির প্রতি ভালবাসা আর স্রষ্টায় অবিচল বিশ্বাস নিয়েই পৃথিবীর ভ্রমণ শেষ করে প্রবেশ করলেন মহাজাগতিক ভ্রমণের পরবর্তী ধাপে। পরম করণাময়ের অনুগ্রহে এই নতুন জগত তার জন্যে হোক এক আনন্দময় অভিযাত্রা।

গ্রন্থনা : রাবেয়া নাজনীন

প্রত্যয়ন অনুষ্ঠানে গ্রাজুয়েটদের অনুভূতি

৩৬ বছরের ব্যাকপেইন ভালো হয়েছে

শুভেন্দু কানুনগো

এ বছর আগস্ট মাসে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ১৬৫তম ব্যাচে কোর্স করার ৩য় দিনটি আমার জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য দিন। কারণ এ দিনটিতেই সকালবেলা বিছানা থেকে নামতে গিয়ে বিস্মিত হয়ে খেয়াল করলাম গত ৩৬ বছর ধরে প্রতিদিনই ঘুম ভাঙার পর যে ব্যাকপেইন আমাকে কমপক্ষে ঘণ্টাখানেকের জন্যে কাবু করে রাখতো, তা আর টের পাচ্ছি না। অবশ্য বিস্মিত হলেও কাউকে কিছু বললাম না কারণ এতদিনের ব্যথা সত্যি সত্যিই সেরেছে কি না তা যাচাই করে দেখতে চাইলাম। সৃষ্টিকর্তার কৃপায় আজ এতদিন পরও আমি আর ব্যথা অনুভব করি নি। শুধু ব্যাকপেইনই নয় ক’বছর আগে বাইপাস সার্জারির সময় পায়ের ধমনীতে অস্ত্রোপচার করতে হয়েছিলো। ফলে হাঁটু ভাঁজ করতে পারতাম না। আর সাথে ছিলো ব্যথার কষ্ট। কিন্তু এখন প্রয়োজন হলে হাঁটু ভাঁজ করে ঘণ্টাখানেকও বসে থাকতে পারি। তাই মনের শক্তি যে ওষুধের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী নিরাময়কারী, এ বিশ্বাস আমাকে দিয়েছে মেডিটেশন, দিয়েছে সুস্থতার এক আনন্দময় অনুভূতি।

[শুভেন্দু কানুনগো একজন অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবী, ১৬৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

ক্ষমা করতে পেরেছি মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম

বাবার সাথে আমার সম্পর্ক ভালো নয়। কেন না তিনি আমার মাকে অনেক কষ্ট দিয়েছেন। এখন আমাদের ছেড়ে তিনি এক নতুন সংসার গড়েছেন। আমরা থাকি আমার নানার বাড়িতে। এমনকি আমাদের নিজস্ব কোনো বাড়ি নেই। এসব কারণে আমার মনে এক প্রচণ্ড ক্ষোভ ছিলো বাবার প্রতি। কোর্সে পারিবারিক মেডিটেশনে সেই বাবাকে আমি ক্ষমা করতে পেরেছি। এখন নিজের কাছে আমাকে এক অনন্য মানুষ মনে হয়। এই কোর্সের শিক্ষা আমার কাছে এক অনন্য সম্পদ। *[মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী অনার্সের ছাত্র, ১৬৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]*



আলেমদের জন্যে এ কোর্স খুব প্রয়োজন

মওলানা আবুল হাসনাত মুহাম্মদ ইমদাদুল্লাহ

মেডিটেশনকে মনে করতাম জাদু। কিন্তু কোর্স করে বুঝতে পারলাম এটি হচ্ছে মনকে কাজে লাগানোর মিসাইল। আল্লাহ মানুষের মনে যে ক্ষমতা দিয়েছেন তা যথাযথভাবে কাজে লাগানোর হাতিয়ার হচ্ছে কোয়ান্টাম মেডিটেশন।

গুরুজীর প্রতিটি আলোচনা জীবনকে সুন্দর করার জন্য খুবই প্রয়োজন। তিনি তার আলোচনায় জড়তা, অজ্ঞতা আর মূর্থতার কালো পর্দা ভেঙে চুরমার করে দেন। বিশেষ করে আমি আলেমদের জন্য এ কোর্সটি খুব প্রয়োজন মনে করছি। আমরা বড় হতে চাই। কোয়ান্টাম মেথড মানুষকে বড় ও মহান হতে শেখায়।

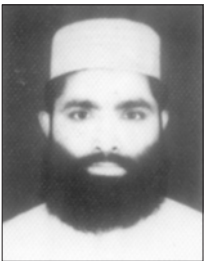
গুরুজীকে দেখে বুঝেছি বড় হতে হলে জানার সাথে সাথে মানতেও হবে। মিথ্যে অহংকার বাদ দিয়ে বিনয়ী হতে হবে। যার যতটুকু সম্মান প্রাপ্য তা তাকে দিতে হবে। এ শিক্ষার জন্যে আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

[বিশিষ্ট আলেম মওলানা আবুল হাসনাত মুহাম্মদ ইমদাদুল্লাহ ১৫৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট। তিনি কুরআন শিক্ষা ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের প্রধান পরিচালক এবং এক শব্দের মাঝে ১৫ ঘণ্টায় কুরআন শিক্ষার সহজ পদ্ধতির উদ্ভাবক]

সার্বজনীন প্রয়োগ বিমল চন্দ্র রায়

কোয়ান্টামে এসে মনে হচ্ছে এটা একটা আনন্দ ভুবন। পেশার সুবাদে বিভিন্ন ওয়ার্কশপে অংশ নিয়েছি। বিভিন্ন বই-পত্র পড়েছি। কিন্তু সেগুলোর গণ্ডি ছিলো সীমিত। জীবনের পরিপূর্ণ দিক-নির্দেশনা কোথাও পাই নি। আজ এখানে এসে তা পেয়েছি। গুরুজী যে শিক্ষা দিলেন তার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক সমস্যাসহ বহুবিধ সমস্যা সমাধানে এটি অত্যন্ত কার্যকর পদ্ধতি।

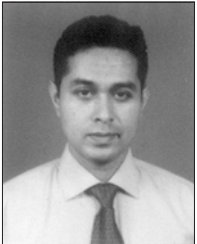
[বিমল চন্দ্র রায় সরকারী কর্মকর্তা, ১৬৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



আস্থা বেড়েছে শহিদুল আলম চৌধুরী

মেরিন ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার কারণে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মানুষের সাথে মিশতে হয় এবং কথা বলতে হয়। বিদেশে সবসময় নিজেকে ছোট মনে হতো। হীনম্মন্যতায় ভুগতাম যে, আমি এক গরীব দেশের নাগরিক। পেশার কারণেই জাহাজে করে সমুদ্রে যাতায়াত করতে হলেও ঝড় দেখলেই আমি নার্তাস হয়ে যেতাম। ফলে পেশাগত পদোন্নতি কিছুটা বাধাগ্রস্ত হওয়ার আশংকা ছিলো। কিন্তু এখানে এসে উপলব্ধি করলাম, এখন আমি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছি। সিদ্ধান্তহীনতা কাটিয়ে আমার মনছবি আমাকে নতুনভাবে প্রেরণা যুগিয়েছে।

[শহিদুল আলম চৌধুরী মেরিন ইঞ্জিনিয়ার, ১৬৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



হতাশা দূর হয়েছে সাদিয়া আফরীন

আমার জীবনের একটা চরম কঠিন সময়ে আমি কোর্সটি করার সিদ্ধান্ত নিই। আমি এমন একটা বাধার সম্মুখে দাঁড়িয়েছি যে, কখনো ভাবি নি আমার জীবনে এ রকম কিছু ঘটবে। গত তিন বছর ধরে আমি মেডিকেল কলেজের ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষা দিচ্ছি। প্রতিবারই আমার কাছে যে বিষয়টি তুলনামূলকভাবে সহজ মনে হয় সেটিতে খারাপ করছি। মেডিসিন এবং সার্জারীর মতো কঠিন কঠিন বিষয়ে আমি পাস করছি কিন্তু বরাবরই গাইনীতে খারাপ করছি। অথচ আমার পরীক্ষার প্রস্তুতি ভালো এবং আমার যোগ্যতাও আছে। কিন্তু কেন যে গাইনীতে পাস করছিলাম না। আমি প্রচণ্ড হতাশ হয়ে পড়ছিলাম। ভেবে পাচ্ছিলাম না কি করতে হবে। কিন্তু কোর্সে এসে আমি আশার আলো দেখতে পাচ্ছি এবং আমি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছি। আমি বিশ্বাস করি, এই নতুন আত্মবিশ্বাস দিয়ে আমার বাধাকে জয় করতে পারবো।

[সাদিয়া আফরীন ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রী, ১৬৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

জাগতিক ও পারলৌকিক কল্যাণ সাখাওয়াত হোসেন

দীর্ঘদিন ধরে আমি ঘুমের সমস্যায় ভুগছি। অবস্থা এমন পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে, ঘুমের ওষুধ ছাড়া আমার ঘুম হতো না। সবসময় ভাবতাম কিভাবে এ সমস্যা থেকে মুক্তি পাবো। এক আত্মীয়ের মাধ্যমে জেনে কোর্সে ভর্তি হই। কোর্স করে মনে হচ্ছে, আমার এই বৃদ্ধ বয়সে কোয়ান্টাম মেথড এক নতুন জীবন দান করেছে। এই কোর্সের মধ্যে জাগতিক কল্যাণ ছাড়াও পারলৌকিক মুক্তির উপায় রয়েছে। কোর্সের মাধ্যমে জেনেছি, কিভাবে সংসারে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং কিভাবে সদস্যদের মধ্যে আরো বেশি মমতা বৃদ্ধি পাবে। আমি বিশ্বাস করি, এখন থেকে নামাজে আমার একাগ্রতা আরও বৃদ্ধি পাবে। শুধু শারীরিক সমস্যা থেকে মুক্তি নয় বরং আমি এক অনন্ত কল্যাণময় পথের দিকে এগুচ্ছি।

[সাখাওয়াত হোসেন জয়েন্ট সেক্রেটারী, ১৬৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

জীবনের সর্বোত্তম কোর্স অনুপ দত্ত তালুদকার

দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে আত্মনির্মাণের প্রয়োজনীয়তা এ কোর্স করে উপলব্ধি করেছে। সাফল্য লাভের সঠিক প্রক্রিয়া এ কোর্সেই পেয়েছি। সুস্থ দেহ ও মন নিয়ে সংসজ্জে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ থাকায় এ কোর্স আমার জীবনের সর্বোত্তম কোর্স। এখন প্রো-অ্যাকটিভ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করি। সবসময় মনে রাখি ‘আমি একজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট’।

আমার দশ বছরের সাইনুসাইটিস জনিত মাথা ব্যথা, টনসিলাইটিস এবং ঠাণ্ডা এলার্জি ছিলো। একটানা দশ ঘণ্টা এসি রুমে বসে থাকার কথা ভাবতেও পারি নি। অথচ কোর্সের প্রথম দিন এত সজীব ছিলাম যে, দ্বিতীয় দিন হাফ শার্ট পরে ক্লাস করেছি। এখন সাইনুসাই-টিসের মাথা ব্যথা থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত।

পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়ি থেকে এসে কোয়ান্টামের যে মানবিক চেতনায় আলোকিত হয়েছি, সে আলো আমার এলাকার মানুষের মধ্যেও ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে কাজ করতে চাই।

আমার বিশ্বাস, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সাথে জড়িত থাকলে খারাপ কাজ বা খারাপ চিন্তা থেকে বিরত থাকবো। জীবন সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি এবং সৃষ্টির সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার জন্যে ফাউন্ডেশনের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে চাই।

[অনুপ দত্ত তালুদকার খাগড়াছড়ি পানছড়ি বাজার স্কুল এন্ড কলেজ-এর শিক্ষক, ১৬৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



মেডিটেশন বদলে দিয়েছে আমাদের জীবন

শামসুন্নাহার আহমেদ

১৯৯৫ সালে ১৮ ব্যাচে মেডিটেশন কোর্স করার আগ পর্যন্ত আমি ছিলাম একজন সাধারণ গৃহিণী। পারিবারিক সম্পত্তির দেখাশোনা করা বা দু’টি ছেলের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব নেয়ার জন্যে যে মানসিক শক্তি বা অভিজ্ঞতা দরকার তার কিছুই আমার ছিলো না। এমন কি গাড়ির তত্ত্বাবধান কিভাবে করবো সেই আশংকায় সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও গাড়ি কেনা হয় নি।

কিন্তু মেডিটেশন কোর্স করার পর আমি যেন সম্পূর্ণ বদলে গেলাম। সেই ভীৰু, মুখচোরা স্বভাব বদলে আমি পরিণত হলাম এক সাহসী, আত্মবিশ্বাসী মানুষে। বাস্তব

মেধায়নে শিক্ষার্থীরা

সাধারণ কোয়ান্টায়ন থেকে কিছুটা ভিন্ন আঙ্গিকে শাজানো মেধায়ন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয় শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের জন্যে। গুরুজী অনুমোদিত কার্যক্রম অনুযায়ী সারাদিন মৌনতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা হাজারবার স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা, মেধার প্রয়োগ অবলোকনসহ সিলেবাস অনুযায়ী এক এক করে প্রতিটি বিষয়ের কোর্স গুছিয়ে নেন। প্রতিদিন ৮ ঘন্টা করে মোট ৪ দিনের এ কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া দেখা যাচ্ছে।

ঢাকায় ২য়, ৪র্থ ও ৮ম পর্বের মেধায়নে অংশ নেয়া এইচ.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৫৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট দেওয়ান সাফায়েত আহমেদ বলেন, আমি আগে পড়াশোনা করেছি জীবনে সাফল্য পাওয়ার জন্যে। কিন্তু মেধায়নে ২য় ঘন্টায় প্রাপ্ত জ্ঞান দিয়ে নিজের ও মানুষের কি কি উপকার হবে ভাবতে গিয়ে থমকে গেলাম। এখন আমি সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছি মানবতার কল্যাণে আমার মেধাকে কিভাবে কাজে লাগাবো। তিনি আরও বলেন, মেধায়নের তৃতীয় ঘণ্টা থেকে প্রতি বিষয়ের প্রতিটি অধ্যায়ের প্রশ্ন ক্রমাগত অবলোকন করে নিজেই একটা সাজেশন তৈরি করে ফেলি। পরীক্ষায় আশানুরূপ ফলও পাই। পরীক্ষার আগে সহপাঠীরা বিভিন্ন মডেল টেস্টে অংশ নিলেও আমি আর তার কোনো প্রয়োজন অনুভব করি নি।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ রসায়ন ও আণবিক জীব বিজ্ঞানে মাস্টার্সের প্রতিশ্রুতিশীল ছাত্রী ফারাহ সাবরিন তনিমা মনে করেন প্রতিটি জীবনের ঝামেলাগুলোকে সাহসের সাথে মোকাবেলা করতে লাগলাম। পরবর্তীতে ১৯৯৮ সালে পেটের একটা টিউমার অপারেশন এবং তারপর সুস্থতা লাভের ক্ষেত্রেও আমার মনের জোর অসাধারণ ফল দিয়েছে। কিন্তু এর চেয়েও বিস্ময়কর পরিবর্তন আমার ছেলেদের ক্ষেত্রে হয়েছে। কারণ ভীৰু হিসেবে পরিচিত একটা ছেলে যখন মাত্র ২৩ বছর বয়সে বিদেশ-বিভুঁইয়ে একা গিয়ে পড়াশোনা এবং চাকরি করে প্রতিষ্ঠা

জীবনের ঝামেলাগুলোকে সাহসের সাথে মোকাবেলা করতে লাগলাম।

পরবর্তীতে

১৯৯৮ সালে পেটের একটা টিউমার অপারেশন এবং তারপর সুস্থতা লাভের ক্ষেত্রেও আমার মনের জোর অসাধারণ

ফল দিয়েছে। কিন্তু এর চেয়েও বিস্ময়কর পরিবর্তন আমার ছেলেদের ক্ষেত্রে হয়েছে। কারণ ভীৰু হিসেবে পরিচিত একটা ছেলে যখন মাত্র ২৩ বছর বয়সে বিদেশ-বিভুঁইয়ে একা গিয়ে পড়াশোনা এবং চাকরি করে প্রতিষ্ঠা



সাফল্য, এই পরিবর্তন হয়তো শুধুমাত্র মেডিটেশনের ফলেই সম্ভব যা জাগিয়ে তোলে মনের অসীম শক্তিকে।

[শামসুন্নাহার আহমেদ সগরিবারে ইতালি প্রবাসী। ১৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

ছাত্র-ছাত্রীর ক্লাসের সাথে সাথেই মেধায়নে অংশ নেয়া উচিত। তাহলে পরীক্ষার সময় আলাদা চাপ পড়ে না। তার মতে ছাত্র জীবনে সঠিকভাবে পড়া অবলোকন বিষয়টিই পরীক্ষায় কাজি্ক্ষত সাফল্য এনে দিতে পারে। যার প্রমাণ তিনি নিজে। ডিপার্টমেন্টের ফাস্ট ক্লাস তৃতীয় স্থান অধিকারী তনিমা ১২২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।

মেধায়নে অংশ-গ্রহণকারী রাজশাহী মেডিকেল কলেজের মেধাবী ছাত্রী জান্নাতুন নাস্ঈম মুন বলেন, মেধায়নের মাধ্যমে আমি আমার পড়াগুলোকে খুব অল্প সময়ে গুছিয়ে নিতে পেরেছি। একটি বিষয় পড়ার পর সেটাকে নীরবে ধ্যানের স্তরে অবলোকনের কারণে বিষয়টি আমার সম্পূর্ণ আয়ত্তে চলে আসছে, মনে রাখতে পারছি এবং পরীক্ষায় ফলপ্রসূ প্রয়োগ ঘটাতে পারছি। মুন ১৪০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।

ঢাকায় ৬ষ্ঠ ও ৭ম পর্বের মেধায়নে অংশ-গ্রহণকারী আফরোজা হোসেন তিথি বলেন, মেধায়নে অংশ নিয়ে আমরা আমাদের সুপ্ত মেধার সুষ্ঠু বিকাশ ঘটিয়ে অনন্য মানুষ হওয়ার পথে অগ্রগামী হতে পারি। তিথি ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ইসলামিক হিস্ট্রি এন্ড কালচারের মাস্টার্স ২য় বর্ষের ছাত্রী। তিথি আরও বলেন, আমার



ফারাহ সাবরিন তনিমা



জান্নাতুন নাস্ঈম মুন

রহমত অনুভব করা যায়। একজন ছাত্রের পরীক্ষায় কাজি্ক্ষত সাফল্যের জন্যে এই প্রশান্তি ও একাগ্রচিন্ততাই যথেষ্ট বলে তারা মত ব্যক্ত করেন। সারাহ সুদীপা ৬ষ্ঠ ব্যাচের মাস্টার্স এবং সাদমানি ৯৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।

এছাড়া মেধায়নে অংশগ্রহণকারী প্রায় প্রতি শিক্ষার্থী বলেন মেধায়নে মন বিক্ষিপ্ত হওয়ার সুযোগ না থাকায় অল্প সময়ে পড়া বেশি ফলপ্রসূ হয়। ধ্যানের স্তরে পড়ার সাথে সহজেই একাত্ম হওয়া সম্ভব।

প্রতিদিন মেডিটেশনের মাধ্যমে মেধায়ন শুরু ও শেষ হয়। যা ধ্যানের স্তরকে করে আরও গভীর। শিক্ষার্থীরা এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে সাফল্যকে করতে পারেন ত্বরান্বিত।

প্রতিবেদক : কাওকাব আস সাদিয়া ও আশিকুল ইসলাম

পায় এবং ছোট ভাই ও মাকে নাগরিকত্বসহ নিজের কাছে নিতে পারে, তখন তার সাফল্য অবাক করার মতো বৈকি। শুধু তা-ই নয়, মাত্র ক’বছরের মধ্যে ইতালীর মিলানে মনছবির কল্পনার মতো এক বাড়ির মালিকানাও প্রায় এখন হাতের মুঠোয়। তাই এ

পড়াশোনায় আগে একটা অগোছালো ভাব ছিলো। এখন আমি রুটিন করে পড়ছি এবং এখন আমার মনোযোগ ও একাগ্রতা অনেক বেড়েছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যা-লয়ের আরও দুজন প্রতিভাবান মুখ আইন বিভাগের সারাহ সুদীপা ইউনুস ও ইংরেজী বিভাগের সাদমানি শারমিন বনি তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন একটু ভিন্নভাবে–

হাজারবার স্রষ্টার কাছে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে দিনটি শুরু হওয়ার ফলে সারাদিনই মনে হয় পরম করুণাময় আমার প্রার্থনা কবুল করেছেন। মনও ভরে যায় এক অদ্ভুত প্রশান্তিতে। পড়াশোনার সময় প্রতি মুহূর্তেই মনে স্রষ্টার রহমত অনুভব করা যায়। একজন ছাত্রের পরীক্ষায় কাজি্ক্ষত সাফল্যের জন্যে এই প্রশান্তি ও একাগ্রচিন্ততাই যথেষ্ট বলে তারা মত ব্যক্ত করেন। সারাহ সুদীপা ৬ষ্ঠ ব্যাচের মাস্টার্স এবং সাদমানি ৯৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।

সাদমানি শারমিন বনি

এছাড়া মেধায়নে অংশগ্রহণকারী প্রায় প্রতি শিক্ষার্থী বলেন মেধায়নে মন বিক্ষিপ্ত হওয়ার সুযোগ না থাকায় অল্প সময়ে পড়া বেশি ফলপ্রসূ হয়। ধ্যানের স্তরে পড়ার সাথে সহজেই একাত্ম হওয়া সম্ভব।

প্রতিদিন মেডিটেশনের মাধ্যমে মেধায়ন শুরু ও শেষ হয়। যা ধ্যানের স্তরকে করে আরও গভীর। শিক্ষার্থীরা এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে সাফল্যকে করতে পারেন ত্বরান্বিত।

প্রতিবেদক : কাওকাব আস সাদিয়া ও আশিকুল ইসলাম

প্রশ্ন : আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আমি একাই গাঞ্জিয়েট। এখন আমি একা প্রো-অ্যাকটিভ হয়ে কি পারিবারিক সম্প্রীতি বজায় রাখা সম্ভব? অথচ তার নেগেটিভ আচরণ সহ্য করা আমার জন্যে কষ্টকর।

উত্তর : এক্ষেত্রে আপনি স্ত্রী হলে এক রকম পরামর্শ, স্বামী হলে আরেক রকম। স্ত্রী হলে স্বামীকে কোর্সের ব্যাপারে উৎসাহিত করবেন। এ ব্যাপারে স্ত্রীরা খুবই সফল। কারণ আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি ৯৯% ক্ষেত্রে স্ত্রীরা স্বামীকে কোর্সের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছেন। আসলে নারীরা স্বভাবজাতভাবে নরম আর নরমই শক্তের চেয়ে প্রভাবিত করতে পারে বেশি। যেমন, পানি যে কোনো জায়গা দিয়ে অনায়াসে চলে যেতে পারে। কিন্তু পাথর শক্ত হলেও তা পারে না, বরং ঘষা খেতে খেতে ক্ষয়ে যায়। আর স্বামী হলে স্ত্রীকে উদ্বুদ্ধ করা সহজ, কারণ ভালো কাজে স্বামীর কাছ থেকে উৎসাহ পেলে স্ত্রীরা সহজেই সাড়া দেন।

আসলে দাম্পত্যজীবন তো অল্পকালের জন্যে নয়। আপনি পাঁচ বছর / দশ বছর দেখুন। আপনি জয়ী হবেন, যদি প্রো-অ্যাকটিভ থাকেন। আমাদের সমস্যার সমাধান হয় না কারণ আমরা রাতারাতি পরিবর্তন চাই।

প্রশ্ন : আমার পার্টনারের দোষ-ত্রুটির কথা যখন বলি তখন ঝগড়া হয়, দূরত্ব সৃষ্টি হয়। কি করে এ সমস্যা এড়ানো যায়?

উত্তর : বোকার মতো দোষ-ত্রুটি ধরতে যাবেন না। কারণ কোনো মানুষই তার দোষ-ত্রুটি স্বীকার করার মতো অবস্থায় সবসময় থাকে না। সেজন্যে আপনাকে কুশলী হতে হবে। যখনই আপনি দোষ ধরিয়ে দিচ্ছেন তখনই দেয়াল তৈরি হয়ে যাচ্ছে, তিনিও বলছেন আমার আবার কি দোষ, দোষতো তোমারই। সরাসরি না বলেও ভুল ধরিয়ে দেয়া যায়। আপনি হয়তো বলতে পারেন অমুকে এ কাজটা করেছিলো, এটা কি ঠিক? তখন তিনি না সূচক কিছু বললে আপনি বলবেন, আমাদেরও এ থেকে দূরে থাকা উচিত। কাউকে পরিবর্তিত করতে চাইলে সবসময় প্রজ্ঞার সাথে, ডিপ্লোম্যাটিক্যালি কাজ করবেন। তাহলেই আপনি তাদের পরিবর্তন করতে পারবেন।

প্রশ্ন : আমার স্বামী সবসময় আমার নেগেটিভ দিকগুলো হাইলাইট করেন। কিন্তু দুঃখ এ জন্যে যে, আমার কিছু পজিটিভ দিকও আছে। আমার প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি কিভাবে পরিবর্তন করা যায়?

উত্তর : আপনি যে দুঃখ পাচ্ছেন তাতে আপনার নেগেটিভ দিকগুলো আরো হাইলাইটেড হচ্ছে। সেজন্যে দুঃখ পাবেন না। আপনি পজিটিভ দিকগুলো আরো উন্নত করুন। দেখবেন একসময় তিনিই নেগেটিভ দিক বাদ দিয়ে পজিটিভ দিকগুলো নিয়ে কথা বলা শুরু করবেন।

প্রশ্ন : প্রতিটি ঘরে শাশুড়ির সাথে পুত্রবধূর দ্বন্দ্ব থাকে কেন? এটা দূর করার জন্যে দু'জনের কর্তব্য কী হওয়া উচিত?

উত্তর : শাশুড়ি এবং পুত্রবধূর দ্বন্দ্বের মূল কারণ সামাজিক। আমাদের উপমহাদেশের সমাজব্যবস্থায় একানুবর্তী পরিবারে যতদিন পর্যন্ত কোনো বউ পুত্র সন্তানের মা না হতো ততদিন তার অবস্থান নড়বড়ে থাকতো। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ছেলেকে বলা হয় বংশের বাতি আর মেয়েকে বলা হয়, এতো অন্যের ঘরে চলে যাবে। যদিও এখন এই দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে।

এসময় কারণে মায়ের কাছে ছেলে হলো তার

পরিবার ও সুসম্পর্ক বিষয়ক প্রশ্ন

উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

অবস্থান শক্ত করার খুঁটি। এই ছেলেকেই যখন মা বিয়ে দিয়ে বউ নিয়ে আসেন তখন তিনি ভোগেন এক অন্তর্দ্বন্দ্ব। অবচেতনভাবেই তিনি ভাবতে শুরু করেন এখন হয়তো ছেলের কাছে তার গুরুত্ব কমে গেছে। সম্পর্কের টানাপোড়েনটা এখন থেকেই শুরু হয়।

শাশুড়িকে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি দিতে বউয়ের ভূমিকাই হতে পারে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শাশুড়ির চেয়ে বয়সে ছোট হলেও চিন্তাভাবনায় সে আধুনিক। তার উচিত শাশুড়ির মনে এরকম ধারণা তৈরি করা যে, আমি আপনার প্রতিপক্ষ নই। আমি এসে আপনার ছেলেকে ছিনিয়ে নিচ্ছি না, বরং ছেলের সাথে সাথে আমাকেও পাচ্ছেন। এ কথা যদি আপনি শাশুড়িকে বলেন, তাহলে দেখবেন দূরত্ব এমনিতেই কমে গেছে।

প্রশ্ন : মা-দাদীদের কাছ থেকে জেনেছি আদিকালে শুধু সংসার টিকিয়ে রাখার জন্যেই সব অত্যাচার তারা সহ্য করেছেন। তাহলে মহিলাদের সচেতন হওয়া কি ভুল? নাকি স্বামীর অত্যাচার সহ্য করাই ভাগ্যলিপি? বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যেখানে পুরুষের আধিপত্য সেখানে নারীদের কি করণীয়?

উত্তর : সংসারে আধিপত্য করতে খুব কম পুরুষই পারেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীদেরই আধিপত্য রয়েছে। অনেকটা সেই কবিতার মতো, ‘রাজা করিছে রাজ্য শাসন, রাজারে শাসিছে রানী’। এ ব্যাপারে বিখ্যাত ঘটনা রয়েছে। প্রেসিডেন্ট নিম্বন হোয়াইট হাউস থেকে বিদায় নেয়ার আগে পরিবারের সব সদস্যদের নিয়ে ছবি তুলবেন। সবাই যার যার মতো দাঁড়িয়ে গেল, কেউ কেউ বসলো। নিম্বন কুকুর খুব পছন্দ করতেন। ছবি তোলার আগে তিনি তার সেক্রেটারীকে বললেন তার প্রিয় কুকুরটাকে নিয়ে আসতে। কিন্তু মিসেস নিম্বন কুকুর পছন্দ করতেন না। তিনি কিছু বললেন না, শুধু প্রেসিডেন্টের দিকে একবার তাকালেন। আর তাতেই দেখা গেল কুকুর আর আসে নি। অর্থাৎ প্রভাবিত করার ক্ষমতা নারীরই বেশি।

আসলে আধিপত্য করার ব্যাপারটা আপেক্ষিক। নারী-প্রধান সমাজে নারীরা কর্তৃত্ব করেছে। আবার পুরুষ-প্রধান সমাজে নারীরা নির্যাতিত হয়েছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর আমরা যে মানবিক মহাসমাজের স্বপ্ন দেখি তার বিশেষত্ব হচ্ছে নারী ও পুরুষ পরস্পরের পরিপূরক। কারণ শুধু পুরুষ বা শুধু নারী নিয়ে পৃথিবী চলতে পারতো না। পরিপূরক শক্তি ছাড়া, সম্পূরক শক্তি ছাড়া প্রশান্তি আসে না।

প্রশ্ন : যদি এমন হয় শুধু লোক দেখানোর জন্যে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে হচ্ছে, তাহলে সে অবস্থা থেকে সুস্থ দাম্পত্য সম্পর্কে ফিরে আসা কি সম্ভব?

উত্তর : যে কোনো অবস্থা থেকে একজন মানুষ যদি চায় সুস্থ দাম্পত্য সম্পর্কে ফিরে আসতে, তবে তা

সম্ভব। কারণ সম্পর্ক তো এক সময় ছিলো। দেখা যায় দাম্পত্য বিরোধের সময় সাধারণত স্বামী ও স্ত্রী দু'জনই তাদের ঝগড়া এবং দুর্ব্যবহারের স্মৃতিগুলো মাথায় রাখেন। তাদের সম্পর্কের আনন্দময় ঘটনাগুলো তখন আর মনে পড়ে না।

তাই কমান্ড সেন্টারে আপনার স্বামী বা স্ত্রীকে নিয়ে আসুন। তাকে মনে করিয়ে দিন আপনাদের সম্পর্কের আনন্দময় স্মৃতিগুলোর কথা। নিয়মিত এভাবে করতে থাকুন। দেখবেন পরিবর্তন আসছে। কারণ ৯৯% ক্ষেত্রেই এ প্রক্রিয়া সফল হয়েছে।

বস্তুত সম্পর্কের উন্নতি তখনই বাধাগ্রস্ত হয় যখন তৃতীয় পক্ষ এতে নাক গলায়। তাই তৃতীয় পক্ষকে এড়িয়ে আপনি যদি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করেন তখন অবশ্যই পরিবর্তন আসবে।

প্রশ্ন : নিজের চিন্তা-চেতনার সাথে পরিবারের অন্য সদস্যদের মতপার্থক্য থাকলে কীভাবে সুসম্পর্ক রক্ষা করা যায়?

উত্তর : চেতনাগত পার্থক্য আর মতপার্থক্য দুটো ভিন্ন বিষয়। চেতনা বিশ্বাসের ব্যাপার। কিন্তু মতপার্থক্য বিশ্বাসের ব্যাপার নয়। যেমন, দু'জন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ হলো শুধু এই কারণে যে, স্ত্রী ফ্যান না ছাড়লে ঘুমাতে পারেন না আর স্বামী ফ্যান ছাড়লে ঘুমাতে পারেন না। এটাই হলো মতপার্থক্য। কাজেই মতভেদ চেতনা নিয়ে, না ছোটখাটো বিষয় নিয়ে, তা আপনাকে শনাক্ত করতে হবে। যেমন, আপনার স্ত্রী যদি বলেন কাউকে খুন করে অর্থ নিয়ে আসতে হবে তখন আপনাকে তা অগ্রাহ্য করতে হবে। কিন্তু তিনি যদি বলেন ঘরের অমুক আসবাবটা এভাবে রাখতে হবে, তখন আপনি তা মেনে নিন। অর্থাৎ চেতনার ব্যাপারে ছাড় দেয়া যায় না, কিন্তু ছোটখাটো ব্যাপারে ছাড় দেয়া যায়।

প্রশ্ন : বর্তমান সময়ে অনেক সচ্ছল পরিবারের মেয়েরা চাকরি করছে। তারা কি স্বামী এবং সন্তানকে সময় দেয়া থেকে বঞ্চিত করছে না?

উত্তর : স্বাভাবিকভাবেই কর্মজীবী মহিলা স্বামী এবং সন্তানকে সময় দিতে পারেন না বা দিলেও কম। এক্ষেত্রে স্বামী এবং স্ত্রী যদি পরিবারে সময় দেয়ার ব্যাপারে পরস্পরকে সহযোগিতা করেন তাহলে অন্য সদস্যদের ওপর এর প্রভাব কম পড়বে।

প্রশ্ন : আমার মা-বাবা যদি আমাকে ভুলপথে চালিত করতে চান তাহলে আমি তাদের সাথে কেমন আচরণ করবো?

উত্তর : মা-বাবা যদি চেতনা এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আপনাকে ভুলপথে চালিত করতে চান তবে আপনি অবশ্যই সেপথে যাবেন না। কিন্তু তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবেন না। কারণ তাদের বিশ্বাসের সঙ্গে আপনার বিশ্বাসের পার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু আচরণ সবসময় সুন্দর হতে হবে। চেতনায় মিল থাকলে যে আচরণ করতেন, চেতনায় অমিল থাকলেও সে আচরণ করবেন।

প্রশ্ন : আমার মা আমাকে বোঝেন না। কীভাবে সম্পর্কের উন্নতি করবো?

উত্তর : সম্পর্ক কেমন হবে তা সবসময় নির্ভর করে অপেক্ষাকৃত নবীন পক্ষের উপর। ছেলে বা মেয়ে হোক, মাকে বোঝাতে না পারলে পৃথিবীর আর কাউকে বোঝাতে পারবে না। তোমার মা তোমাকে বোঝে না কারণ তুমি কখনো তাকে বোঝাতে চেষ্টা কর নি। চাপিয়ে দিতে চেয়েছি। তাই মাকে বোঝাতে চেষ্টা কর সে ভাষায় যা তিনি বোঝেন, আর তাহলো মমতার ভাষা।

ঢাকায় অনুষ্ঠিত কোয়ান্টাম মেথড মেডিটেশন কোর্সের ১৬৯ ব্যাচে এবার ছিলো আইনজীবীদের মিলন মেলা। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টে কর্মরত ও আইন পেশায় প্রথিতযশা ছয়জন এডভোকেট এই কোর্সে অংশ নেন। এছাড়াও ছিলেন কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের একজন শিক্ষক। এডভোকেট দম্পতি এবং দু'জন এডভোকেটের মধ্যে পূর্ব পরিচয়ের সূত্রকে বাদ দিলে একই কোর্সে এতজন আইনজীবীর সমাবেশ বেশ কাকতালীয় এবং এই প্রথম।

এডভোকেট দম্পতি ছিলেন মোহাম্মদ আব্দুল মালেক ও নাসরিন পারভীন শেফালী। দু'জনই সুপ্রীম কোর্টের এডভোকেট, থাকেন ঢাকার আরামবাগে। মিসেস শেফালী বলেন, এই কোর্সে আসার আগে আমরা কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের নিকটবর্তী শাখায় যেতাম। সেখান থেকেই উৎসাহ পেয়ে এসেছি এ কোর্সে। কিছু শারীরিক সমস্যার পাশাপাশি আমার একটি সমস্যা ছিলো ঘুম না আসা। কিন্তু আজ কোর্সের চতুর্থ দিন এই প্রত্যয়ন অনুষ্ঠানে পরম করুণাময়ের শুকরিয়া আদায় করে বলছি যে গত তিন রাত ধরে আমি ঘুমাতে পারছি। বাকি সমস্যাগুলোও আশা করি দূর হয়ে যাবে।

তার স্বামী এডভোকেট মোহাম্মদ আব্দুল মালেক বলেন, বৈষয়িক ব্যাপার নিয়ে আমার চেয়ে আমার স্ত্রীই বেশি ভাবতেন। কিন্তু তারপরও বাস্তব জীবনের সমস্যাগুলোকে মোকাবিলা করার শিক্ষাও যে কোনো কোর্সের মাধ্যমে এত চমৎকারভাবে আয়ত্ত করা যায় তা কখনোই বুঝতাম না এখানে না এলে।

এডভোকেট মো. জামাল উদ্দিন খন্দকার বলেন, আইন পেশায় এত সব জটিলতার সম্মুখীন হতে হয় যে, কখনো কখনো রাগ দমন করা মুশকিল। রাগের মাধ্যমে হয়তো মক্কেলকে ফিরিয়ে দিই। অথচ পরে মনে হতো একটু শান্ত থাকলেই আর মক্কেলকে ফিরিয়ে দিতাম না এবং আয়ের সুযোগও হারাতাম না।

মেডিটেশন কোর্সে এসে রাগ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে খুবই কার্যকরী নির্দেশনা পেয়েছি। আরও পেয়েছি মনছবির মাধ্যমে লক্ষ্য পূরণের প্রক্রিয়া। আমার জীবনের উল্লেখযোগ্য সাফল্যগুলো অবচেতনভাবেই এই প্রক্রিয়াতে অর্জিত হয়েছিলো যা এখন বুঝতে পারছি।

এডভোকেট আব্দুল বারী কোর্সে এসেছিলেন তার স্ত্রী-সন্তানদের অনুপ্রেরণায়। তার স্ত্রী ভীষণ মাথা ব্যথায় ভুগতেন। সেই সাথে বছর তিনেক আগে তিনি হেপাটাইটিস বি-তে আক্রান্ত হন। স্ত্রীকে নিয়ে জনাব বারী দেশে-বিদেশে অনেক ডাক্তারের কাছে গিয়েছেন। অবশেষে এক পরিচিতের কাছে শুনে তার স্ত্রী কোর্সে অংশ নেন। কোর্স করার পরপরই সুস্থ হবার ব্যাপারে স্ত্রীর আত্মপ্রত্যয় দেখে তিনি বিস্মিত হজেন। ভাবতেন পাণ্ডলের প্রলাপ। স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে রক্তের

১৬৯ ব্যাচ যেন আইনজীবীদের মিলন মেলা



১৬৯ ব্যাচে অংশগ্রহণকারী আইনজীবীদের কয়েকজন : (বাঁ থেকে) মিসেস নাসরিন পারভীন শেফালী, মোহাম্মদ আব্দুল মালেক, জামাল উদ্দিন খন্দকার, শেখ সিরাজুল ইসলাম সিরাজ এবং আব্দুল বারী।

পরীক্ষা করিয়ে তিনি আবারও বিস্মিত হলেন, তবে এবার স্ত্রীর রক্ত হেপাটাইটিস বি জীবাণুমুক্ত দেখে।

কোর্স করার পর স্ত্রীর সুস্থতা এবং তার সন্তানদের সাফল্য দেখে উদ্বুদ্ধ হলেও তার মনে প্রশ্ন ছিলো তার নিজের কোর্সটি করা উচিত কি না। কিন্তু কোর্সে এসে তিনি বুঝলেন আসলে বৈষয়িক প্রাচুর্যই জীবনের সব নয় যদি জীবনের ভিত্তিকে খুঁজে পাওয়া না যায়। এ কোর্স তাকে দিয়েছে জীবনের প্রশান্তি ও আনন্দ লাভের উপায়, জীবনের বাকি সময়টুকুর জন্য হলেও যা তার কাজে লাগবে।



বিচার প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট-এর সহকারী পরিচালক এডভোকেট রোসুমা বেগম চৌধুরী কোর্সে এসেছিলেন আইনেরই ছাত্র তার এক অনুজ-প্রতিমের উৎসাহে। তিনি বলেন, কর্মক্ষেত্রে

আমার সাহসের অভাব ছিলো। এ কোর্সে এসে আত্মবিশ্বাসের জন্ম হয়েছে, ফলে পেশাগত চ্যালেঞ্জগুলো আমি এখন থেকে সাহসের সাথে মোকাবিলা করতে পারবো। পারিবারিক জীবনে আমি বেশ রি-অ্যাকটিভ ছিলাম। আমার স্বামী কোর্সের ব্যাপারে তেমন উচ্ছ্বসিত না থাকলেও কোর্সে অংশ নেয়ার পর আমি তার অনেক নেতিবাচক কথার উত্তরেও যখন রাগ করলাম না, তখন তিনি আশ্চর্য হলেন এবং বললেন, মেডিটেশনের এত সুফল জানলে আরও আগে

তোমাকে শেখাতে পাঠাতাম। আমার আরেকটি বড় প্রাপ্তি হলো কোর্সের এই কয়দিন আমি প্রাণ খুলে হেসেছি। যা বহুদিন পারি নি।

এডভোকেট শেখ সিরাজুল ইসলাম সিরাজ তার বন্ধু এডভোকেট জামাল উদ্দিন খন্দকারের অনুপ্রেরণায় এসেছিলেন। পেশাগত ব্যস্ততার কারণে তিনি ভেবেছিলেন চারদিন কোর্সের পুরো সময় হয়তো থাকতে পারবেন না। কিন্তু প্রথম দিন কোর্সে এসে কিছুক্ষণ শুনেই তিনি সিদ্ধান্ত নেন যত গুরুত্বপূর্ণ কাজই থাক না কেন, এই কোর্স পুরো শেষ না করে তিনি অন্য কোথাও যাবেন না।

এডভোকেট সিরাজ বলেন, গত পাঁচ বছর ধরে কখনোই ভোরে ঠিক সময় মতো ঘুম থেকে উঠতে পারি নি। কিন্তু এ কোর্সে এসে নির্দিষ্ট সময়ে ঘুম থেকে জাগার টেকনিক এত সফলভাবে আয়ত্ত করতে পেরে আমি অভিভূত। এ কয়দিন আমি ভোর ঠিক পাঁচটায় উঠতে পেরেছি, এর এক মিনিট এদিক ওদিকও নয়। সাইনুসাইটিসের কারণে ঠাণ্ডা বা এসির বাতাসে বেশিক্ষণ থাকা ছিলো আমার জন্যে একপ্রকার অসম্ভব, ক্রমাগত হাঁচিতে অস্থির হয়ে উঠতাম। কিন্তু এ চারদিন আমার কোনো অসুবিধাই হয় নি। এ কোর্সের মাধ্যমে গুরুজীর মতো ব্যক্তিত্বের সাথে আমার পরিচয় ঘটেছে, তার দিক-নির্দেশনা লাভের সুযোগ পেয়ে আমি ধন্য।

কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব মো. সেলিম তোহা। মনকে জানবার এক ব্যাকুল আত্মহ তার ছোটবেলা থেকেই। অনুসন্ধিৎসা মেটাতে পরিচিত হয়েছেন অনেকের সঙ্গে। অবশেষে এক আত্মীয়ের সূত্রে সুদূর কুষ্টিয়া থেকে ঢাকায় এসেছেন তিনি কোর্সে অংশ নিতে।

কোর্স শেষে তার উপলব্ধি- অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নিয়ে এসেছিলাম এ কোর্সে। এসেছিলাম শূন্য হাতে আর ফিরে যাচ্ছি অনেক কিছু নিয়ে। এত লেখাপড়ার পরও কোর্স করে আমার উপলব্ধি হলো, এতদিন আমি যেন শিক্ষিত ছিলাম না। কারণ স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় যা পাই নি সেই জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাগুলো আমরা পেয়েছি এ কোর্সে।

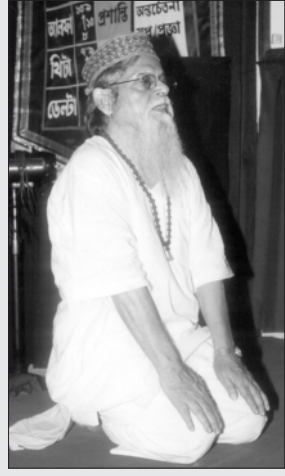
১৬৯ ব্যাচে অংশগ্রহণকারী এই আইনজীবীরা ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে কোর্সে এলেও পেশার সামঞ্জস্যের কারণে তারা একে অন্যের সঙ্গে খুব সহজেই ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছেন। তাদের এই একাত্মতা ও উচ্ছ্বাস সঞ্চারিত হয়েছিলো কোর্সের অন্যান্য অংশগ্রহণকারীর মধ্যেও। ফলে ১৬৯ ব্যাচটি পরিণত হয়েছিলো চমৎকার প্রাণবন্ত একটি ব্যাচে।

প্রতিবেদক : আমজাদ হুসাইন

সুভাষ দত্ত ॥ যেন এক আধুনিক ঋষি

“ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি স্বাস্থ্যই সম্পদ। তাই স্বাস্থ্যের যত্নে করা উচিত এমন যেকোনো ভালো পরামর্শ অনুসরণের চেষ্টা আমি সবসময় করেছি। সেজন্যই হয়তো সর্বশক্তিমানের কৃপায় এই প্রায় ৭৪ বছর বয়সেও সুস্থ দেহ এবং প্রাণবন্ত মন নিয়ে কাজ করতে পারছি।”

গত ২১ অক্টোবর, মঙ্গলবার সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথির বক্তব্যে এই কথাগুলো বলছিলেন জাতীয় চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব শ্রী সুভাষ দত্ত। চলচ্চিত্র জগতে বিচরণ করেও সেখানকার গডডালিকা প্রবাহে গা না ভাসিয়ে সংযমী ও নিয়মতান্ত্রিক জীবন



বজ্রাসনে শ্রী সুভাষ দত্ত।

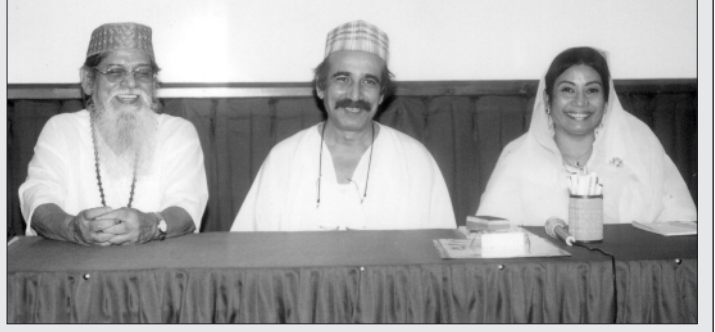
যাপনের যে উদাহরণ তিনি স্থাপন করেছেন, তার সেই অভিজ্ঞতা বিনিময়ের উদ্দেশ্যেই এই আয়োজন। তার দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ এই বক্তব্য শুনে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হন।

শ্রী সুভাষ দত্ত তার বক্তব্যে বলেন, সুস্বাস্থ্যের জন্যে অন্যতম একটি শর্ত হচ্ছে খাদ্যাভ্যাস। সেজন্যই খাবারের ব্যাপারে আমি খুবই সচেতন। যেমন, আমি নিরামিষ-ভোজী এবং আমার খাবার রান্না মানে শুধু সেক্কা করা। সকালে আমি সেক্কা সবজি খিচুড়ী খাই ভরপেট, যা এমনকি লবণ ছাড়া খেতেও আমি অভ্যস্ত। দুপুরে কিছু ফলমূল, বিকেলে মুড়ি, বিস্কিট দিয়ে নাস্তা এবং রাতে ইদানীং অল্প পরিমাণ কাঁচা সবজি খাওয়ার অভ্যাস করছি। সেই সাথে প্রতিদিন সকালে নির্দিষ্ট পরিমাণে নিমপাতা এবং গোল মরিচের মিশ্রণ।

এরপর আসে যোগ ব্যায়ামের প্রসঙ্গ। তিনি বলেন, রাতে শোবার আগে আমি নিয়মিত বজ্রাসন, রুদ্রয়াসন এবং শবাসন— যোগ ব্যায়ামের এ আসনগুলো করি। এতে ঘুম ভালো হয়।

শ্রী সুভাষ দত্ত আধ্যাত্মিক সাধনায়ও নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সদস্য হয়ে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। প্রতিদিন সকালে নির্দিষ্ট সময় মিশনে গিয়ে তিনি মেডিটেশনে আত্মনিমগ্ন হন।

শ্রী সুভাষ দত্ত তার সাধনার প্রক্রিয়ায় আরেকটি



চর্চা নিয়মিতভাবে পালন করছেন। আর তাহলে প্রতিদিন রাত ১২টা থেকে পরদিন সকাল ১০টা পর্যন্ত মৌনব্রত অবলম্বন। তার অভিজ্ঞতায়, তার এই মৌন সাধনা তাকে সন্ধান দিয়েছে এমন এক আনন্দলোকের যা শুধু অনুভবই করা যায়, ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন।

আধ্যাত্মিক সাধনার আলোকময়তা তাকে দিয়েছে এক উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি। যে কারণে তিনি প্রধান ধর্মগুলোর মূল শিক্ষা সম্পর্কে জানতে সচেষ্ট হয়েছেন, চর্চাও করেছেন নিজের জীবনে। পঁচাত্তরতম জন্ম বার্ষিকীর দ্বারপ্রান্তে এসে এখন শ্রী সুভাষ দত্তের অনুভূতি, প্রত্যেকের মতো আমাকেও মারা যেতে হবে, তাই নিজের সামর্থ্য দিয়ে যতটা পারি মানুষের জন্যে কিছু করে যেতে চাই। আর চাই মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত এরকম সুস্থ, সচল থাকতে।

প্রতিবেদক : রাবেয়া নাজনীন

অবিদ্যা পর্ব-৩ ওয়ার্কশপে গুরুজী

নতুন প্রজন্মকে অবিদ্যামুক্ত আলোকিত জীবনের দিশা দেবে ফাউন্ডেশন

মা-বাবার প্রতি ক্ষোভ একজন শিক্ষার্থীর জীবনের সবচেয়ে বড় অবিদ্যা। জন্মে থাকা এই ক্ষোভ শিক্ষার্থীর মেধার বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে আর মা-বাবার সাথে জেনারেশন গ্যাপই এ ক্ষোভের উৎস। সন্তানকেই উদ্যোগী হয়ে মমতার শক্তি দিয়ে, ভালবাসার শক্তি দিয়ে এই ফাঁক পূরণ করতে হবে।

গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক গত ১০ অক্টোবর ঢাকাস্থ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত বহুল আলোচিত ‘অবিদ্যা’ শীর্ষক ওয়ার্কশপের ৩য় পর্বে তরুণ-তরুণীদের উদ্দেশ্যে এ কথা বলেন। প্রায় আট শতাধিক অংশগ্রহণকারীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি ছিলো সরব ও প্রাণবন্ত।

অবিদ্যা পর্ব-৩ এর মূল বিষয়বস্তু ছিলো শিক্ষার্থী জীবনে অবিদ্যা। গুরুজীর আলোচনায় বর্তমান পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের করুণ পরিণতির মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয় পাঁচটি

বিষয় : মা-বাবার সাথে ভুল বোঝাবুঝি এবং বন্ধুত্ব, প্রেম, স্মার্টনেস ও শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা।

গুরুজী বলেন, জেনারেশন গ্যাপের ফলে অভিভাবকদের ভাষা সন্তানরা বোঝেন না আর সন্তানের ভাষাও অভিভাবকরা বোঝার প্রয়োজন মনে করেন না। ফলে তরুণ-তরুণীদের মনে ক্ষোভ সৃষ্টি হয় যা তাদের বন্ধুবেশী অসৎ সংঙ্গে মিশতে উৎসাহিত করে।

তিনি বলেন, নেহায়েত অবিদ্যার কারণেই তরুণ-তরুণীরা বিপরীত লিঙ্গকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্যে তথাকথিত স্মার্ট সাজার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। অথচ বিপরীত লিঙ্গকে আকৃষ্ট করতে পারার মধ্যে কোনো স্মার্টনেস নেই। কারণ প্রত্যেক পশুই সহজাতভাবে বিপরীত লিঙ্গকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। তাই একে পশুসুলভ প্রবণতা বলা যায়।

বন্ধু নির্বাচনের দিক-নির্দেশনায় তিনি বলেন,

নিছক সহপাঠী বা সমবয়সী প্রতিবেশী হলেই বন্ধু হতে পারে না, বন্ধু সে-ই হতে পারে যার সাথে আদর্শ, চিন্তা-চেতনা এবং মতের মিল রয়েছে। তাকেই স্মার্ট বলা যাবে যার আত্মপ্রত্যয় চারপাশের মানুষকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার দিকে আকৃষ্ট করে। জীবনের জন্যে কল্যাণময় প্রতিটি পর্যায়ে, প্রতিটি ভূমিকায় নিজেকে প্রথম সারিতে রাখাই হবে একজন শিক্ষার্থীর লক্ষ্য।

গুরুজী বলেন, বর্তমান পৃথিবীতে বড় মাপের নেতৃত্ব অনুপস্থিত। এই নেতৃত্ব আসতে পারে এখনকার তরুণ-তরুণীদের মধ্যে থেকেই। এর জন্যে নিজেকে তৈরি করতে হবে। মেধাকে কাজে লাগাতে হবে এবং সর্বোপরি দক্ষ হতে হবে। কারণ সততা সবসময় পরাজিত হয় যদি মেধা ও দক্ষতার সংমিশ্রণ না ঘটে।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীকে নৈতিক, মানবিক ও নেতৃত্বের জ্ঞানে আলোকিত করার যে ভূমিকা একসময় পরিবার বা শিক্ষকরা পালন করতেন এখন তাতে দেখা দিয়েছে এক শূন্যতা।

সৎসঙ্গ হিসেবে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন এখন সেই শূন্যতা পূরণেই রাখছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, যার দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করে আজকের নবীনরাই নেতৃত্ব দেবে আগামী পৃথিবীর।